ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

১৪১৯:২০

মাঝোপাড়া মসজিদ : একটি অপ্রকাশিত প্রত্নসম্পদ
মহাস্থানগড় : বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে
পাবনার তাড়াশ জমিদার বংশ : উদ্ভব ও বিকাশ ১৫৫১-১৯৫০
বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার কৃষক সমাজের গঠন
অনীক মাহমুদের কবিতা : আখ্যানের কথকতা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার
রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে দার্শনিক উপাদান : প্রসঙ্গ দ্বৈতবাদ, শিক্ষাতত্ত্ব ও বিকল্প আধুনিকতা
বেগম রোকেয়া : জাতীয় জীবনের দঃসময়ের একান্ত সঙ্গী
বাংলাদেশে বস্তির সামাজিক প্রেক্ষাপট ও কিশোর অপরাধের ধরন : রাজশাহী মহানগরীতে পরিচালিত একটি সমীক্ষা
মাজারকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকাচার
বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট : বাজার প্রতিযোগিতা কাঠামো ও ভোক্তা আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
গ্রামীণ গৃহস্থালিতে পশুসম্পদের ভূমিকা : একটি সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান
বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনায় নির্দেশকের শিল্পভাবনা
বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক চিত্র : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেক্ষিত
বাংলা সঙ্গীতে স্বর ব্যবস্থা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল

ISSN 1561-798X
সংখ্যা ২০, ১৪১৯

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল

নির্বাহী সম্পাদক
এম শহীদুল্লাহ্

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ নাজিমুল হক
মো. কামরুজ্জামান

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ জার্নাল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আইবিএস জার্নাল বিংশ সংখ্যা ১৪১৯
প্রকাশকাল ডিসেম্বর ২০১৩

© ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ

প্রকাশক
মো. আবুল কালাম আজাদ
সচিব, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫
ফোন: (০৭২১) ৭৫০৭৫৩, ৭৫০৯৮৫
ফ্যাক্স: (০৭২১) ৭১১১৮৫

সম্পাদনা সহকারী
এস.এম. গোলাম নবী
উপ-রেজিস্ট্রার, আইবিএস, রা.বি.

কভার ডিজাইন
আবু তাহের বাবু

মুদ্রক
মেসার্স শাহপীর চিশতি প্রিন্টিং প্রেস
কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী

মূল্য
টাকা ১৫০.০০

সম্পাদকমণ্ডলী

সদস্য

নির্বাহী সম্পাদক
এম শহীদুল্লাহ্
প্রফেসর ও পরিচালক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সহযোগী সম্পাদক
মোহাম্মদ নাজিমুল হক
সহযোগী অধ্যাপক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মো. কামরুজ্জামান
সহকারী অধ্যাপক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. জয়নুল আবেদীন
প্রফেসর, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বরোচিষ সরকার
প্রফেসর, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সুলতানা মোস্তাফা খানম
প্রফেসর, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সনজিব কুমার সাহা
প্রফেসর, মার্কেটিং বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

খন্দকার ফরহাদ হোসেন
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

এম. মোস্তাফা কামাল
সহযোগী অধ্যাপক
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রবন্ধের বক্তব্য, তথ্য ও অভিমতের জন্য সম্পাদকমণ্ডলী বা আইবিএস দায়ী নয়)

যোগাযোগের ঠিকানা

নির্বাহী সম্পাদক
আইবিএস জার্নাল
ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫
বাংলাদেশ
ফোন: (০৭২১) ৭৫০৯৮৫
ই-মেইল: ibsru@yahoo.com

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর বাংলা ও ইংরেজি জার্নালে বাংলাদেশ বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রাবন্ধিক বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, ফোকলোর, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সমাজতত্ত্ব, আইন, পরিবেশ এবং বাংলাদেশের মানুষের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত যেকোনো বিষয়ের উপর বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশের জন্য দাখিল করা প্রবন্ধ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের যেসব বৈশিষ্ট্য জার্নালে সম্পাদকমণ্ডলী প্রত্যাশা করেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ:

- প্রবন্ধে মৌলিকত্ব থাকতে হবে;
- প্রবন্ধটি স্বীকৃত গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী রচিত হতে হবে;
- বাংলা ও ইরেজি উভয় প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষায় অনূর্ধ্ব ১০০ শব্দের একটি সারসংক্ষেপ থাকতে হবে;
- বাংলা প্রবন্ধের বানান হবে বাংলা একাডেমী প্রমিত বানান অনুযায়ী। তবে উদ্ধৃতির বেলায় মূল বানানের কোনো পরিবর্তন করা যাবে না।
- গ্রন্থপঞ্জি, টীকা ও তথ্যনির্দেশের যতিচিহ্ন ও সংকেত প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমএলএ, এপিএ এবং শিকাগো অথবা হার্ভার্ড স্টাইল অনুসরণ করতে হবে;
- প্রবন্ধের পরিসর ছয় হাজার শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রবন্ধের দুইকপি পাণ্ডুলিপি সফ্‌ট কপিসহ জমা দিতে হবে। বাংলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে ফন্ট হবে "বিজয়" সফ্‌টওয়্যারের "সুতন্বী-এমজে" এবং ইংরেজি প্রবন্ধের ক্ষেত্রে Times New Roman/Tahoma। প্রবন্ধের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদাসহ যোগাযোগের ঠিকানা (মোবাইল নম্বরসহ) অবশ্যই থাকতে হবে।

সূচিপত্র

এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম	মাঝোপাড়া মসজিদ : একটি অপ্রকাশিত প্রত্নসম্পদ	৭
মো. জাহাঙ্গীর আলম	মহাস্থানগড়: বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গ	১৯
মোঃ সামছল আলম	পাবনার তাড়াশ জমিদার বংশ : উদ্ভব ও বিকাশ ১৫৫১-১৯৫০	৩১
নূরুল ইসলাম	বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার কৃষক সমাজের গঠন	৪৯
মোঃ আবদুল মজিদ	অনীক মাহমুদের কবিতা: আখ্যানের কথকতা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার	৭৩
এ. এস. এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া	রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে দার্শনিক উপাদান : প্রসঙ্গ দ্বৈতবাদ শিক্ষাতত্ত্ব ও বিকল্প অধুনিকতা	৮৭
আবেদা আফরোজা	বেগম রোকেয়া : জাতীয় জীবনের দুঃসময়ের একান্ত সঙ্গী	১০৫
মোঃ শহীদুল ইসলাম	বাংলাদেশে বস্তির সামাজিক প্রেক্ষাপট ও কিশোর অপরাধের ধরন : রাজশাহী মহানগরীতে পরিচালিত একটি সমীক্ষা	১১৭
ইকবাল হুসাইন	মাজারকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকাচার	১৩৩
এম. জাহাঙ্গীর কবির	বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট : বাজার প্রতিযোগিতা কাঠামো ও ভোক্তা আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান	১৫৫
আবু রাসেল মুহাঃ রিপন	গ্রামীণ গৃহস্থালিতে পশুসম্পদের ভূমিকা : একটি সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান	১৬৭
এস. এম. ফারুক হোসাইন	বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনায় নির্দেশকের শিল্পভাবনা	১৮৩
মোঃ ফারুক হোসাইন মোঃ আখতার হোসেন মজুমদার	বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক চিত্র : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেক্ষিত	১৯৭
শেখর মণ্ডল	বাংলা সঙ্গীতে স্বর ব্যবস্থা	২১৫

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

মাঝোপাড়া মসজিদ : একটি অপ্রকাশিত প্রত্নসম্পদ

এ.টি.এম. রফিকুল ইসলাম*

Abastract: The Mughal architecture in Bengal, particularly Mosque architecture was a provincial version of the Upper Indian imperial Mughal architecture of Agra, Fathpur-Sikri and Delhi. Nevertheless, a large number of Mughal mosques in Bengal are of the covered type without the addition of *riwaqs* around the *sahn*. The style gradually developed and consequently became perfected and standardized. Most of the mosques of the Mughal Bengal were built on this particular plans and designs excepting some early examples. The type however produces two important varieties— (1) mosques with a large central dome and (2) mosques with three uniform domes. Both the categories have three interior divisions by two wide arches. In the former variety, the central bay is always kept larger and square covered with a large dome, while the side ones are covered with small domes or vaults. But the bays of the latter category are all square of equal size surrounted by three equal domes. This paper presents the unexplored Majhopara Mosque giving emphasis on its ground plan and other peculiarities, which belongs to the large central domed variety of the three-domed style Mughal mosques of Bengal.

ভূমিকা

বাংলার মুসলিম স্থাপত্য খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে সূচিত হয়। তবে প্রারম্ভিক মুসলিম আমলের দু-একটি বিদ্যমান উদাহরণ ব্যতীত তেমন কোনো দৃষ্টান্ত নজরে পড়ে না। উল্লেখ্য যে, দিল্লীর সালতানাত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলার সুলতানগণ নিজেদের বহির্ভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত না করে বরং বাঙালি পরিচয়ে এদেশের স্থানীয় উৎসের পৃষ্টপোষকতা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় মধ্যএশীয় নির্মাণশৈলী ও অলঙ্করণ রীতি-নীতির সাথে এ দেশের স্থানীয় উপাদান যেমন- দোচালা ঘরের বক্রাকার কার্নিস, বাঁশের ঘরের কোণস্থিত খুঁটির অনুকরণে বুরুজ, উল্টানো চাড়ির ন্যায় গম্বুজ, অলঙ্করণ হিসেবে পোড়ামাটির ফলক প্রভৃতি সংযোজন করে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত করা হয়েছে। অর্থাৎ বহির্ভারতীয় নকসা ও খিলান পদ্ধতির সাথে স্থানীয় বৈচিত্রময় উপকরণ ও নির্মাণশৈলীর সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইমারত নির্মাণে যে নতুনত্বের সৃষ্টি হয়েছে তাই 'বাংলার

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মুসলিম স্থাপত্য' নামে অভিহিত। সুদীর্ঘ সুলতানী শাসনামলে (১২০৪-১৫৭৬) নির্মিত বাংলার বিদ্যমান ইমারতসমূহ এই নতুন রীতির স্বাক্ষী হিসেবে এখনো বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় মোগলদের আগমনের সাথে সাথে রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি স্থাপত্যকলার ইতিহাসে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটে। অর্থাৎ বাংলার মোগল স্থাপত্য ধারা কেন্দ্রীয় মোগল স্থাপত্যের অনুকরণে নতুন পরিচ্ছদে উন্মেষ ঘটে।[১] বাংলার বিদ্যমান মোগল ইমারতসমূহ পর্যবেক্ষণে বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। যাহোক মধ্যযুগীয় বাংলায় মুসলিম শাসকদের (১২০৪-১৮৫৭) পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা স্থাপত্য ইমারতসমূহ প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত যথা— ধর্মীয় স্থাপত্য ও লৌকিক স্থাপত্য।[২] বাংলায় মুসলমানদের নির্মিত ধর্মীয় ইমারতসমূহ বিশেষ করে মসজিদ ও সমাধিসৌধ যেভাবে এখনো টিকে রয়েছে সে হিসেবে টিকে থাকা লৌকিক স্থাপত্যের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। কারণ হিসেবে বলা যায় যে, ধর্মীয় ইমারতসমূহ পরিত্যক্ত হলেও সাধারণ জনগণের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি, সম্মানবোধ ও ভীতির কারণে এদের উপকরণসমূহ অপহৃত বা লুণ্ঠিত হয়নি। পক্ষান্তরে লৌকিক ইমারতসমূহের প্রতি জনগণের এ ধরনের অনুভূতি না থাকা কারণে সহজেই সেগুলো অপহৃত বা লুণ্ঠিত হওয়ায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এরূপ একটি ধর্মীয় স্থাপত্যকীর্তি হলো বর্তমান বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত মাঝোপাড়া মসজিদ। বর্তমানে মসজিদটি শিবগঞ্জ সদর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় থেকে প্রায় ১.৫ কি. মি. এবং মহাস্থান যাদুঘর থেকে প্রায় ১২ কি. মি. উত্তর-পূর্ব দিকে মাঝোপাড়া গ্রামে অবস্থিত। জনদৃষ্টির অন্তরালে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত ও অযত্ন অবহেলায় নিপতিত ভগ্নদশাগ্রস্থ এই মসজিদটির ভূমি নকসাসহ স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভূমি পরিকল্পনা ও গঠনশৈলী (ভূমি নকসা-১, আলোকচিত্র-১) : ইট নির্মিত ও সিমেন্ট-বালির তৈরি পলেস্তারায় আচ্ছাদিত এ মসজিদটি আয়তাকার পরিসরে নির্মিত। এর বহিস্থ পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ৯.৩০ মি. ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩.৮০ মি.। এর চারকোণায় চারটি গোলায়িত কোণস্থিত বুরুজ সংযোজিত এবং বুরুজগুলো বপ্রের উপরিভাগ পর্যন্ত উত্থিত হয়ে নিঃছিদ্র ছত্রি অথবা কিউপোলাতে সমাপ্ত (আলোকচিত্র-২)। প্রতিটি ছত্রির শীর্ষভাগ

---

[১] মোগলদের রাজধানী আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, লাহোর বা দিল্লী হওয়ায় বাংলা প্রদেশে তাদের স্থাপত্যের যে ছাপ পড়েছে তাই বাংলার মোগল প্রাদেশিক স্থাপত্য। বাংলার মোগল স্থাপত্য কেন্দ্রীয় মোগল স্থাপত্যের অনুকরণে পরাধীন আশ্রিত স্থাপত্য যা অনেকটাই নতুন পরিচ্ছদে দূর্বল বলা যেতে পারে। তাছাড়া মোগল স্থাপত্যের মূখ্য নির্মাণ উপকরণ হিসেবে কেবলমাত্র ইটের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় যা পলেস্তারার আবরণ ও নকসায় সুশোভিত। মোগল স্থাপত্যের দুর্বলতার প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় উত্তর-ভারতের বেলে পাথর ও মার্বেল পাথরের অনুপস্থিতিতে নির্মাণ উপকরণ হিসেবে সহজ লভ্য স্থানীয় ইটের ব্যবহার। বলা যায় যে, ইট পাথরের মত শক্তিশালী না হওয়ায় এই দুর্বলতা যা দুরিকরণার্থে পলেস্তারায় আচ্ছাদিত করা হতো।

[২] ধর্মীয় স্থাপত্য হিসেবে বাংলাতে প্রধানতম হলো মসজিদ এবং এরপরে সমাধি সৌধ, মাদরাসা, ঈদগাহ, ঈমামবাড়া প্রভৃতি। অন্যদিকে লৌকিক স্থাপত্যের মধ্যে প্রাসাদ, দুর্গ, তোরণ, কাটরা, অফিসভবন, হাম্মাম খানা, সেতু ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কলসাকৃতির শীরচূড়ায় শোভিত। নামাজগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। মসজিদ স্থাপত্যের চিরাচরিত রীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ পার্শ্ববর্তী দু'টি অপেক্ষা বৃহৎ। অনুরূপভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান যা বর্তমানে জানালা হিসেবে ব্যবহৃত। বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে পূর্ব দিকের প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে তিনটি অর্ধ্ববৃত্তাকৃতির মিহরাব সন্নিবেশিত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় কিছুটা বৃহৎ পরিসরে নির্মিত (আলোকচিত্র-৩)। তাছাড়া কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পিছন দিকে কিছুটা উদ্‌গত এবং এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে সরু বুরুজ সংযোজিত।

মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৭.৫০ মি. ও প্রস্থে ২.০০ মি.। নামাজগৃহটি দু'টি খিলান দ্বারা তিনটি বর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় 'বে'-টি অপেক্ষাকৃত আকার ও আয়তনে সামান্য বড়।[৩] প্রতিটি 'বে'-এর ছাদ হিসেবে অষ্টভুজাকৃতি পিপার উপর প্রতিষ্ঠিত তিনটি কন্দাকৃতির ন্যায় গম্বুজ সমগ্র নামাজগৃহকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে (আলোকচিত্র-৪)। গম্বুজের পিপার ভার খিলান, প্রবেশপথ ও মিহরাবের খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পিপার নিম্নাংশের ফাঁকা স্থানগুলো ভরাট করার জন্য অবস্থান্তর পর্যায়ে ত্রিভুজাকৃতির বাংলা পান্দানতিফ রীতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। গম্বুজের বহির্গাত্রের গোড়াতে দু'সারি বদ্ধ মার্লন নকসার ব্যবহার এর আলঙ্কারিক শ্রীবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাছাড়া গম্বুজের শীর্ষ বিন্দুতে পূর্ণপ্রস্ফুটিত পদ্ম পাঁপড়ির উপরে কলস নকসায় অলঙ্কৃত শীরচূড়া বিদ্যমান (আলোকচিত্র-৫)।

মসজিদের নামাজগৃহের সম্মুখে ১০.৭৫ মি. × ৫.৮৫ মি. পরিমাপের প্রাচীর বেষ্টিত খোলাচত্বর বা আঙ্গিনা অদ্যাবধি লক্ষ্য করা যায়। উন্মুক্ত এ অঙ্গনের পূর্ব প্রাচীরের কেন্দ্রস্থলে ২.২৫ মি. × ১.১০ মি. × ১.২৭ মি. পরিমাপের দোচালা প্রবেশপথ অক্ষত অবস্থায় আজও দন্ডায়মান (আলোকচিত্র-৬)। প্রবেশপথটি আবার কৌণিক খিলান বিশিষ্ট এবং খিলানটি কলসাকৃতির ভিত্তি ভূমি থেকে উত্থিত কোণ দন্ডের উপর সংস্থাপিত। কোণ দন্ডের উভয় পার্শ্বে আবার দু'টি সরু বুরুজ প্যাঁচানো রজ্জু নকসায় বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। তাছাড়া প্রবেশপথের চার কোণায় চারটি বুরুজ ব্যান্ড নকসায় বিশেষভাবে সুসজ্জিত। প্রবেশপথের দোচালা ছাদ বক্রাকারভাবে নির্মিত এবং শীর্ষভাগে কলস শীরচূড়া বিদ্যমান। এ ধরনের দোচালা প্রবেশপথ কিশোরগঞ্জ জেলায় অবস্থিত এগারসিন্দুর শাহ মুহাম্মদ মসজিদে লক্ষ্য করা যায় (১৬৬০)।[৪]

নির্মাণকাল : আলোচ্য মসজিদের কোন শিলালিপি অদ্যাবধি আবিস্কৃত হয়নি অথবা অন্য কোন উৎস থেকে এর সঠিক নির্মাণ তারিখ এখনও জানা যায়নি। সুতরাং মসজিদটি কে

---

[৩] মসজিদের 'বে'-গুলোর পরিমাপ যথাক্রমে ১.৯০ মি. × ২.২৫ মি. × ১.৯০১ মি.।

[৪] A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), p. 181.

কখন নির্মাণ করেছিলেন তা আজও অনুদ্‌ঘাটিত রয়েই গেছে। তবে এর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যাবলী পর্যালোচনা করলে মসজিদটির সম্ভাব্য নির্মাণ তারিখ নির্ধারণ করা যায়। যেমন— বপ্র থেকে উপরে উত্থিত গোলায়িত কোণস্থিত বুরুজ, বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ ও পিপার উপর গম্বুজ স্থাপন, শীরচূড়ার ব্যবহার, বদ্ধ মার্লন নকসা ও পলেস্তারার ব্যবহার প্রভৃতি মোগল স্থাপত্যের প্রথাগত বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া এগুলোর কোন না কোন বৈশিষ্ট্য ঘোড়াঘাট অঞ্চলে অবস্থিত ভাঙ্গনী মসজিদ (আনু. অষ্টাদশ শতকের শেষ- উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে), কাজী সদর উদ্দীন মসজিদ (আনু. অষ্টাদশ শতক), ফুলহার মসজিদ (আনু. অষ্টাদশ শতক) প্রভৃতিতে দেখা যায়।[৫] তাছাড়া ঢাকার করতলব খান মসজিদ (সপ্তদশ শতক) সংলগ্ন একটি প্রোকণ্ঠে এরূপ দোচলা ধাচের ছাদ পরিলক্ষিত হয়।[৬] এই প্রেক্ষিতে অনুমতি হয় যে, মসজিদটি সপ্তদশ শতকের শেয়ার্ধে অথবা অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে নির্মিত।

পর্যালোচনা : ভূমি নকশা ও নির্মাণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের প্রধানতম ও পবিত্র ধর্মীয় স্থাপত্য হিসেবে মসজিদসমূহকে নিম্নবর্ণিত ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করে দেখানো যেতে পারে। যথা— (ক) প্রশস্ত কেন্দ্রীয় অংশসহ (Nave) বহু গম্বুজ মসজিদ, (খ) আয়তাকৃতির বহু গম্বুজ মসজিদ, (গ) বর্গাকার এক গম্বুজ মসজিদ, (ঘ) বারান্দাযুক্ত এক ও বহু গম্বুজ মসজিদ, (ঙ) গম্বুজ সম্বলিত খোলা চত্বরবিহীন মসজিদ এবং (চ) প্রাচীর ঘেরা খোলা চত্বর মসজিদ। বাংলার বিদ্যমান মসজিদসমূহকে আবার গম্বুজের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত শিরোনামে উপস্থাপন করা যেতে পারে- ১) এক গম্বুজ মসজিদ, ২) তিন গম্বুজ মসজিদ, ৩) ছয় গম্বুজ মসজিদ, ৪) নয় গম্বুজ মসজিদ, ৫) পনের গম্বুজ মসজিদ এবং ৬) ষাট গম্বুজ মসজিদ। সুলতানী আমলে তিন গম্বুজ মসজিদের উদাহরণ পাওয়া না গেলেও মোগল আমলে এ ধরনের অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হতে দেখা যায়। গম্বুজের আকৃতির উপর ভিত্তি করে মোগল আমলে নির্মিত তিন গম্বুজ মসজিদকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন— ক) সম-আকৃতির তিন গম্বুজ মসজিদ ও খ) বৃহদাকৃতির কেন্দ্রীয় গম্বুজ সংবলিত মসজিদ।

আলোচ্য মসজিদটি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত এবং তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মোগল মসজিদের একটি নতুন রূপ। এ মসজিদের কেন্দ্রীয় 'বে'-টি পার্শ্ববর্তী 'বে' দু'টি অপেক্ষা কিছুটা বৃহৎ। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় 'বে'-এর ন্যায় কেন্দ্রীয় গম্বুজটিও পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা কিছুটা বৃহৎ। মোগল বাংলার এ নির্মাণ রীতিটির আদি উৎস উত্তর ভারতে।[৭] উত্তর ভারতের ফতেপুর সিক্রি, দিল্লী, আগ্রা এমনকি লাহোরে নির্মিত মোগল আদর্শ নকসার

---

[৫] এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, *ঘোড়াঘাট : ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব*, অপ্রকাশিত এম. ফিল অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ. ১৪৮-৪৯, ১৩৪-৩৫ ও ১১৪।

[৬] A. H. Dani, *Muslim Architecture, op. cit.*, pl. 72, Fig. 101.

[৭] M. A. Bari, *Mughal Mosque Types in Bangladesh : Origin and Development*, Unpublished Ph. D. Thesis, Institute of Bangladesh Studie, Rajshahi University, 1989, p. 184.

মসজিদগুলোর অভ্যন্তরীণ বিন্যাস উক্ত রীতিতে সম্পাদিত। উদাহরণ স্বরূপ আগ্রা জামি মসজিদ (১৬৪৮) ও লাহোরের বাদশাহী মসজিদের (১৬৪০) নামোল্লেখ করা যেতে পারে।[৮] উল্লেখ্য ভারতীয় মোগল স্থাপত্যের অন্যতম বিশেষত্ব হলো তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণ যার এক কক্ষ বিশিষ্ট নামাজগৃহ তিনটি 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে' আবার একটি করে গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। রিওয়াক বা রিওয়াকবিহীন তিন গম্বুজ রীতির মোগল আদর্শ নকসার মসজিদের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে দিল্লী দুর্গের অভ্যন্তরস্থ মতি মসজিদ (১৬৬২) ও দিল্লীস্থ সুনেহরী মসজিদের নামোল্লেখ করা যেতে পারে।[৯] তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আবৃত মসজিদ ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম লোদী আমলে নির্মিত হতে দেখা যায় যার অন্যতম উদাহরণ হলো দিল্লীর বড় গুম্বাদ মসজিদ (১৪৯৪) ও মথ্-কি-মসজিদ (ষোড়শ শতক)। পরবর্তীতে সুরী আমলে উক্ত রীতি যথেষ্ঠ জনপ্রিয়তা লাভ করে যার উদাহরণ হিসেবে বিহারের রোটাসগড় মসজিদের (১৫৪৩) কথা বলা যায়।[১০] ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের এ রীতিটি তুর্কী বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের সংক্ষিপ্তকরণ অথবা পারস্যের *ইওয়ান-ই-খারকার* বর্ধিতায়ন বলেই মনে হয়।[১১] পরবর্তীকালে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের এই নির্মাণ রীতিটি বাংলার মোগল আদর্শ নকসার মসজিদ নির্মাণে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বলে ধারণা করা যায়।

মাঝোপাড়া মসজিদের সন্মুখভাগে প্রাচীর ঘেরা খোলাচত্বর বিদ্যমান। এ ধরনের প্রাচীর ঘেরা খোলা চত্বর ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ এবং কাজী সদর উদ্দীন মসজিদে লক্ষ্য করা যায়।[১২] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ উন্মুক্ত অঙ্গনের প্রাচীরে কোন বারান্দা নির্মিত হয়নি। বারান্দা বিহীন প্রাচীর বেষ্টিত উন্মুক্ত অঙ্গনের ব্যবহার বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে কোন নতুন উদাহরণ নয়। বরং এ রীতির উৎসস্থল ছিল ভারতে যার উদাহরণ হলো নাগাউরের শামস মসজিদ (১২১১-

---

[৮] P. Brown, *Indian Architecture, Islamic Period* (Bombay: Taraporevela Sons & Co. Ltd., 1975), pl. 86, Fig. 1 & pl. 93, fig. 1.

[৯] *Ibid*, p. 112; J. Fergusson, *History of Indian and Eastern Architecture*, Vol. II (London: John Murray, 1910), p. 320; C. Stephen, *The Archaeology and Monumental Remains of Delhi* (Allahabad: Kitab Mahal, 1967), p. 267 & 273-75.

[১০] S. Grover, *The Architecture of India : Islamic (727-1707)* (New Delhi: Vikas Publishing House, 1981), pp. 145-47, Fig. 6.08 & 6.09; R. Nath, *History of Sultanate Architecture* (New Delhi: Abhinav Publications, 1978), pp. 108-11, pl. 137 & 143; M. H. Quraishi, *List of Ancient Monuments Protected under Act-7 of 1904 in the Province of Bihar and Orissa* (Calcutta, 1913), p. 181-82.

[১১] The *Iwan-i-Kharka* style mosque consists of a barrel-vaulted gallery, with a dome in the centre- a type of edifice with occurs in Khuzistan in the Sasanid period; দেখুন- Andre Godard, *The Art of Iran* (London: George Allen & Unwin Ltd., 1962), p. 285; M. A. Bari, *Mughal Mosque Types in Bangladesh, op. cit.*, p. 89; A. B. M. Husain, "Mosque Plan—An Out Line History", *Journal of the Institute of Bangladesh Studies*, Vol. VI, Rajshahi, 1982-83, p. 11.

[১২] এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, *ঘোড়াঘাট : ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯।

৩৬)।[১৩] বারান্দা বিহীন উন্মুক্ত অঙ্গন সংবলিত এ মসজিদটি স্পেনে প্রথম আব্দুর রহমান কর্তৃক ৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত কর্দোভা জামি মসজিদ ও ৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে জিয়াদত আল্লাহ কর্তৃক পুনর্নির্মিত কায়রাওয়ান মসজিদের কথাই স্মরণ করে দেয়।[১৪] অবশ্য পান্ডুয়ার আদিনা মসজিদের বারান্দার সঙ্গে রিওয়াকের ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ মসজিদটি আদর্শ নকশার পরিকল্পনায় নির্মিত যা দামেস্ক মসজিদ (অষ্টম শতক), সামাররা মসজিদ (নবম শতক) ও ইবনে তুলনের মসজিদের (নবম শতক) ভূমি নকশার দ্বারা প্রভাবিত বলে অনুমিত হয়।[১৫] সুতরাং অলোচ্য মসজিদের ভূমি পরিকল্পনায় বহির্দেশীয় রীতির আধিপত্য ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উল্লিখিত মসজিদের আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর চারকোণায় চারটি গোলায়িত কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার। এ ধরনের বুরুজ সংযোজনের ধারণা এ দেশের গ্রামাঞ্চলের বাঁশ, খড় বা ছনে নির্মিত কুঁড়েঘরের চারকোণে স্থাপিত চারটি বাঁশের খুঁটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হয়। দোচালা কিংবা চৌচালা কুঁড়েঘরের অবকাঠামো মূলত: চার কোণার চারটি খুঁটি এবং তদুপরে চতুর্ভূজাকারে সংযুক্ত বাঁশের কাঠামোর উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোণের চারটি খুঁটি সমগ্র কাঠামোকে শক্ত করে ধরে রাখে। বাংলার কুঁড়েঘর নির্মাণের এ রীতিটি মুসলিম স্থাপত্যে চারকোণের চারটি বুরুজ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৫-৩২) এ ধরনের নির্মাণ রীতির বিকাশ ঘটে।[১৬] যদিও মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে আব্বাসীয় আমলে নির্মিত বহু ইমারতে এবং ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মামলুক আমলে নির্মিত সুলতান ঘারির সমাধিতে (৬২৯ হি:/১২৩১) এবং পরবর্তীতে তুগলক স্থাপত্যে ইমারত সুদৃঢ়করণে বুরুজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় তথাপি ঐ সব বুরুজের চেয়ে বাংলার স্থাপত্যের চারকোণায় ব্যবহৃত বুরুজ ভিন্নতর ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।[১৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের কোণস্থিত বুরুজগুলো কখনো গোলায়িত আবার কখনো অষ্টভুজাকারে নির্মিত হতে দেখা যায়। বাংলার স্থাপত্যে খান জাহান আলী রীতির ইমারতে সাধারণত গোলায়িত কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এ ধরনের গোলাকার কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার সম্ভবত তুগলক স্থাপত্যের জনপ্রিয় অনুকরণ বলে মনে হয়।[১৮] আবার বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে সম্ভবত একলাখী সমাধিতে

---

[১৩] এম. মোখলেছুর রহমান, *সুলতানী আমলে মুসলিম স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ* (রাজশাহী: জনসংযোগ ও প্রেস প্রকাশনা দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬), পৃ. ৩১।

[১৪] *তদেব*, পৃ. ১১২।

[১৫] S. M. Hasan, *Glimpies of Muslim Art and Architecture* (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983), p. 153.

[১৬] A. H. Dani, *Muslim Architecture, op. cit.*, p. 14; কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান", *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যাডিজ*, ভলিয়্যম- ৩৩, ২০০৫, পৃ. ৬১।

[১৭] মোঃ শামসুল হক, "ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের অবস্থান", *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯১),পৃ. ২৯০।

[১৮] তুঘলক স্থাপত্যের বুরুজগুলো ছিল গোলাকৃতির ও অবনমন সম্বলিত, দেখুন- S. Grover, *The Architecture of India, op. cit.*, p.43, fig-2.18। আর খান জাহান আলী রীতির বুরুজগুলো গোলাকার হলেও অবনমন ছিল না এবং

সর্বপ্রথম অষ্টকোণাকৃতির বুরুজের ব্যবহার দেখা যায়। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মোগল আমলে নির্মিত ইমারতসমূহের কোণস্থিত বুরুজগুলো বপ্রকে অতিক্রম করে আরো উপরে উত্থিত হয়ে স্তম্ভযুক্ত ছত্রি অথবা নিগ্ছিদ্র কিউপোলাতে সমাপ্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উসমানীয় তুর্কি স্থাপত্যে সুউচ্চ মিনার আকৃতির কোণস্থিত বুরুজের ব্যবহার দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ ১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত ইলদ্রিনের ইউসি সেরিফলি জামি মসজিদ ও ১৪৬৯-৭০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত সেলিমিয়া জামি মসজিদের কথা বলা যায়।[১৯] তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো তুর্কি স্থাপত্যের মিনার আকৃতির কোণস্থিত বুরুজের শিরোভাগ ছুঁচালো পেন্সিল আকৃতির অথচ ভারত উপমাহাদেশের মোগল ইমারতগুলোর কোণস্থিত বুরুজ সুউচ্চভাবে নির্মিত হলেও শিরোভাগ ছত্রি অথবা কিউপোলাতে সমাপ্ত এবং শীর্ষদণ্ডে (finial) শোভিত।

মাঝোপাড়া মসজিদের নামাজঘর অষ্টভূজাকৃতি পিপার উপর প্রতিষ্ঠিত তিনটি কন্দাকৃতির ন্যায় গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত যা মোগল আমলে নির্মিত বাংলার অনেক মসজিদেই দেখা যায়। পিপার উপর গম্বুজ নির্মাণের রীতি রোমান বৈশিষ্ট্য হলেও ষষ্ঠ শতক হতে উক্ত রীতি যে সিরীয় স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করে তা বোসরার গীর্জা হতে অনুধাবন করা যায়। মুসলিম স্থাপত্যে এর প্রাচীনতম উদাহরণ হলো জেরুজালেমের কুব্বাত-আস-সাখরা (৬৯১-৯২)।[২০] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এ রীতি ভারতবর্ষে প্রথম সৈয়দ ও লোদী আমলে নির্মিত ইমারতসমূহে এবং তাদের অনুকরণেই মোগল স্থাপত্যে অনুপ্রবেশ করে যা তাদের মাধ্যমে বাংলাতেও অনুসৃত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ গৌড়ের শাহ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালীর মসজিদ (আনু. ১৬০০), ঢাকার লালবাগ দুর্গ মসজিদ (১৬৭৯) ও করতলব খান মসজিদ (১৭০০-০৪), এগারসিন্ধুর সাদীর মসজিদ (১৬৫২) ও শাহ মুহাম্মদ মসজিদ (আনু. ১৬৮০) প্রভৃতির কথা বলা যায়।

বিদ্যমান এই মসজিদের চারকোণায় সংযোজিত কোণস্থিত বুরুজগুলো নিগ্ছিদ্র ছত্রি অথবা কিউপোলাতে সমাপ্ত। কোণস্থিত বুরুজের শিরোভাগে এ ধরনের ছত্রির সংযোজন বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে নতুন উদাহরণ নয় বরং এটি হিন্দু স্থাপত্যেরীতি থেকে উৎসারিত।[২১] ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে এ ধরনের ছত্রির ব্যবহার প্রথম পরিদৃষ্ট হয় সৈয়দ ও লোদী স্থাপত্যে যার অন্যতম উদাহরণ হলো মোবারক শাহ সৈয়দের সমাধি (পঞ্চদশ শতক)।[২২] পরবর্তীতে ভারতীয় মোগল স্থাপত্যে এর ব্যবহার ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তবে

এগুলো ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত হতে দেখা যায়, দেখুন- A. H. Dani, *Muslim Architecture, op. cit.*, p. 76, fig-59 & 63.

[১৯] G. Goodwin, *A History of Ottoman Architecture.* (London: Thames & Hudson, 1971), p. 101, pl. 96 & 3.

[২০] এ. বি. এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য* (ঢাকা: শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯), পৃ. ৫৪ ও ৪১।

[২১] R. E. M.Wheeler, *Five Thousand Years of Pakistan* (London: Royal India and Pakistan Society, 1950), p. 72.

[২২] P. Brown, *Indian Architecture, op. cit.*, pl. 16, fig. 2; এম. মোখলেছুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬৮, আলোকচিত্র-৮৮।

উল্লেখ্য যে, বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে কেবলমাত্র কোণস্থিত বুরুজের উপর ছত্রির ব্যবহার দেখা যায় এবং এগুলো নিরেট পলেস্তারায় নির্মিত (soild plastered type)। কিন্তু উত্তর ভারতীয় মোগল স্থাপত্যে ছত্রি সাধারণত উন্মুক্ত প্যাভিলিয়ন আকৃতির (open pavilion type) যেগুলো কোণস্থিত বুরুজের পাশাপাশি মসজিদের ছাদের উপরে সম্মুখ সারিতে আবার কখনো কখনো প্রধান প্রবেশপথের উপরিভাগে দেখা যায়।[২৩]

বাংলার স্থাপত্যে দোচালা ছাদ সংবলিত আলোচ্য মসজিদের প্রবেশপথ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য বাংলার সুলতানী আমলে নির্মিত ইমারতে দেশজ উপাদান হিসেবে চৌচালা খিলান ছাদের যেমন সংযোজন ঘটে, যেমন- ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯), দরাসবাড়ী মসজিদ (১৪৭৯) ও ষাট গম্বুজ মসজিদের (পঞ্চদশ শতক) কথা বলা যায়, তেমনি মোগল আমলে নির্মিত ফতেহ খানের সমাধিতে (১৬৬০) এদেশের দোচালা কুঁড়েঘরের আদলে রচিত দোচালা ছাদের বব্যহার পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে। ইমারতটির নির্মাণ পরিকল্পনা ও অবকাঠামো দৃষ্টে এটিকে অবিকল এদেশেরই বাঁশ-খড়ে নির্মিত দোচালা কুঁড়েঘরের ইটের নির্মিত অনুকরণ বললেও মোটেই অতুক্তি হবে না। পরবর্তীকালে ১৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত ময়মনসিংহের এগারসিন্ধুর শাহ মুহাম্মদ মসজিদের প্রধান তোরণে, ঢাকার করতলব খান মসজিদ (সপ্তদশ শতক) সংলগ্ন একটি প্রকোষ্টে এবং গোবিন্দগঞ্জ থানার ফুলহার মসজিদ সংলগ্ন একটি ইমারতে ঐরূপ দোচালা ধাচের ছাদ পরিদৃষ্ট হয়।[২৪] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এ ধরনের দোচালা ছাদ বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণের ধারা কেবলমাত্র বাংলার স্থাপত্যেই নয় বরং বাংলার বাইরেও ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ সপ্তদশ শতকে আগ্রা দুর্গে নির্মিত *বাংলা-ই-দরসনা-ই-মুবারক* ও অষ্টাদশ শতকে লাহোর দুর্গে নির্মিত *শাহদারী* প্রাসাদের কথা বলা যেতে পারে।[২৫]

উল্লিখিত মসজিদটি সিমেন্ট-বালির তৈরী পলেস্তারায় আচ্ছাদিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুলতানী আমলে নির্মিত কোন কোন ইমারতে পলেস্তারার ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও মুলতঃ মোগল আমলেই পলেস্তারার ব্যবহার সার্বিকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে যা বাংলার বিদ্যমান প্রায় মোগল ইমারতেই দেখা যায়। মুসলিম স্থাপত্যে পলেস্তারার ব্যবহার এসেছে মুলতঃ

---

[২৩] The Jami Masjid of Fathpur Sikri and that at Agra are two of the best Mughal examples to exhibit this features, দেখুন- P. Brown, *Indian Architecture, op. cit.*, pl. 73, fig. 1 & pl. 86, fig. 1.

[২৪] কাজী মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, "বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে দেশজ উপাদান" *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্ট্যাডিজ*, পার্ট-এ, ভলিয়্যম-৩৩, ২০০৫, পৃ. ৩; এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, *ঘোড়াঘাট*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫, প্লেট-২৫, আলোকচিত্র- ৫ক।

[২৫] এ. বি. এম. হোসেন, 'ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের কতিপয় অলঙ্করণ : উৎস ও ক্রমবিকাশ" *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারক গ্রন্থ* (ঢাকা : ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা, ১৯৯১), পৃ. ২৫৭; A. H. Dani, *Muslim Architecture, op. cit.*, p. 182; S. M. Hasan, *Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal* (Dacca: University Press Ltd., 1979), p. 179.

বাইজান্টাইন, সাসানীয় ও মধ্যএশিয় স্থাপত্য থেকে।[২৬] অবশ্য এস. কে সরস্বতী মনে করেন যে, গুপ্ত আমল থেকেই বাংলাতে পলেস্তারার প্রচলন ছিল।[২৭] তবে উমাইয়া প্রাসাদ কাসর আল-হাইর আল-গারবীর (৭২৪-২৭) পলেস্তারার কার্য মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন বলেই অনুমিত হয়।[২৮] পরবর্তীকালে এ রীতি আব্বাসীয় স্থাপত্যে এবং তারও পরে পারসিক স্থাপত্যে চরম উৎকর্যতা লাভ করে যার অনন্য উদাহরণ হলো নিসাপুর জামি মসজিদ (অষ্টম শতক), নায়িন জামি মসজিদ (নবম শতক), ইস্পাহান জামি মসজিদ (একাদশ-অষ্টাদশ শতক) ইত্যাদি।[২৯] পারসিক স্থাপত্যের এ জনপ্রিয় রীতি ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে তুগলক আমলে প্রথম অনুসৃত হয়েছিল যার প্রভাব বাংলার মুসলিম স্থাপত্যেও পড়ে। সুলতানী আমলে নির্মিত কোন কোন মসজিদ, যেমন গৌড়ের গুম্মান্ত মসজিদ ও ঝনঝনিয়া মসজিদে (১৫৩৫), পলেস্তারার অলঙ্করণ পরিদৃষ্ট হয়।[৩০] তবে এ যুগে প্রধানত পোড়ামাটির ফলক শিল্পের (টেরাকোটা) প্রাধান্য অব্যাহত ছিল। কিন্তু মোগল বাংলার স্থাপত্যে ইমারত গাত্রালঙ্কারে পোড়মাটির ফলকের পরিবর্তে পলেস্তারার অলঙ্করণ সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অসংখ্য উদাহরণও বিদ্যমান রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আলোচ্য মসজিদ বাংলার মোগল স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। মসজিদটি বহুকাল যাবৎ অব্যবহৃত ও ভগ্নাবস্থায় লোকচক্ষুর অন্তরালে পতিত রয়েছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, সমগ্র বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত সরকারীভাবে পূর্ণাঙ্গ কোন প্রত্নস্থল বা প্রত্নসম্পদ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি। অথচ এ ধরনের অনুসন্ধান ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হলে এ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত বহু অজানা প্রত্ননিদর্শন আবিস্কৃত হতে পারে যা আমাদের দেশের স্থাপত্যকলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধশালী করে তুলবে বলে আশা করা যায়। গত কয়েক বছর ধরে আলোচিত মসজিদটি স্থানীয় জনগণ কর্তৃক সংস্কার সাধন করতঃ প্রতিদিন নিয়মিত নামাজ আদায় করে আসছে। অথচ এ প্রাচীন মসজিদটির প্রতি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের দৃষ্টি প্রদানের মাধ্যমে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মসজিদটির স্থাপত্যশৈলী বাংলার স্থাপত্যকলার ইতিহাসে একটি নতুন সংযোজন। সুতরাং মসজিদটিকে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতিব জরুরি।

---

[২৬] M. Hafizullah Khan, *Terracotta Ornamentation in Muslim Architecture of Bengal* (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1988), p. 25.

[২৭] *Ibid*, p. 30.

[২৮] K. A. C. Creswell, *Early Muslim Architecture,* vol. I, part. II (Oxford: Clarendon Press, 1968), p. 511.

[২৯] A. U. Pope, *A Survey of Persian Art*, vol. II (London: Oxford University Press, 1939), pp. 1266, 1270 & 1291.

[৩০] M. Hafizullah Khan, *Terracottaa Ornamentation, op. cit.*, p. 30.

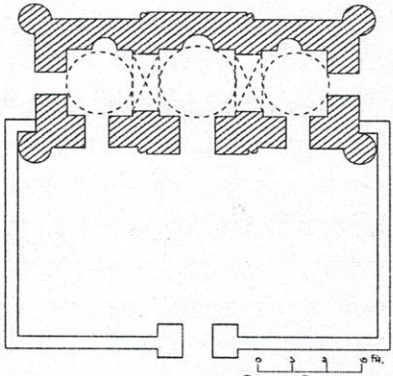

ভূমি নকসা-১ ঃ মাঝোপাড়া মসজিদ (শিবগঞ্জ, বগুড়া)

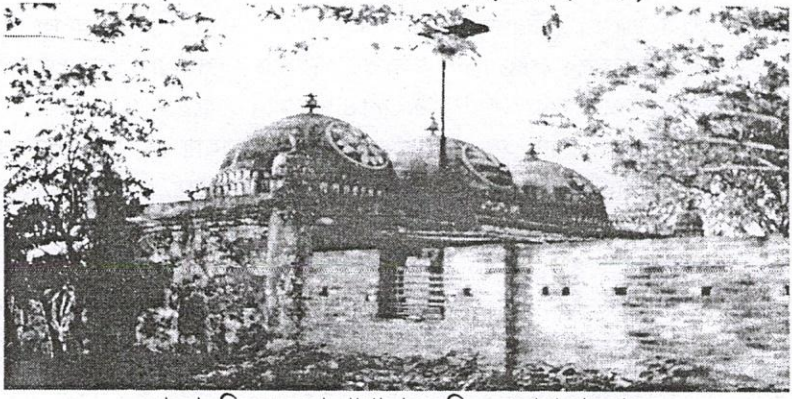

আলোকচিত্র-১ ঃ মাঝোপাড়া মসজিদের সাধারণ দৃশ্য।

আলোকচিত্র-২ ঃ মাঝোপাড়া মসজিদের গোলায়িত কোণস্থিত বুরুজ (দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে)।

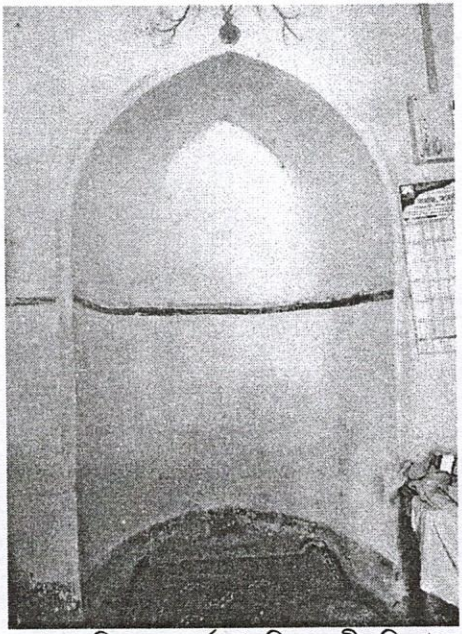

আলোকচিত্র-৩ : অর্ধ্ববৃত্তাকৃতির কেন্দ্রীয় মিহরাব

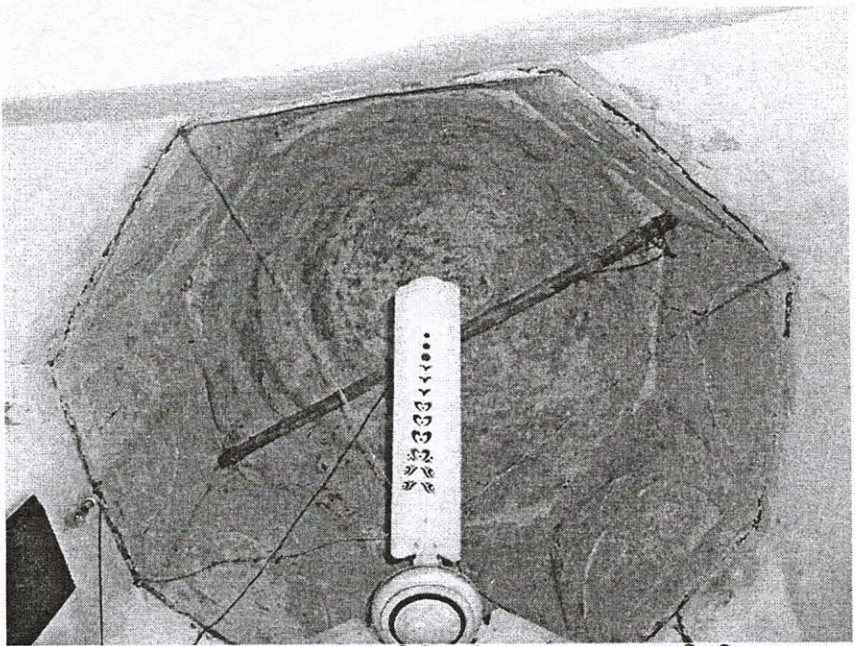

আলোকচিত্র-৪ : মাঝোপাড়া মসজিদের অষ্টভূজী পিপার উপর গম্বুজ স্থাপন (অভ্যন্তরীণ দিক থেকে)।

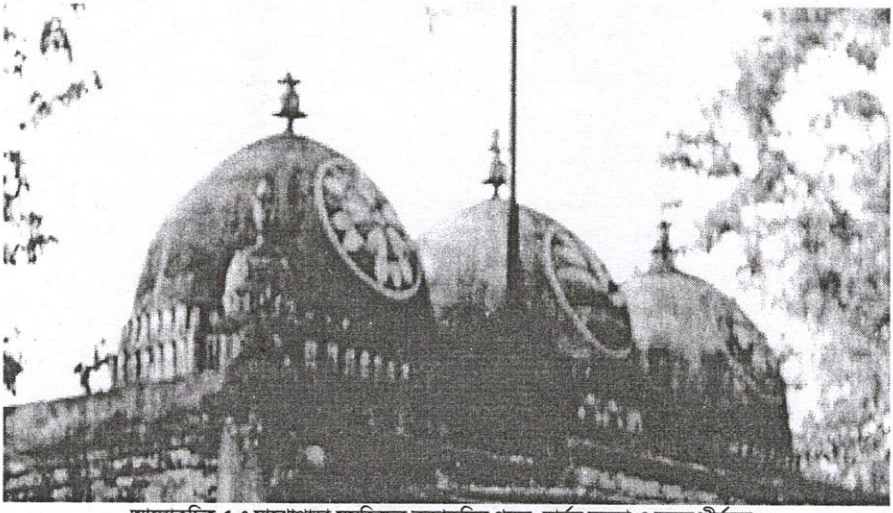

আলোকচিত্র-৫ ঃ মাঝোপাড়া মসজিদের কন্দাকৃতির গম্বুজ, মার্লন নকসা ও কলস শীর্ষদন্ড।

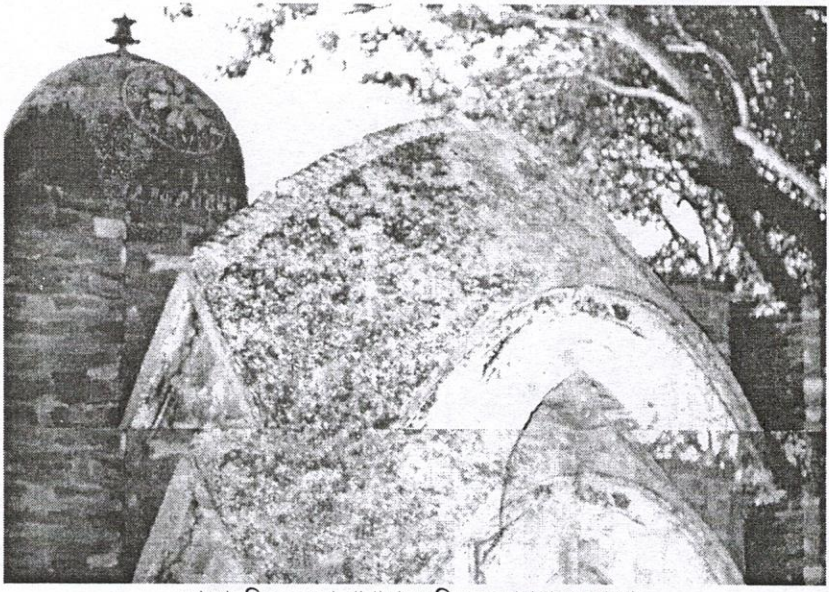

আলোকচিত্র-৬ ঃ মাঝোপাড়া মসজিদের দোচালা প্রবেশপথ।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

মহাস্থানগড়: বিশ্ব ঐতিহ্যে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গ

মো. জাহাঙ্গীর আলম*

Abstract: Mahastangarh, also known as Pundranagar, is one of the ancient archaeological sites of the World; it's well-planned and fortified city leads us back to the early historical times. The word 'Pundra' creates in our mind the image of a region, a nation, a linguistic community, an administrative centre, a well protected invincible city, a vast empire, a well developed and organized civilization. This is one of the fundamental resources for our history. Proper excavation, analysis and preservation of this archaeological site is important for the rich history, politics, religion and culture of this country as well as of the World. If we can do these things properly and if the local people, department of archaeology, ministry of planning and ministry of culture make a synchronized effort, then this site can be a part of World Heritage, and as a world Heritage site, it can uplift the status of Bangladesh and contribute significantly to the socio-economic development of the country.

ভূমিকা

বর্তমান বগুড়া জেলা শহর থেকে ১৩ কি.মি. উত্তরে, রংপুর-বগুড়া মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে এবং করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর ঘেষে বাংলার প্রাচীন জনপদ মহাস্থানগড়ের অবস্থান। ঢাকা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২০০ কি.মি.। মহাস্থানগড় প্রাচীন ঐতিহ্যের বিশিষ্ট স্থান এবং আমাদের জাতীয় পরিচয়ের অন্যতম প্রধান প্রতীক। বাংলার অন্যতম প্রাচীন জনপদ পুণ্ড্রবর্ধন তথা মহাস্থানগড় সুপ্রাচীন কাল থেকে মুসলিম বিজয় পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি পর্বের জীবন্ত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।[১] এমনকি স্বাধীনতার পরও বহুবিধ কারণে দেশে

---

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১ মৌর্য রাজত্বকালে পুন্দনগল (পুণ্ড্রনগর) জনৈক মহামাত্রের শাসনাধিষ্ঠান ছিল। গুপ্ত আমলে এই নগর পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তির ভুক্তিকেন্দ্র ছিল এবং সে সময় হতে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতাব্দিতে মুসলিম শাসনের সূচনা পর্যন্ত পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রনগর কখনো তার মর্যাদার আসন হতে বিচ্যুত হয় নাই। শুধু শাসনাধিষ্ঠান রূপেই নয়, ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি কেন্দ্ররূপে এবং অন্তর্ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় স্থলপথ বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র রূপেও এই নগরের বিশেষ সুখ্যাতি ও মর্যাদা বহু শতাব্দি ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব* (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৩), পৃ. ৩০০; মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ.১১; Nazimuddin Ahmed, "Introduction", *An Album of Archaeological Relics in Bangladesh* (Dhaka: Directorate of Archaeology & Museums, 1984), p. 10.

এবং বহির্দেশে এর গুরুত্ব ও মাহাত্ম ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতীতে এটি ছিল রাজনীতি, বাণিজ্য-অর্থনীতি, যোগাযোগ, ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এখন রাজনৈতিক কেন্দ্র না হলেও মহাস্থানগড়ের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে। বর্তমানে হযরত শাহ্ সুলতান বলখী মাহীসওয়ার (র.) এর মাযার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার ধর্মানুভূতি ও শ্রদ্ধার সাথে যেমন জড়িয়ে আছে; তেমনি পরশুরাম, কথিত শিলাদেবীর ঘাট, লক্ষিণদরের মেধ, পবিত্র করতোয়ায় পূণ্যস্নান ইত্যকার বিষয়ের সাথে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা মিশে রয়েছে। আবার বৌদ্ধ বিহারগুলো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের গৌরবগাঁথা, ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পৃক্ততা ঘোষণা করছে।[২] স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ ভ্রমণ পিপাসুদের নিকট মহাস্থানগড় তীর্থস্থান, বিনোদন, পিকনিক অথবা একসময়ের রহস্যপুরী হলেও ইতিহাস অনুরাগী বা কলা বিশারদগণের নিকট এটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং মহাকালের জীবন্ত সাক্ষী।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহাস্থানগড়ের চাইতে অনেক বেশি নবীন, বাহ্যত কম গুরুত্বপূর্ণ এবং সভ্যতায় অনেক কম ব্যপ্তিকালের নিদর্শন বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[৩] কিন্তু শুধুমাত্র সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে অবহেলা অথবা ব্যর্থতার কারণে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার এই নিদর্শন এখনো ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকায় যথাযথ স্থান লাভে ব্যর্থ।[৪] স্থানীক গুরুত্বের বিবেচনায় মহাস্থানগড়ের তুলনা বিরল। নদ-নদীর তীরেই প্রাচীন বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি-সমৃদ্ধির জয়যাত্রা এবং নদ-নদীর তীরেই গ্রাম-নগর-বন্দরের পত্তন, ঘন মানব বসতি, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার। ব্যাবিলনীয়, মিশরীয়, হরপ্পা সভ্যতা যেমন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল তেমনি প্রাচীন বাংলার খুবই গুরুত্বপূর্ণ নদী করতোয়ার তীরে গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্রনগর।[৫] বাংলার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমাংশসহ উত্তর ভারতের

---

২ বৌদ্ধপুরাণ মতে বুদ্ধদেব স্বয়ং কিছুদিন এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং নিজ ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। ঐ, পৃ. ২৯৯।

৩ বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান বা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান বিশেষ ধরণের (বন, পাহাড়,হ্রদ, মরুভূমি, ইমারত, স্মৃতিস্তম্ভ, প্রাসাদ বা শহর) একটি স্থান যা আন্তর্জাতিক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তুতকৃত তালিকার মধ্যে স্থান পেয়েছে। ইউনেস্কো নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি এই প্রকল্প পরিচালনা করে থাকে যার সদস্য সংখ্যা ২১। সদস্য দেশগুলো জেনারেল এসেম্বলি অফ স্টেট পার্টি কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত হয়। এই সদস্য দেশগুলোকে প্রকল্প স্টেট পার্টি বলা হয়। এই কমিটি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অনুরুপ। তথ্যসূত্রঃ *http:bn.wikipedia.org/wiki/.*

৪ আন্তর্জাতিক বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী প্রকল্পের কাজ হলো অনন্যসাধারণ সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক গুরুত্ব বিশিষ্ট স্থানসমূহের নাম লিপিবদ্ধ করা এবং তাদের শ্রেণীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিশেষ কিছু শর্তসাপেক্ষে এই স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 'বিশ্ব ঐতিহ্য ফান্ড' অর্থ সাহায্য দিয়ে থাকে। ২০০৬ সাল পর্যন্ত এ ধরণের মোট ৮৩০টি স্থানের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬৪৪টি সাংস্কৃতিক, ১৬২টি প্রাকৃতিক এবং ২৪টি মিশ্র শ্রেণীর। মোট ১৩৮টি রাষ্ট্রে এই স্থানগুলো অবস্থিত। প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী স্থানের সমুদয় সম্পত্তি ও জমির মালিক ঐ স্থানটি যে দেশে অবস্থিত সেই দেশ। তবে এই স্থানগুলো রক্ষর দায়িত্ব বর্তায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উপর। তাই বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান প্রকল্পের আওতাভুক্ত সব রাষ্ট্রই প্রতিটি স্থান রক্ষার ব্যাপারে ভূমিকা রাখতে পারে। তথ্যসূত্রঃ *http:bn.wikipedia.org/wiki/.*

৫ সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *বাংলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন যুগ* (চট্রগ্রামঃ দীপঙ্কর কানুনগো, ১৯৯৪), পৃ. ৩।

সাথে এবং সমুদ্র পথে বহির্ভারতের সাথে করতোয়া নদী হয়ে খুব সহজে যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল। ফলে পুণ্ড্রনগরের সাথে ভারতের অপরাপর অংশ এবং বহির্ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ ছিল।[৬] সুতরাং মহাস্থানগড়কেন্দ্রিক সভ্যতার বিকাশ বাধাগ্রস্ত না হয়ে বরং উত্তরোত্তর এর শ্রী-বৃদ্ধি ঘটে। স্থায়ীভাবে জনবসতি স্থাপন, প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবার মধ্যদিয়ে সংস্কৃতি ও সভ্যতায় প্রতিনিধিত্বকারী হতে গেলে কোন স্থানের জন্য যেসব শর্ত অবশ্য পূরণীয়, যেমন ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ু, সুপেয় পানি, কৃষির উপযুক্ত জমি, উৎপাদন, বিপণন, যোগাযোগ এবং পরিবহণ ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, বহিরাগতদের আকৃষ্ট করার ক্ষমতা ইত্যাদি সবগুলোই ছিল মহাস্থানগড়ের অনুকূলে।[৭]

বিভিন্ন সূত্র ও নিদর্শনাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মহাস্থানগড়ে বাংলাদেশের প্রাচীন প্রশাসনিক কেন্দ্র পুণ্ড্রনগরের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে।[৮] করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে গড়ে উঠা এই নগরীর চারিদিক ছিল পরিখা ও জলাভূমি বেষ্টিত এবং সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। যুগের পর যুগ ধরে এখানে সম্মিলন ঘটেছে নানা জাতের মানুষের, আবির্ভূত হয়েছে নানা শাসক গোষ্ঠী ও তাদের অনুসারি, স্তরে স্তরে গড়ে উঠেছে ভিন্ন ভিন্ন মানব বসতি, সমৃদ্ধ হয়েছে এখানকার সভ্যতা।

আনুমানিক ৩০০-২০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ বা তারও পূর্ব হতে মহাস্থানগড় গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[৯] ঐতিহাসিক কাল হতে আরম্ভ করে আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতাব্দি পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্র (অথবা ব্রহ্ম), তাম্রলিপ্তি, সমতট, বঙ্গ প্রভৃতি জনপদে বিভক্ত। সপ্তম শতাব্দির প্রথম পাদে শশাঙ্ক গৌড়ের রাজপদে অধিষ্ঠিত হন এবং এরপর অষ্টম শতাব্দি হতে পুণ্ড্র বা পুণ্ডবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ- এই তিনটি জনপদই যেন সমগ্র বাংলার সমার্থক হয়ে উঠে। বরেন্দ্রভূমি প্রাচীন পুন্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনেরই এক সুবৃহৎ অংশ, এমনকি কখনো কখনো সমার্থক। পুণ্ড্র-বরেন্দ্রী এবং রাঢ়-তাম্রলিপ্তিই বাংলার প্রাচীনতম পাললভূমি।[১০] ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সাথে সাথে পুণ্ড্র পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দিতে পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়েছে এবং গুপ্ত রাষ্ট্রের প্রধান ভূক্তিতে পরিণত হয়েছে। সপ্তম শতাব্দিতে পুণ্ড্র বা পৌণ্ড্রদের জনপদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্য এবং পরে পাল ও সেন রাজাদের আমলে এর কলেবর আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১১]

ত্রয়োদশ শতাব্দির সূচনালগ্নে তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি কর্তৃক বাংলার উত্তর-পশ্চিমাংশ তথা গৌড়-লখ্‌নৌতি-বরিন্দ দখলের মধ্যদিয়ে মুসলিম

---

৬ অজয় রায়, *বাঙলা ও বাঙালী* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৩৭৬ সাল), পৃ. ১০৫।

৭ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১, ১৫।

৮ মোঃ মোশারফ হোসেন, *প্রত্নতত্ত্ব: উদ্ভব ও বিকাশ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮), পৃ. ৯৩।

৯ মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১, ১৬; নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৩, ।

১০ *ঐ*, পৃ. ১০২।

১১ *ঐ*, পৃ. ১১৫, ১২৩ ও ৩৬১।

শাসনের সূচনা হয়।[১২] ত্রয়োদশ শতাব্দির পূর্ববর্তী সময়কাল বাংলার ইতিহাসে প্রাচীন যুগ নামে অভিহিত। সুপ্রাচীন কাল থেকে মুসলিম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও অর্থনীতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। আর এই সমৃদ্ধ ইতিহাসের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল মহাস্থানগড় তথা পুণ্ড্রবর্ধন।[১৩] মুসলিম আগমনের পর থেকে মহাস্থানগড়সহ বাংলার শাসন-সংস্কৃতিতে নতুন ধারা পরিলক্ষিত হয়। সুদীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তন-পরিমার্জন, সংযোজন-বিয়োজন, একাত্মতা-বিচ্ছিন্নতা, উত্থান-পতনের ধারাবাহিকতায় আজকের এ বাংলাদেশ।

প্রাচীন বাংলায় নগরগুলো গড়ে উঠেছিল নানা প্রয়োজনে; কোথাও একটিমাত্র প্রয়োজনে আবার কোথাও একাধিক প্রয়োজনের তাড়নায়। পুণ্ড্রবর্ধনের মতো নগর একটিমাত্র প্রয়োজনে গড়ে উঠেনি। বিভিন্ন সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে করতোয়া তীরবর্তী এই নগরী ছিল একটি তীর্থকেন্দ্র। দ্বিতীয়ত, শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে এই নগর ছিল বৃহৎ এক রাজ্য ও জনপদের রাজধানী এবং প্রধান শাসনকেন্দ্র। তৃতীয়ত, এই নগর আন্তর্দেশীয় ও সর্বভারতীয় বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।[১৪] একাধিক স্থলপথ এবং প্রাচীন করতোয়ার প্রশস্ত জলপথ এই কেন্দ্রে মিলিত হতো।[১৫] তৎকালে যে ক'টি নগরী সর্বভারতীয় খ্যাতি ও মর্যাদা লাভ করেছিল পুণ্ড্রবর্ধন তন্মধ্যে অন্যতম। সুদীর্ঘ কালব্যাপী চলমান সংস্কৃতিকে বুকে ধারণ ও লালন করে এগিয়ে চলা সভ্যতার এই পাদপীঠকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে নিম্নোক্ত সুপারিশমালার বাস্তবায়ন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।[১৬]

সীমানা নির্ধারণ ও অধিগ্রহণ

পুণ্ড্রবর্ধন তথা মহাস্থানগড়ের সরহদ্দ বা চৌহদ্দি নির্ধারনের জন্য অদ্যাবধি কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। প্রাচীন বৈশালী-শ্রাবস্তি-কৌশম্বীর নগরসমৃদ্ধির সাথে তুলনীয় মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে প্রায় ৪৫ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। শুধুমাত্র নগরীর দৈর্ঘ্য উত্তর-দক্ষিণে ১৫০০ মি. এবং প্রস্থ ১৩০০ মি.।[১৭] প্রাসাদ, অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, মাটি-পাথর-ধাতব মূর্তি, মন্দির, নগর প্রাকার, পরিখা, নগর উপকণ্ঠের বিহার ও মন্দির, বসতভিটা, অসংখ্য পোড়ামাটির ফলক, মুদ্রা,

---

১২ মুসলিম বিবরণাদিতে বরিন্দ নাম ব্যবহৃত হলেও বরেন্দ্র নামেই তা সমধিক পরিচিত ও জনপ্রিয়। দ্রষ্টব্য: A.K.M. Yakub Ali, *Aspect of Society and Ciulture of the Varendra* (Rajshahi: M.Sajjadur Rahim, 1998), p. preface.

১৩ অজয় রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১।

১৪ *ঐ*, ১০৪-৫।

১৫ সোমপুর (পাহাড়পুর), ত্রিবেণী প্রভৃতি নগর গড়ে উঠেছিল শুধুমাত্র ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে। দ্রষ্টব্য: নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৩-৯৪, ৩০৯।

১৬ "outstanding universal value" এবং নির্দিষ্ট কিছু শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে এই তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদন করা যায়। বিস্তারিত- *http:en.wikipedia.org/wiki/.*

১৭ নীহাররঞ্জন রায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০০।

লিপি ইত্যাদির সমাহার এই প্রত্নস্থলের সুস্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট কোন সীমানা অদ্যপি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অথচ সুস্পষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে চিহ্নিতকরণ এবং প্রয়োজনে অধিগ্রহণ করা আবশ্যিক। অন্যথায় বিনোদন, আবাসন, কৃষি ও অন্যান্য অজুহাতে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্থ এবং দখলের মাধ্যমে এর আকার হ্রাস পেতে থাকবে।

দখলদার সমস্যা নিরসনে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ

যথাযথভাবে নজরদারি ও সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে মহাস্থানগড়ের উপরিভাগে অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত স্থাপনাসমূহ মারাত্মকভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষতি ও সৌন্দর্যহানী ঘটিয়েছে। প্রত্নস্থলের যত্রতত্র বাড়ি-ঘর নির্মাণ, দখল ও বিক্ষিপ্ত চাষাবাদ অব্যাহত রয়েছে। এমনকি সেঁচযন্ত্র ও গভীর নলকূপের ব্যবহার চলছে অবাধে। যা ঐতিহ্যবাহী এ প্রত্নস্থলের বর্হিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ কাঠামোকে আশংকাজনকভাবে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু আইনি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সরকারি প্রত্নতত্ব অধিদপ্তরের সমন্বয়হীনতা, ভূমি অধিগ্রহণে প্রযোজনীয় বাজেট বরাদ্দ না করা এবং স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থের কারণে এই ধ্বংস বন্ধ হচ্ছে না। প্রচলিত Antiquities Act এর সীমাবদ্ধতা এবং সেই আইনের যুগোপযোগী করণ নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের তৎপরতার অভাবও এর জন্য দায়ী বলে ধারণা করা হয়।[১৮] এমতবস্থায় দরকার হলে পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রত্নক্ষেত্র সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যনির্ভর ও সাবলিল উপস্থাপনা

মহাস্থানগড় একটি বিস্তৃত প্রত্নস্থল ও পর্যটনকেন্দ্র। এর বিভিন্ন প্রবেশ মুখে অথবা গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সচিত্র বোর্ড ও ম্যাপ থাকলে আগমণকারীগণ সহজেই বুঝতে পারতেন কোন্ পথে কোথায় তার কাঙ্খিত নিদর্শন রয়েছে এবং কীভাবে সেখানে যেতে হবে। কোন্ কোন্ স্থানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাচীন স্থাপনা রয়েছে, মহাস্থানগড়কেন্দ্রীক গড়ে উঠা কোন শহর-উপশহরের কি অবস্থান, কতটা দূরত্ব, কি বৈশিষ্ট্য এবং কি ইতিহাস ইত্যাদি। অথচ এখানে সে ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। তদুপরি দেশে পেশাদার-অপেশাদার দক্ষ গাইডের অভাব রয়েছে। মূলত একজন দক্ষ গাইডই পারে সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনার মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্থানের পটভূমি, মূল বিষয়বস্তু ও গবেষণালব্ধ তথ্য, সংযুক্ত ঘটনাবলী এবং প্রাপ্ত প্রমাণাদিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে ও পর্যটকদের মনে আগ্রহ জাগাতে। কিন্তু দেশে এর বড়ই অভাব লক্ষ্যণীয়। ফলে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ও ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলোতে পর্যটক, দর্শনার্থী ও অনুসন্ধানী লোকজন ক্ষেত্রবিশেষে বিভ্রান্ত হন অথবা সামান্যতেই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এই সমস্যা নিরসন করে আকর্ষণ ও মনযোগ বাড়াতে হলে বিভিন্ন স্পটে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ম্যাপ, নক্সা ও তথ্যাবলী

---

[১৮] *http://blog.priyo.com/editorpriyo/2011/02/27/1820.html.*

উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রয়োজনে মৌসুমী দক্ষ গাইড নিয়োগ করতে হবে। তাহলে সুফল পাওয়া সম্ভব হবে।

উৎখনন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা

মহাস্থানগড়ের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে এর উৎখনন কার্যক্রম ও তথ্যাবলী হালনাগাদ করতে হবে। এমন কি ভবিষ্যতে এখানে কী ধরনের প্রত্নবস্তু পাবার আশা রয়েছে এবং সেগুলো আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় কী কী সংযোজন করতে পারে তারও সম্ভাব্য তথ্যাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়। তাহলেই কেবল দেশে-বিদেশে আলোচিত-সমালোচিত হবে, দেশের ইতিহাস অধিক আলোকিত হবে এবং এক শ্রেণীর সুধী, পর্যটক ও দর্শনার্থী তৈরী হবে যারা বার বার এখানকার জন্য আকৃষ্ট হবে।

প্রতিটি বিষয়ের যথার্থতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা

মহাস্থানগড় প্রত্নস্থলে প্রদর্শিত ও উপস্থাপিত বিষয়াবলী সম্পর্কে জনমনে যেন বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। যেমন কথিত লক্ষ্মীন্দরের মেধ বা বেহুলার বাসর ঘর, পরশুরামের প্রাসাদ ও শিলাদেবীর ঘাট, জাহাজ ঘাটা, জিয়ৎকুন্ড ইত্যাদি সম্পর্কে জনশ্রুতির পাশাপাশি সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা থাকতে হবে।[১৯]

দর্শনার্থীদের প্রথম দর্শনের অনুভূতি বা ভাবাবেগ (First impression) সম্পর্কে সতর্কতা

অনেক ক্ষেত্রে প্রদর্শিত পুরাকীর্তিকে দেখে এর মূল চরিত্রের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া দুস্কর হয়ে যায়। সুতরাং দর্শনার্থীর শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞতার সাথে তা কখনো কখনো বিরোধপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়।[২০] এ জন্য পুরাকীর্তিকে যথাসম্ভব তার মূল চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সংরক্ষণ, সংস্কার অথবা নবরূপ দান করা অপরিহার্য্য। পুণ্ড্রনগরের বেষ্ঠনী প্রাকার, আবাসগৃহ, মন্দির, মাযার, মসজিদ ইত্যাদির আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ দর্শনে যেন মনে হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পূর্ব হতেই এর অস্তিত্ব ছিল এবং সমগ্র প্রাচীন যুগব্যাপী এই নগরীর নির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।[২১] এর প্রায় সবই নির্ভর করবে যথাযথ উপস্থাপনা ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুযায়ী।

স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্তকরণ

স্থানীয় জনসাধারণ যখন বুঝতে পারবে যে, তারা সংশ্লিষ্ট ঐতিহ্যের ভাল-মন্দের অংশিদার-পরামর্শদাতা, তখন তারা যে কোন সমর্থন ও সহযোগিতার ব্যাপারে অনেক বেশি আগ্রহী ও

---

১৯ ডক্টর নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *মহাস্থান ময়নামতি পাহাড়পুর* (ঢাকা: প্রত্নতত্ত্ব ও যাদুঘর বিভাগ, ১৯৭৯), পৃ. ৩৫-৩৭।

২০ লালবাগ কেল্লাকে অনেকেই বিনোদন পার্ক এবং শৈলকূপা মসজিদকে মোগল আমলের স্থাপনা বলে ভুল করেন।

২১ সুনীতি ভূষণ কানুনগো, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০।

সম্পৃক্ত হবে। এজন্য সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের সাথে পরামর্শ, সভা ও প্রশিক্ষণ কর্মশালা করে তাদের উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে। যারা এই প্রত্নক্ষেত্রের উপরিভাগে স্থায়ীভাবে আবাস গড়েছে তাদের সাথে নীবিড়ভাবে ব্যক্তিগত এবং দলগত বৈঠক করে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে এর ধ্বংস-প্রক্রিয়া বন্ধ করে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণে যে পরিমাণ জনশক্তি থাকা প্রয়োজন তা নেই বলে এখানকার নানা মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি ও পাচার হয়ে যাচ্ছে। এমতবস্থায় স্থানীয় মানুষের মাঝে সচেতনতা ও গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে নানামুখী লাভজনক প্রক্রিয়ার সাথে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হলে অধিকতর সুফল পাওয়া সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, স্থানীয় জনগণের সার্বিক সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যাতীত এধরণের সুবৃহৎ প্রত্নস্থলের নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

সংশ্লিষ্ট (মেলা, পূণ্যস্নান, ওরস) ঐতিহ্যগুলোকে টিকিয়ে রাখা

দীর্ঘ দিনের লালিত বিশ্বাস বা বংশ পরম্পরার অভ্যাসগত কারণে অথবা ঐতিহ্যগতভাবে এবং ভাবাবেগ থেকে বহুসংখ্যক মানুষ মহাস্থানকে তীর্থস্থানের মর্যাদায় আসীন করেছে। সাধারণ মানুষের এই ভাবাবেগকে সম্মান দেখিয়ে এখানে ঐতিহ্যগতভাবে লালিত পূণ্যস্নান, মেলা, ওরসসহ অপরাপর অনুষ্ঠানগুলোকে টিকিয়ে রাখতে সহযোগিতা করতে হবে।[২২] উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদি চলাকালে সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করতে হবে এবং দালিলিক বিষয়াবলী উপস্থাপনের মাধ্যমে ঐন্দ্রজালিক আবহের সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে জনমনে অনুষ্ঠানের মাহাত্ন, স্থানের গুরুত্ব ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।

দেশে-বিদেশে ব্যাপক প্রচার:

মহাস্থানগড়ের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব, প্রাচীনত্ব এবং ঐতিহ্যগত বিষয়গুলো সম্পর্কে দেশে-বিদেশে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, বিজ্ঞপ্তি, লিখনী এবং গণমাধ্যম দ্বারা ব্যাপক প্রচার করতে হবে। বিশেষত: ছোট পুস্তিকা, চিত্রাবলী, ব্রুসিয়ার ইত্যাদির মাধ্যমে এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে; হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনার মাধ্যমে পর্যটক আকৃষ্ট করতে হবে।

আবাসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

দেশি-বিদেশি তথা দূর-দূরান্ত হতে আগমণকারীদের জন্য নিরাপত্তা ও আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং অপরাপর সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে হবে। আগত ভ্রমণ পিপাসু শিক্ষার্থী, পর্যটক তথা দেশী-বিদেশী জনগণ এখানে এসে যেন বিব্রতবোধ না করে বরং স্বাচ্ছন্দবোধ করেন এবং নিশ্চিন্তে চলাফেরা ও অবস্থান করতে সক্ষম হন।

---

২২ ডক্টর নাজিমুদ্দিন আহমেদ, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৭।

প্যাকেজ ঘোষণা

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিজেরা অথবা অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে যদি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযোগ রক্ষা করে নানা ধরনের প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারে, তাহলেও স্বচেতন পর্যটক বা দর্শনার্থী তৈরীতে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

পর্যটকদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ

মহাস্থানগড়ের বিশাল ঐতিহাসিক পটভূমি থাকায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এবং দেশের বাইরের বহু নারী-পুরুষের আগমণ ঘটে প্রতিদিন। বিশেষ করে মুসলমান ও হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে এবং বার্ষিক ওরস, মেলা ইত্যাদি কারণে কখনো কখনো অস্বাভাবিক ভীড় এবং পর্যটক তথা আগমণকারীদের নিয়ন্ত্রণহীন আচরণ অনেক সময় পুরাকীর্তির ভয়াবহ ক্ষতি করে থাকে।[২৩] প্রচলিত প্রত্নতত্ত্ব আইনের যথাযথ প্রয়োগ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও তদরকি দ্বারা এ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।[২৪] সুনির্দিষ্ট অনুষ্ঠানাদি ও বিশেষ মৌসুমে স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণকে সম্পৃক্ত করে স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর দ্বারাও এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব।

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

Heritage Management Process এর আলোকে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করে এসব ঐতিহ্যকে সঠিক পরিচর্যা ও সুরক্ষা সহজেই করা সম্ভব।[২৫] অন্যথায় পৃথিবীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকীর্তির মতো মহাস্থানগড় হুমকির মুখে পড়তে পারে। কারণ সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রত্নস্থল কালের গর্ভে বিলিন হয়ে যাবার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দেয়। সুতরাং সময়োপযোগী পরিকল্পনা ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

প্রতিটি জনপদ বা নগরীর বিকাশের পশ্চাতে রয়েছে বহুবিধ কাহিনী, কিংবদন্তী ও নিরেট বাস্তবতা। সুদূর অতীতের পুণ্ড্রনগর এবং আজকের মহাস্থানগড় এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে ঐতিহাসিক কাল থেকে ঔপনিবেশিক সময়কাল পর্যন্ত ধারাবাহিক বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে প্রকাশিত বাংলাদেশ-ফ্রান্স যৌথ উৎখনন কার্যক্রমের

---

[২৩] আগমণকারীরা অনেক সময় যত্রতত্র খোঁড়াখুড়ি করে, চুলা তৈরি করে, খুঁটি পুঁতে পুরাকীর্তির উপরিভাগ ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে। বিশেষ করে জিয়ৎকুন্ড প্রাঙ্গন এবং মাযার প্রাঙ্গনের পশ্চিম পাশ প্রায়শই এধরনের অবস্থার স্বীকার হয় ।

[২৪] *The Antiquities Act*, 1968, p. 9 of 13 (file:///F:/001-2011-12-Dhaka Bangladesh-UNESCO/005-Docs for prin..), 23/11/11 16:47

[২৫] Training and Capacity Building for long-term Management and best practice Conservation for Preservation of Cultural Heritage Sites and World Heritage Properties in Bangladesh (30 November-06 December 2011)-এ Department of Archaeology কর্তৃক সরবরাহকৃত *Heritage Management Process*.

প্রতিবেদনের আলোকে এই অঞ্চলের প্রাচীনতম সময়কাল নির্দেশিত হয়েছে খ্রি. পূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতক।[২৬] অজানা অতীতকাল হতে অদ্যাবধি উদ্ঘাটিত এবং অনুদ্ঘাটিত তথ্যাবলি একে চেনা-জানা এক রহস্যপূরীতে পরিণত করেছে। অথচ জাতীয় পরিচয়ের অন্যতম প্রতীক প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ইতিহাস বিনির্মাণে সবসময় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত। কারণ এগুলো সংশ্লিষ্ট সময়ের নগরী, জনপদ, রাজ্য, শাসক বংশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। তাই ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা ইতিহাস বিনির্মাণ ও পুনর্গঠনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে। সুতরাং নিজেদের মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রত্নসম্পদ সম্পর্কে সজাগ ও সক্রিয় হতে হবে। জানতে হবে কোথায় আমাদের শক্তি ও গর্ব এবং কোথায় আমাদের দুর্বলতা।

সমগ্র বিশ্বের বিশেষত এশিয়ার প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যগুলো হুমকির সম্মুখীণ। এগুলো কেবল সময়ের সাথে সাথে প্রথাগত পদ্ধতিতেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে না বরং জলবায়ু এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিস্ময়কর এই পরিবর্তন ক্ষতি বা ধ্বংসের পরিণতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। তদুপরি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ নীতি, যুদ্ধ এবং পর্যটন শিল্পের বাড়াবাড়ির কারণে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। এমতবস্থায় আধুনিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলো নিজ নিজ ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিল্প, সংস্কৃতি অনুসন্ধানের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা উন্নয়নের যে তৎপরতা শুরু করেছে তাতে অংশ নেয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য। পুণ্ড্রনগর তথা মহাস্থানগড় এখনো প্রায় লুক্কায়িত সৌন্দর্য। অথচ এশিয়ার সবচেয়ে হুমকির মুখে থাকা দশটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনার তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের মহাস্থানগড়।[২৭] এটি অবমুক্ত করার মাধ্যমে বোধগম্য হবে প্রকৃত রহস্যময়তা, জানতে হবে নিজেদের, জানাতে হবে নতুন প্রজন্ম এবং বিশ্ববাসীকে। রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে সবাইকে। ইতোমধ্যেই মসজিদের শহর বাগেরহাট ও নওগাঁর পাহাড়পুরকে বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে নিজেদের পরিচিতি এবং অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করেছে। ঠিক তেমনি মহাস্থানগড়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই ইতিহাস-ঐতিহ্যখ্যাত স্থানটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভূক্ত করা এখন সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে একদিকে আমাদের পর্যটন শিল্প যেমন বিকাশিত হবে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা যে আরো বেগবান হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে আশু পদক্ষেপ গ্রহণে তৎপর হবেন বলে প্রত্যাশা করা যায়।

---

[২৬] *htt://.blog.priyo.com/editorpriyo/2011/02/27/1820.html.*

[২৭] এশিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এমন উদ্বেগ প্রকাশ করেছে গ্লোবাল হেরিটেজ ফান্ড-জিএইচএফ। সংস্থাটির প্রতিবেদনে এসব উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তারিত- http://www.dw.de/

পুণ্ডবর্ধন তথা মহাস্থানগড়ের অবস্থান, ম্যাপ ও কয়েকটি দৃশ্য

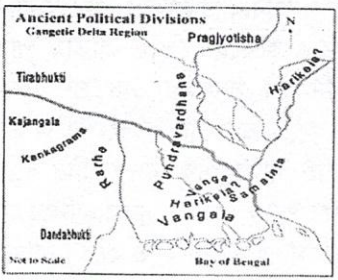

সূত্র: *http://en.wikipedia.org/wiki/Mahasthangarh*

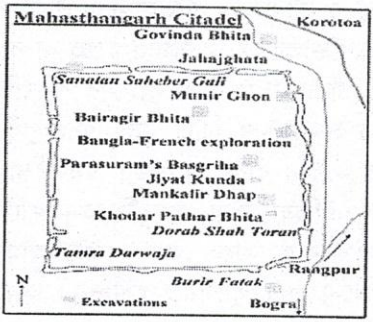

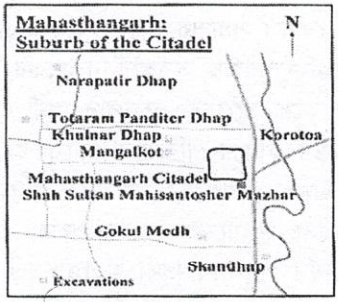

সূত্র: *http://en.wikipedia.org/wiki/Mahasthangarh*

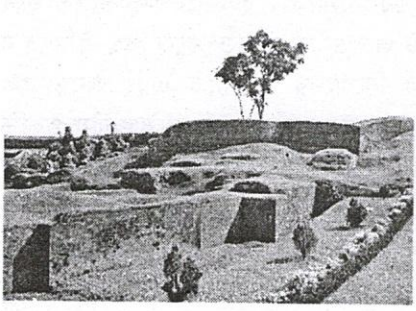

মহাস্থানগড়ের উপরিভাগের সাধারণ দৃশ্যাবলী সূত্র*http://en.www.wikipedia.org/wiki/Mahasthangarh*

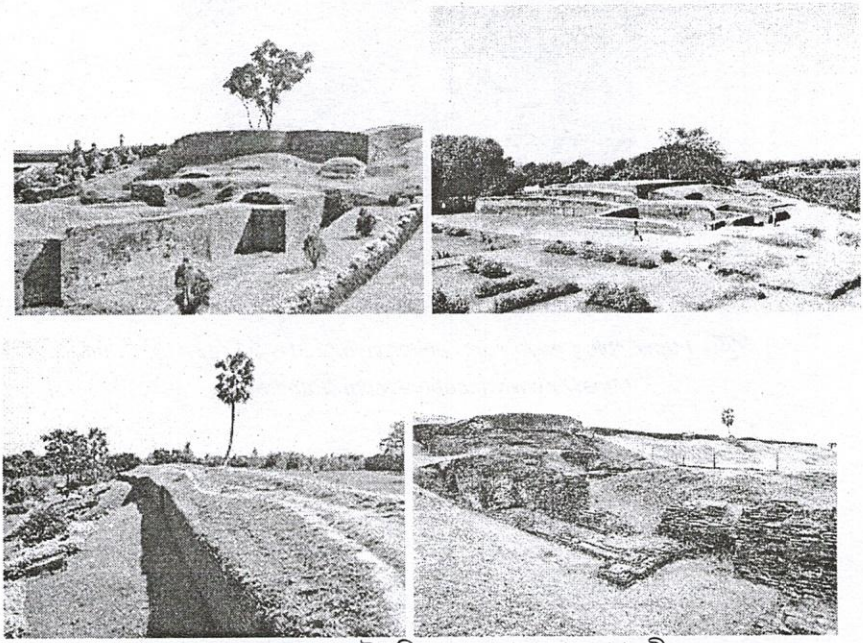

মহাস্থানগড়ের উপরিভাগের সাধারণ দৃশ্যাবলী

সূত্র: *http://en.www.wikipedia.org/wiki/Mahasthangarh*

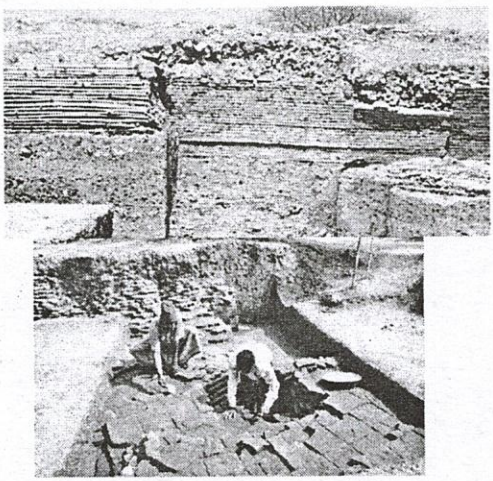

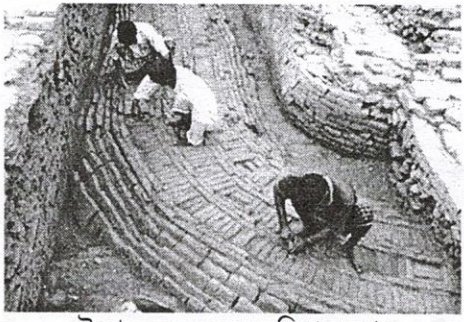

উৎখননে অবমুক্ত কতিপয় দৃশ্য

সূত্রঃ *http://blog.priyo.com/editorpriyo/2011/02/27/1820.html; https://www.facebook.com/PundraCity*

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

পাবনার তাড়াশ জমিদার বংশ : উদ্ভব ও বিকাশ ১৫৫১-১৯৫০

মোঃ সামছুল আলম*

Abstract: This article tries to unveil the origin and development of the Tarash Zamindar of Pabna, which has hitherto remained largely neglected. In this article the author tries to throw light on the lineage of the Tarash Zamidars.

ভূমিকা

বাংলাদেশের জেলা সমূহের মধ্যে উত্তরাঞ্চলীয় পাবনা জেলা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। এ জেলাটি জমিদার অধ্যুষিত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত ছিল। জমিদার শব্দটি বাংলাদেশের ইতিহাসে বহুল পরিচিত। এটি একটি ফারসি শব্দ, জমিনদার (ভূমি রক্ষক) শব্দ থেকে এর উৎপত্তি।[১] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইরফান হবিবের মতে, অন্যের দখলে থাকা জমির উপর যার স্বত্ব আছে তাকে সাধারণ ভাবে জমিদার বলা হয়।[২] ভূমি পরিভাষায় যিনি রাষ্ট্রকে সরাসরি রাজস্ব প্রদান করেন তিনিই জমিদার।[৩] চতুর্দশ শতাব্দিতে জমিদার শব্দটির প্রথম ব্যবহার দেখা গেলেও এর প্রকৃত বিস্তার লাভ করে বাদশাহী মুঘল আমলে। মুঘল আমলে ভূম্যধিকারীদের জমিদার উপাধি দেওয়া হতো। পূর্বে জমিদারগণ ভূঁইয়া নামে পরিচিত ছিল। ভূঁইয়া বা জমিদারদের বিষয় সম্পদ বৃহৎ আকারের হলে তারা যথাক্রমে রাজা, মহারাজা, রায় চৌধুরী, রায় বাহাদুর, খান বাহাদুর ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হতেন।[৪] বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় পাবনা জেলার জমিদারদের মধ্যে তাড়াশ জমিদার ছিলেন অন্যতম। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্টপোষক বাংলার অন্যান্য জমিদারদের ন্যায় তাড়াশ জমিদার কৃষকদের শোষণ ও নির্যাতনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও এ বংশের কয়েকজন কীর্তিমান জমিদার সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যের দ্বারা খ্যাতি লাভ করেন। তাড়াশ জমিদারদের অত্যাচারী চরিত্রের পাশাপাশি তাদের ব্যক্তিগত আচার আচরণ, চারিত্রিক গুনাবলি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক কার্যাবলী এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত জমিদার বাড়ি বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আলোচনার প্রয়াস রয়েছে।

পাবনা জেলার রাজা ও জমিদার

পাবনার তাড়াশ জমিদার ও জমিদারি সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে পাবনার প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বৃহত্তর পাবনার অধিকাংশ এলাকা রাজশাহী ও যশোর জেলার অন্তর্ভুক্ত

* প্রভাষক, ইতিহাস বিভাগ, দিঘলীয়া এ. জেড, স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ফরিদপুর, পাবনা।

ছিল। পদ্মা-যমুনা আর চলনবিল অধ্যুষিত এ অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল নানাভাবে দুর্গম। এখানে ডাকাত বা দস্যু-তস্করদের উপদ্রব ছিল বেশি। বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে মানুষের নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কোন সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা ছিল না। একদিকে প্রশাসনিক অক্ষমতা, অন্যদিকে স্থানীয় জমিদারদের সাথে অপরাধীদের আঁতাত এ অঞ্চলে অপরাধ প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কাজেই প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এইরূপ শিথিলতা ও জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে পাবনা জেলার জন্ম হয়। ১৮২৮ সালে গঠিত পাবনা জেলাটি পূর্বে ভারতের বঙ্গ ও পুণ্ড্রবর্ধন প্রদেশদ্বয়ের অন্তর্গত ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৩১ সালে বগুড়া মহাস্থান গড়ে প্রাপ্ত একটি ব্রাহ্মী লিপি থেকে জানা যায় যে, এ অঞ্চলের উপর মৌর্যদের শাসন ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল। মৌর্যদের পতনের পর পাবনা অঞ্চলসহ সমগ্র বাংলার এতদঞ্চলের রাজনৈতিক অবস্থার ইতিহাস সঠিক ভাবে জানা যায় না। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে পূর্ব বাংলা (সমতট) ছাড়া সমগ্র বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হলে পাবনা অঞ্চল সমুদ্র গুপ্তের শাসনাধীনে আসে। সপ্তম শতকে রাজা শশাঙ্ক এ অঞ্চলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। পাল ও সেন রাজাদের আমলেও পাবনা অঞ্চল তাদের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী কর্তৃক বাংলা বিজিত হলে পাবনা অঞ্চল সর্বপ্রথম মুসলমানদের অধীকারে আসে। সুলতানী ও মুঘল আমলে পাবনা অঞ্চলটি তাদের শাসনাধীনে পরিচালিত হয়। নবাবী আমলে পাবনা অঞ্চল রাজশাহীর জমিদার নাটোর রাজ রামজীবনের অধীনে চলে যায়।[৫] এর পর ১৭৫৭ সালের পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজ বেনিয়াদের কর্তৃত্ব স্থাপন এবং ১৭৬৫ সালে কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন শুরু হলে ক্রমান্বয়ে পাবনা অঞ্চল তাদের শাসন ভুক্ত হয়।[৬] ১৮২৮ সালের ১৬ অক্টোবর রাজশাহী জেলা থেকে পাবনা, শাহজাদপুর, রায়গঞ্জ, মথুরা (বেড়া), ক্ষেতুপাড়া থানা, এবং যশোর জেলা থেকে ধর্মপুর (পাংশা) কুষ্টিয়া ও মধুপুর থানা নিয়ে পাবনা জেলার সৃষ্টি হয়। ১৮৪৮ সালের ১৭ অক্টোবর যমুনা নদীকে পাবনার পূর্ব সীমানা নির্দিষ্ট করা হয়। ১৮৫৫ সালের ১২ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ থানাকে ময়মনসিংহ জেলা থেকে পৃথক করে পাবনা জেলাভুক্ত করা হয়। ১৮৫৯ সালে পাংশা, খোকশা, ও বালিয়াকান্দী থানাসমূহ নিয়ে কুমারখালি নামে একটি মহকুমা গঠিত হয়। ১৮৬২-৬৩ সালে কুষ্টিয়া মহকুমাকে পাবনা জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৮৭১ সালের ২৭ মার্চ পদ্মাকে পাবনার দক্ষিণ সীমা ধরে পাংশাকে পাবনা থেকে আলদা করে ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমা এবং কুমারখালী থানা নদীয়া জেলাভুক্ত করা হয়। এভাবে ১৭৭২ থেকে ১৮২৮ সাল পর্যন্ত পাবনা ছিল রাজশাহী জেলাভুক্ত। এর পরবর্তী পঞ্চাশ বছর পাবনার সীমানা পরিবর্তন হতে থাকে।[৭] পাবনার ভূস্বামীদের মধ্যে সান্যাল ও ভাদুড়ী নামক দু'টি বংশ বরেন্দ্র ভূমিতে সর্বপ্রথম সাঁতৈল এবং ভাদুড়ী নামে দুটি রাজ্যের সৃষ্টি করেন। আলোচ্য তাড়াশ রায় বংশের মহলটি সাঁতৈল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পাবনায় তখন আরও একটি জমিদার বংশ ছিল বলে জানা যায়। বাগ কাশীনাথ পুরের কালিয়া বংশ। এ দুটি বংশই পাবনার

জমিদারদের মধ্যে অন্যতম প্রধান রাজ বংশ বলে পরিচিত। তবে তাড়াশ জমিদার বংশ পাবনা জেলার মধ্যে সবচেয়ে নামকরা ও পুরাতন বলে প্রসিদ্ধ ছিল ।[৮]

সাঁতৈল ও ভাদুড়ীয়া রাজ বংশের উৎপত্তির ইতিহাস

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৮) সময় থেকে বাংলা ও বিহারে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল খুব কম ৩০/৩৫ হাজারের মত। তাই স্বল্প সংখ্যক মুসলমান দিয়ে বাংলার প্রশাসন চালানো যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি সেনাবাহিনীর আক্রমণ মোকাবিলা করাও প্রায় অসম্ভব ছিল। সুতরাং ইলিয়াস শাহ একদল হিন্দু সৈন্য সংগ্রহ করেন। তিনি 'দামনাশ' হতে শিখাই সান্যাল এবং ভাজনী হতে সুবুদ্ধি রাম ভাদুড়ী, কেশব রায় ভাদুড়ী এবং জগদানন্দ ভাদুড়ীকে আহবান করে নিজ উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করেন। সান্যাল ও ভাদুড়ীত্রয় ইলিয়াস শাহের প্রশাসনিক কার্যে সহায়তা করেন। এ জন্য ইলিয়াস শাহ খুশি হয়ে তাদেরকে দুটি বিশাল জায়গির প্রদান করেন। 'শিখান সান্যালের জায়গির পদ্মার উত্তরে চলন বিলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। সান্যাল গড় বা সাঁতোড় তাঁর রাজধানী ছিল বলে মনে করা হয়। সান্যালদের প্রতিষ্ঠিত মহলটি সাঁতৈল রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে।

ভাদুড়ীদের জায়গির ছিল চলন বিলের উত্তরে। তাদের জায়গির ভাদুড়ী নামে পরিচিত হয়। উত্তরে দিনাজপুর, পূর্বে করতোয়া, দক্ষিণে গঙ্গা, পশ্চিমে মহানন্দা ও তার উপনদী পুনর্ভবা বেষ্টিত আত্রাই নদীর উভয় তীরস্থ প্রদেশ ভাদুড়ীয়া পরগণা নামে খ্যাত। আত্রাই স্টেশনের ৬ মাইল পূর্বে 'সপ্তদুর্গপুরী' তাদের রাজধানী ছিল বলে জানা যায়।

বাংলায় মুঘল অভিযানের সময় পর্যন্ত সাঁতৈল ও ভাদুড়ীয়া জমিদারি দুটো অক্ষুন্ন ছিল। মুঘল সম্রাট জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) এর সৈন্যবাহিনী কর্তৃক বাংলা বিজয়ের সময় (১৫৭৬) ভাদুড়ীয়া জমিদার পাঠান পক্ষ এবং সাঁতৈল জমিদার মুঘল পক্ষ অবলম্বন করে। মুঘলদের বিজয় ঘটলে ভাদুড়ীয়া জমিদারির ৭টি পরগণার মধ্যে ৫টি পরগণা সাঁতৈল জমিদারির অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে ভাদুড়ীয়া জমিদারের ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং সাঁতৈল জমিদারির প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।[৯]

তাড়াশ জমিদার বংশ

পাবনা জেলাস্থ বিখ্যাত তাড়াশ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব তালুকদার ওরফে নারায়ণদেব তাড়াশ থেকে প্রায় ১৬ কি. মি. দূরে দেবচড়িয়া নামক গ্রামে বসবাস করতেন। তিনি ঢাকায় মুঘল সুবেদার ইসলাম খাঁর (১৬০৮-১৬১৩) অধীনে চাকরি করতেন। তার সততা ও নিষ্ঠায় খুশি হয়ে সুবেদার তাকে তাড়াশ মহলাদির জায়গির প্রদান করেন এবং 'রায় চৌধুরী' উপাধি দেন। সে সময়ে পরগণে কাটার মহল্লা রাজশাহীর সাঁতৈল রাজ্যের অংশ ছিল। এর প্রায় দু'শত মৌজা নিয়ে এ " তাড়াশ" জমিদারির সৃষ্টি হয়। বাসুদেব তালুকদার ওরফে নারায়ণদেব এর জন্ম মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না।

তবে ষোড়শ শতাব্দির শেষভাগে (আনুমানিক ১৫৫১-১৫৬০ সালের মধ্যে) তার জীবনকাল শুরু এবং ১৬৩৫ সালের পরে সমাপ্তি বলে মনে করা হয়।[১০]

তাড়াশ রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাসুদেব তালুকদার ও তার পরিবার সম্পর্কে বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ঢাকুর নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

আর এক কহি শুন দেব অনুপম।
চড়িয়া গ্রামেতে বাস শুকদেব নাম।।
শুকদেব পুত্র বাসুদেব তালুকদার।
তাহার যশের কথা শুনহ বিস্তার।।
ধনবান কীর্তিবন্ত বিষয় ব্যাপারে।
তাহার পুত্র চাকরি কৈলা নবাব সরকারে।।
সেই বংশে উদ্ভবিলা বলরাম রায়।
পিতামহ কার্য কৈলা বারেন্দ্র আশ্রয়।।
নিরাবিল কার্য সব করিতে লাগিল।
দাস নন্দী চাকী সবে অন্নভুক্ত হৈল।।
তাহার সন্তান সব বাড়িল সম্ভ্রমে।
বায়ান্ন লক্ষের কর্তা পুরুষানুক্রমে।
তাড়াশ বাসী দেব কারণে প্রধান।
সর্ব ঘর ব্যাপিত হইয়া পাইল সম্মান।[১১]

নাটোর রাজবংশ বায়ান্ন লক্ষ তেপ্পান্ন হাজারের জমিদার বলে কথিত হয়ে থাকে। তাড়াশ জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ বাসুদেব তালুকদার ওরফে নারায়ণদেবের পৌত্র রামরাম রায় (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়কৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র) নাটোরের রাজা রাম জীবনের (১৭০৬-১৭৩০) সময় থেকে উক্ত রাজবংশের দেওয়ান ছিলেন। খুব সম্ভবতঃ এ জন্যই ''বায়ান্ন লক্ষের কর্তা'' বলে ঢাকুরে উল্লেখ করা হয়েছে। তাড়াশ জমিদার বংশের কতজন নাটোর রাজার অধীনে চাকরি করেছেন তা বলা কঠিন। তবে এ বংশের অনেকেই বংশানুক্রমে মুঘল সুবেদারদের অধীনে চাকরি করেছেন বলে জানা যায়।[১২]

বাসুদেব তালুকদার এর জ্যেষ্ঠপুত্র জয়কৃষ্ণ রায় এবং কনিষ্ঠপুত্র রামনাথ রায় উভয় ভ্রাতাই ঢাকার মুঘল সুবেদারদের সেরেস্তায় চাকরি করে সুনাম অর্জন করেন। তবে কোন সুবেদারের অধীনে চাকরি করতেন সঠিক জানা যায় না। আনুমানিক সুবেদার ইসলাম খাঁর পরবর্তী সুবেদার কাসিম খান চিশতী (১৬১৩-১৬১৭) এবং সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর আমলে (১৬১৭-১৬২৪) চাকরি করে থাকতে পারে। জয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরীর সাত পুত্র ছিল। যথাক্রমে- রাজারাম, হরেরাম, রামবল্লভ, রামদেব, বলরাম, হরিরাম ও রামরাম। এদের মধ্যে রামদেব, বলরাম ও রামরাম ছাড়া অন্য কারো বংশ বৃদ্ধি হয়নি। জয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাজারাম, বলরাম রায় ছিলেন পঞ্চম পুত্র। বলরাম রায় বাংলার সুবেদার আজিমুশ্শানের (১৬৯৭-১৭১২) দেওয়ানের কাজ করতেন। তিনি প্রভূত অর্থশালী হলে চাকরি ছেড়ে পৈতৃক বিষয় সম্পদ দেখাশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একজন পরম ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হিসেবে তার যথেষ্ট পরিচিতি ছিল। তিনি তাড়াশে কুঞ্জবন নামে সরোবর

দুটি খননসহ গয়া, কাশী ও বৃন্দাবনে অন্নসত্র স্থাপন করেন।[১৩] তাড়াশের কপিলেশ্বর শিবমন্দিরের গায়ে খোচিত একটি শ্লোকে বলা হয়েছে,

শাকে বাজিশরাশুগেন্দু গণিতে শ্রীরাম দেবাৎ পরঃ।
শ্রী নারায়ণদেব এব সুকৃতি ঃ স্বর্ল্লোক লোকেত্তর ঃ।
প্রাসাদাং শ্রুতি দৃষ্টতো নিরূপমং ভক্ত্যা দদৌ সম্ভবে।
মাতুঃস্বর্গসুখ প্রয়াণ করেণ সোপনমেকং ভূবি।
ইতি শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৫৭ শ্রী গৌরাঙ্গ জয়তি।[১৪]

১৬৩৫ সালে কীর্তিমান নারায়ণদেব মাতার স্বর্গারোহণ সৌকর্যার্থে পৃথিবীতে সোপান স্বরূপ অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব এ মন্দির শম্ভুকে দান করেছিলেন ।[১৫] জনশ্রুতি আছে যে, ১৬১২ সালে সুবাদার ইসলাম খান যখন রাজমহল থেকে বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থাপন করেন।[১৬] সে সময় খ্রিষ্ট্রিয় সপ্তদশ শতকের কোন একদিন নারায়ণদেব ঢাকা যাওয়ার পথে দেখেন, চলন বিলের মধ্যে একটি জায়গায় একটি দুগ্ধবতী গাভী তার দুগ্ধক্ষরণ করছে। তিনি দেখা মাত্র গাভীটি অদৃশ্য হয়। এ দৃশ্য তার কাছে কৌতুহলের সৃষ্টি করে এবং তার মধ্যে বিষয়টি জানার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায়। তিনি দুগ্ধক্ষরণ স্থানটির মাটি সরিয়ে একটি শিব লিঙ্গ দেখতে পান। এ ঘটনাটি তাকে বিস্মিত করে। তিনি ঢাকা গিয়ে তার কাজ কর্ম সম্পন্ন করে বাড়ি ফিরে এসে উক্ত শিবলিঙ্গটি নিজ গ্রাম চড়িয়াতে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু মাটি খুঁড়ে শিবলিঙ্গটি ওঠানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি বহু টাকা খরচ করে এখানে একটি শিবমন্দির নির্মাণ করেন। কালক্রমে তিনি নিজ গ্রাম ত্যাগ করে এখানে স্থায়ী নিবাস গড়ে তুলেছিলেন বলে মনে করা হয়। কারুকার্য খচিত এ শিবমন্দিরটি তাড়াশের কপিলেশ্বর শিবমন্দির নামে পরিচিত।[১৭]

কপিলেশ্বর শিব মন্দিরটি বর্গাকৃতি এবং বাইরের দিক থেকে এর পরিমাপ দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট এবং প্রস্থ ১৭ ফুট। অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ ৯ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৯ ফুট ৬ ইঞ্চি। ভূমি থেকে ছাদ পর্যন্ত এর উচ্চতা ১০ ফুট এবং মন্দিরের ছাদ থেকে চূড়া পর্যন্ত উচ্চতা ৩৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। বর্গাকৃতির মন্দির ভবনের ছাদ চারদিক থেকে পিরামিডের ন্যায় ক্রমশ, সরু হয়ে মন্দির শীর্ষে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। এ মন্দিরটি দক্ষিণ দোয়ারে। এর প্রবেশ পথের উচ্চতা ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। অভ্যন্তর ও বাইরের দেয়ালে পলেস্তরা প্রলেপিত এবং বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি ও কৃষ্ণলীলার চিত্র উৎকীর্ণ করা হয়েছে।[১৮] প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক ডেভিড ম্যাক্কাচান তাড়াশের এ শিবমন্দিরটিকে চালা রীতির অন্যতম সপ্তদশ শতকের চারচালা মন্দির হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৯] সংস্কৃত ভাষায় এ মন্দিরের গায়ে অপর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে,

কালাগ্নি তুর্কেন্দুমিতে শকাব্দে
বরং শিব স্যালয়মিষ্টি কাদ্যে ঃ।
জীর্ণং ফুটধ্বোদ্বরতেস্ম ভক্ত্যা
তস্মিন প্রবীণ বলরাম দাসঃ।[২০]

১৭১৪ সালে প্রবীণ বলরাম দাস ভক্তিসহকারে ইস্টকাদি দ্বারা এ কপিলেশ্বর শিব মন্দিরটির জীর্ণ সংস্কার করেছিলেন। এ মন্দির সংস্কার সম্পর্কে জানা যায় বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামরাম রায় নাটোর রাজা রামজীবনের দেওয়ান থাকা কালে মাতার মৃত্যু হয়। এ সময়ে বলরাম ঢাকায় ছিলেন এবং মাতৃদর্শনে ব্যর্থ হন। সে জন্য তিনি লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করতে মনস্থ করেন। তাই বলরাম রায় কনিষ্ঠ ভ্রাতকে পত্র লিখে অবগত করেন,

তুমি সামান্য জমিদারের অধীনে কার্যকর এবং সাংসারিক
অবস্থাও স্বচ্ছল নয়। অতএব তুমি সামান্য শ্রাদ্ধের আয়োজন করিবে।
আমি যথাসময়ে বাটী পৌছিয়া দান সাগরের উদ্যোগ করিব।

রাজা রামজীবন এ পত্রের বিষয় অবগত হয়ে দেওয়ান রামরাম রায়কে লক্ষাধিক টাকা সাহায্য করে মাতৃ শ্রাদ্ধের আয়োজন করান। বলরাম রায় বাড়ি এসে বিশাল শ্রাদ্ধের আয়োজন দেখে হতবাক হন।[২১] উল্লেখ্য যে রাজা রামজীবন ছিলেন নাটোরের বিশাল জমিদার। তার এ বিশাল জমিদারি লাভের পিছনে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনন্দনের ভূমিকা ছিল বেশি। রঘুনন্দন দিল্লীশ্বর সম্রাট আলমগীরের সময়ে পুঠিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের মোক্তার বা উকিল হিসেবে ঢাকায় নবাব বা সুবেদার দরবারে কাজ করতেন। এক সময় বার বুদ্ধি বলে তিনি দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন এবং সহকারী কানুনগো পদে পদোন্নতি পান।[২২] তিনি বিভিন্ন সময় রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন পরগণা কৌশলে তার ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করেন। যেমন, নাটোর রাজ পরিবারের প্রথম জমিদারি লাভ ১৭০৬ সালে বানগাছি পরগণা লাভের মাধ্যমে। পরগণে বানগাছির জমিদার গনেশরাম ও ভগবতীচরণ সরকারের নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে রঘুনন্দন এ জমিদারি রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করান। ঐ বছরই (১৭০৬) রামজীবন দিল্লীশ্বর আরমগীরের কাছ থেকে ২২ খানা খেলাত ও 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।[২২]

১৭২৫ সালে মুর্শিদকুলী খাঁর দেওয়ান রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর হাবেলি, মাহমুদপুর ,সাহুজীয়াণ, তুঞ্জী এবং স্বরূপপুর প্রভৃতি জমিদারের জমিদারি বাজেয়াপ্ত হয়। নবাব তাদের জমিদারি রামজীবনকে দেন। এভাবে লস্করপুর, তাহিরপুর ও বার্বাকপুর, পরগণা ছাড়া বর্তমানে রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, ফরিদপুর, মালদহ, ভাগলপুর প্রভৃতি জেলাতে প্রায় ১৩৯টি পরগণা রামজীবনের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার রাজ্যের ব্যাপ্তি ছিল ১২,০০০(বারো হাজার) বর্গমাইলের বেশি।[২৩]

হলওয়েল রাজা রামজীবনের জমিদারি সম্পর্কে বলেছেন যে, এর সীমা অতিক্রম করতে প্রায় ৩৫ দিনের প্রয়োজন হতো। জেমস্ গ্রান্টের মতে, বাংলায়, এমনকি সমগ্র ভারতবর্ষেও এটি ছিল সর্ববৃহৎ জমিদারি। রামজীবনের জমিদারির বাৎসরিক আয় ছিল ন্যূনধিক দুই কোটি টাকা, তন্মধ্যে রাজস্ব প্রদান করতে হতো ৫২,৫৩,০০০ টাকা।[২৪] সুতরাং রাজা রামজীবন সামান্য কি অসামান্য জমিদার ছিলেন তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য দেওয়ান রামরাম রায়কে লক্ষাধিক টাকা সাহায্য করেছিলেন বলে মনে করা হয়। এদিকে বলরাম রায় যে লক্ষাধিক টাকা সঙ্গে নিয়ে আসেন, সে টাকা দিয়ে তাড়াশ কপিলেশ্বর শিবমন্দিরের জীর্ণ

সংস্কার (১৭১২) এবং নিজ বাসভবনে রসিক রায় নামক রাধাকৃষ্ণ মূর্তি স্থাপন ও দ্বিতল দোলমঞ্চ নির্মাণ করেন (১৭১৮)। বলরাম রায়ের সময়ে ঢাকা-চাটমোহর-তাড়াশ শাহী পথটি তৈরি হয়। ১৭৩৪ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।[২৫]

বলরামের মৃত্যুর পর তার পুত্রদ্বয় ও ভ্রাতাগণ পৃথক অন্নে বিভক্ত হন। বলরামের পুত্রগণ বড় তরফ, রামদেবের অংশ মধ্যম তরফ এবং রামরামের অংশ ছোট তরফ নামে পরিচিত হয়। প্রকৃত পক্ষে বাসুদেব তালুকদার তাড়াশ জমিদার বংশের আদি পুরুষ। পরবর্তী বংশধরগণ নয় শরিকে বিভক্ত হয়। কোন কোন শরিক অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও তাদের দৌহিত্র বংশ সম্পত্তি ভোগ করনে এবং তা থেকে এ বংশে মজুমদার, চৌধুরী, নন্দী প্রভৃতি উপাধির সৃষ্টি হয়।[২৬]

বনওয়ারীলাল

বাসুদেব তালুকদারের পঞ্চম পুরুষ রাম সুন্দরের পর বড় তরফ অপুত্রক হয়। এ জন্য পরবর্তী চার পুরুষ পর্যন্ত দত্তক গ্রহণ করে এ বংশের অস্তিত্ব রক্ষা করা হয়েছিল বলে জানা যায়।[২৭] রাম সুন্দরের প্রপৌত্র (দত্তক) বনওয়ারীলাল রায় একজন প্রতিষ্ঠাবান ও পরোপকারী জমিদার ছিলেন। তিনি পাবনা জেলার মধ্যে একজন সুদক্ষ ও সাহসী শিকারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাড়াশের উত্তরাঞ্চলে নিমগাছি এক সময় বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। তথায় বহু বন্য মহিষ ও জীবজন্তু বসবাস করতো।[২৮] অথচ তাড়াশে তখন জনবসতির ঘনত্ব ছিল পাবনা জেলার মধ্যে সবচেয়ে কম (১৯২১ সালে মাইল প্রতি ২১২ জন)। সুতরাং বন জঙ্গল পরিস্কার করার উদ্দেশ্যে বনওয়ারীলাল রায় সাঁতৈল পরগণা থেকে বহু সাঁতৈল, কোল, ভীল, মুন্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের তাড়াশ আনার ব্যবস্থা করেন এবং তাদেরকে নিষ্কর জমি দান করেন। ফলে তাড়াশের বন জঙ্গল পরিস্কার করে এলাকাটি আবাদ যোগ্য করা সম্ভব হয়।[২৯]

বনওয়ারীনগরের নামকরণ ও জমিদার বাড়ির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস

তদানিন্তন পাবনার অন্তর্গত তাড়াশের জমিদার ছিলেন বনওয়ারীলাল রায়। তিনি আন্দন উপভোগ করার জন্য শিকার করতেন। এ জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে ঘুড়ে বেড়াতেন। এ ধারাবাহিকতায় তিনি মাঝে মধ্যে শিকারের আশায় ফরিদপুরে আসতেন। বর্তমান পাবনার ফরিদপুর জমিদার বাড়িটি এক সময় বিল সংলগ্ন এলাকা ছিল। স্থানীয় জনগণের নিকট এটি কচাকাটার বিল নামে পরিচিত ছিল। এখানে অনেক গাছ পালা ও বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ছিল মনোরম। এছাড়া এখানে অনেক মাছও পাওয়া যেতো। এ জন্য তাড়াশের জমিদার বনওয়ারীলাল রায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অত্র অঞ্চলে একটি জমিদার কাছারি নির্মাণ করেন[৩০] এবং জেলার অধীনস্ত তাদের স্থাবর সম্পত্তিসমূহের সদর কাছারি বাড়িতে রূপান্তরিত করেন বলে জানা যায়। কালক্রমে জমিদার মহাশয়ের উদ্যোগে জায়গাটির অনেক উন্নতি হয় এবং তদীয় আমলা কর্মচারি প্রভৃতির অবস্থান হেতু এ স্থানের নাম জমিদার বনওয়ারীলাল রায় এর নামানুসারে 'বনওয়ারী নগরে' পরিণত হয়।[৩১] পূর্বে এ স্থানের নাম ছিল ফরিদপুর। বিখ্যাত সুফি

সাধক হযরত শাহ ফরিদ (রহ.) এর নামানুসারে ফরিদপুরের নামকরণ' করা হয়। হযরত শাহ ফরিদ (রহ.) এর মাজার উপজেলা সদর থেকে ১ কি. মি. উত্তরে বড়াল নদীর উত্তর পার্শ্বস্থ পাড় ফরিদপুর গ্রামে অবস্থিত।[৩২]

জমিদার বনওয়ারীলাল রায় কাছারি বাড়ির সংলগ্ন একটি স্থায়ী নিবাস স্থাপন করেন। এর একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার রেখে চারিদিকে দীঘি খনন করে জমিদার বাড়ির মর্যাদায় উন্নত করেন। প্রথমে এটি তাড়াশ জমিদার বাড়ি নামে পরিচিত হলেও পরবর্তীতে এটি ফরিদপুর জমিদার বাড়ি নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে জমিদার বাড়িটির অবস্থান যদিও বনওয়ারী নগরের মধ্যে কিন্তু সামগ্রীকভাবে এটি ফরিদপুর উপজেলা। এ কারণেই এ জমিদার বাড়িটি ফরিদপুর 'জমিদার বাড়ি' বা 'রাজবাড়ি' নামে পরিচিত। এ জমিদার বাড়িটি ফরিদপুর উপজেলা 'পর্ষদ' হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ।

বনওয়ারী নগর জমিদার বাড়ি বা রাজবাড়ি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আরও একটি জনশ্রুতি রয়েছে। জমিদার বনওয়ারীলাল রায় তাড়াশ থেকে নদী পথে বর্তমান ফরিদপুর থানার মধ্যদিয়ে গুমানী, বড়াল ও চিকনাই নদীর পথ ধরে ইচ্ছামতি নদী হয়ে পাবনা এ স্টেটে যেতেন। একবার তিনি যাত্রা পথে বড়াল নদী পাড়ের ছায়া বেষ্টিত এ জাগাটিতে বিশ্রামের জন্য তার বজরা নোঙ্গর করেন। এ সময় তিনি একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য অবলোকন করেন ''ব্যাঙ সাপকে ভক্ষণ করছে '' এ আশ্চার্যজনক দৃশ্য দেখার পর তিনি এ জায়গায় বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন এবং কালক্রমে তাড়াশ থেকে তার জমিদারি বনওয়ারী নগরে স্থানান্তরিত করেছিলেন।[৩৩]

বনওয়ারীলাল রায় একজন দানশীল ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জমিদার বাড়ির মধ্যে একটি মন্দির ও মন্দির সংলগ্ন নাট্যমন্দির নির্মান করেন। তিনি যতদিন বনওয়ারী নগরে অবস্থান করেন ততদিন বিনোদরায় বিগ্রহটি (স্বর্ণমূর্তি) বনওয়ারী নগর জমিদার বাড়িতে স্থান পায়। বর্তমানে এ দেবতাটি বৃন্দাবনে আছে। পরবর্তীতে রায় বাহাদুর বনমালী রায় অবশ্য ধাতুময়ী নতুন একটি বিনোদ বিগ্রহ মূর্তি তৈরি করেন। এ জন্য বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ (প্রায় ৬০ হাজার টাকা) আয়ের সম্পত্তি কুল দেবতার নামে দেবাত্তর হিসাবে বন্দোবস্ত ছিল। বৃন্দাবনে আদি প্রস্তরময়ী বিনোদরায় এবং বনওয়ারী নগরে নতুন বিনোদরায় বিগ্রহের সেবা পরিচালনার সুবন্দোবস্ত ছিল। বিশেষ করে ভাদ্র মাসে 'ঝুলন' অনুষ্ঠানের সময়ে এ বিনোদরায় বিগ্রহটি বনওয়ারী নগর থেকে তাড়াশে নিয়ে যাওয়া হতো। এ উপলক্ষে বড় তরফ মাসব্যাপী মেলা, গান বাজনা মহোৎসব এর আয়োজনা করতেন বলে জানা যায়।[৩৪] জমিদার বনওয়ারীলাল রায় শেষ জীবনের অধিকাংশ সময়ে কলকাতায় থাকতেন। এ সময় তিনি ধর্ম কর্ম পালনে কাশী ও বৃন্দাবনে অবস্থান করেন। আনুমানিক ১৮৮২ সালে তিনি বৃন্দাবনে মৃত্যুবরণ করেন।

রায় বাহাদুর বনমালী রায়

জমিদার বনওয়ারীলাল রায় নিঃসন্তান ছিলেন। এ জন্য তিনি তার প্রথমা স্ত্রী রঘুরামের মেজভাই হরিনাথ বংশীয় বনমালীকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৮৬২ সালে বনমালী

জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাবনা জেলা স্কুলে প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষালাভ করেন। দত্তক পিতা বনওয়ারীলাল রায়ের মৃত্যুর পর তিনি পিতার জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন।[৩৫]

শিক্ষাক্ষেত্রে

বনমালী রায় একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। প্রাচীন জনপদ পাবনার শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রসারে তার অকাতার দান তার সময়কাল পেরিয়ে আজো প্রদীপ্ত দীপ্ত শিখার মত দেদীপ্যমান।[৩৬] পাবনা জেলার প্রথম কারিগরি বিদ্যালয়ের নাম ইলিয়ট বনমালী টেকনিক্যাল স্কুল। ১৮৯২ সালে বনমালী রায় এবং বাংলার তদানিন্তন লেফটেন্যান্ট গভর্ণর চার্লস ইলিয়ট যৌথভাবে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করেন।[৩৭] প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে জমিদার বনমালী রায় ২৭.০০০ (সাতাশ হাজার) টাকা দান করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল কম শিক্ষিত বেকার কিশোর ও যুবকদের পেশাগত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকে কর্ম জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা।[৩৮] এ সময়ে তিনি পাবনার শিক্ষা প্রসারে বিভিন্ন র্কমসূচীর উদ্যোগ নেন। ক্রমে জমিদার বনমালী রায়ের যশ, খ্যাতি ও দানশীলতার কথা ছড়িয়ে পড়লে ১৮৯৪ সালে ইংরেজ সরকার তাকে 'রায় বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত করেন।[৩৯] রায়বাহাদুর বনমালীরায় এর অনুদানে গড়ে ওঠা বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজো কালের স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

১৮৯৮ সালে পাবনা কলেজ (এডওয়ার্ড কলেজ) এর নতুন ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে রায় বাহাদুর বনমালী রায় ৫০,০০০(পঞ্চাশ হাজার) টাকা দান করেন। তার অর্থানুকুল্যে এডওয়ার্ড কলেজের বিজ্ঞান ভবন নির্মিত হয়। যার নামকরণ করা হয় বনমালী গবেষনাগার (বর্তমানে পদার্থ বিজ্ঞান ভবন)।[৪০] ১৯০৭ সাল থেকে এ কলেজ রায় বাহাদুর বনমালী রায় এর নামে মাসিক ৮/- টাকা করে দুটি "বনমালী জুবিলী" স্কলারশীপ প্রদানের রীতি চালু করেন। এ অর্থ তাড়াশ জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায় এর পরিবার বহন করতো। Matriculation পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনকারী দু'জন গরিব মেধাবী ছাত্রকে এ অর্থ দেওয়া হতো।[৪১] ১৯১২ সালে বাংলার প্রথম গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল এডওয়ার্ডের নামে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজ পরিদর্শনে আসেন। এ সময় তাড়াশের বিদ্যানুরাগী জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায় নিজে কলেজকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলার গর্ভণরকে স্বাগত জানান। এর প্রত্যুত্তরে গর্ভণর কারমাইকেল এ কলেজকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দানের ঘোষনা দেন।[৪২] বর্তমান কলেজের জমির পরিমান ৪৯.০০০০ একর। এর মধ্যে ৪৬ বিঘা জমি তাড়াশ জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায়ের দানের অর্থে খরিদ করা হয়েছিল।[৪৩]

১৯১২ সালে রায় বাহাদুর বনমালী রায় প্রতিষ্ঠা করেন বনওয়ারীনগর করনেশন বনমালী হাইস্কুল। স্কুলটির পরিসংখ্যানে জানা যায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সরকারি সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত রায় পরিবার থেকে এ প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক ২৪০০ টাকা করে অনুদান দিতেন। এ ছাড়া স্কুলের জমি, খেলার মাঠ, স্কুল সংলগ্ন পুকুর, (দুধ সাগর নামে পরিচিতি) জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায় দান করেন।[৪৪]

১৯১৪ সালে রায় বাহাদুর বনমালী রায় প্রতিষ্ঠা করেন সিরাজগঞ্জ বি এল স্কুল। এ স্কুলটি ১৮৬৯ সালে সিরাজগঞ্জ প্রথম ইংলিশ স্কুল নামে গড়ে ওঠে। ১৯১৪ সালের পর তাড়াশের দানশীল জমিদার রায় বাহাদুর বনমালী রায় স্কুলটিকে প্রচুর অর্থ দান করেন। এ জন্য স্কুলটির নাম পরিবর্তন করে রায় বাহাদুর বনমালী রায় এর পিতৃস্মৃতির স্মরণে এর নামকরণ করা হয় বনওয়ারীলাল রায় উচ্চ বিদ্যালয় (সংক্ষেপে বি,এল, স্কুল)। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সরকার স্কুলটিকে সরকারিকরণ করেন। এ প্রতিষ্ঠানটি ছিল বৃহত্তর পাবনা জেলার মধ্যে দ্বিতীয় প্রাচীনতম হাই স্কুল।[৪৫]

সাহিত্য ক্ষেত্রে

স্বর্গীয় রায় বাহাদুর বনমালী রায় অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবতের টিকা সম্বলিত 'সংস্করণ' এবং 'কবি কণ্ঠাহার' নামক বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রকাশ এ বংশের বড় তরফের বিদ্যানুশীলনে সাহায্য দানের পরিচায়ক।

সমাজ ও ধর্ম ক্ষেত্রে

পাবনার দুর্ভিক্ষ ভান্ডার, শ্যামকুন্ডের পঙ্কোদ্ধার, জগনাথ দেবের মন্দির সংস্কার, পাবনা মহিলা হাসপাতাল (মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র) তাড়াশের দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং মথুরার রাধাকুন্ডের বিষ্ণু মন্দির বনমালী রায় বাহাদুরের স্মৃতি আজও বহন করছে।[৪৬]
এছাড়া ক্ষুধার্থকে অন্নদান, গরীব দুঃখী অনাথ এবং বিধবাকে সাহায্য দান রায় বাহাদুর বনমালী রায়ের কৃতিত্ব বহন করে। তিনি শেষ জীবনে বৃন্দাবনে অতিথি সেবায় অতিবাহিত করেন। বৃন্দাবনে বিনোদ রায়ের কুঞ্জে দৈনিক অতিথি সৎকারাদি ও সেখানকার দাতব্য চিকিৎসালয়াদি রায় বাহাদুর বনমালী রায়ের বদান্যতার পরিচায়ক।[৪৭] ১৯১৪ সালের (২৪ শে নভেম্বরবর) রায় বাহাদুর বনমালী রায় দু'পুত্র ক্ষিতিশ ভূষণ রায় ও রাধিকা ভূষণ রায়কে রেখে বৃন্দাবনে পরলোক গমন করেন।[৪৮]
স্বর্গীয় রায় বাহাদুর বনমালী রায়ের পুত্রদ্বয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় গৌরবান্বিত না হলেও বংশ গৌরব ক্ষুন্নকারী ছিলেন না। তারা উভয়ই বিলাসী ছিলেন এবং অধিকাংশ সময় কলকাতায় কাটাতেন। কিন্তু তারা দানশীল ছিলেন। তাদের দানে ১৯১৮ সালে পাবনা পৌরসভার সংলগ্ন গড়ে ওঠে বনমালী টেকনিক্যাল বোডিং হাউজ। ১৯২৪ সালে তারা পিতৃ স্মৃতির স্মরণে প্রতিষ্ঠা করেন 'টমসন টাউন হল' যা বর্তমানে "বনমালী ইনস্টিটিউট" নামে পরিচিত। এ ছাড়া পাবনা শহরস্থিত তাড়াশ বিল্ডিং এ জমিদার বংশের ঐতিহ্যের গর্ব। এর সৌন্দর্য ও নির্মাণ শৈলী শত বছরের পুরনো স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়।[৪৯]
রায় বাহাদুর বনমালী রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশ ভূষণ রায় পাবনা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি পারনাবাসীর চাহিদা মেটাতে পাবনায় বিশুদ্ধ জলের চাহিদা নিশ্চিত করেন।[৫০] বৃটিশ সরকার তার জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য তাকে "রায় বাহাদুর" খেতাবে ভূষিত করেন।[৫১] শ্রীযুক্ত রাধিকা ভূষণ রায় কয়েক বছর পাবনা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি পাবনা ও সিরাজগঞ্জের তেমন কোন উন্নতি করতে পারেন নাই।[৫২] শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশভূষণ রায় এর তিন পুত্র ছিল রাখাল গুরুদাস,

ব্রজরাখাল দাস এবং সন্তোষ রাখাল রায়। রাধিকা ভূষণ রায় এর দু'পুত্র বিনোদ ভূষণ রায় এবং গোবিন্দ ভূষণ রায় তারা বর্তমানে ভারতের অধিবাসী।[৫৩]

এ রায় পরিবার সম্পর্কে জানা যায় যে, তাদের চাল চলন ছিল রক্ষণশীল পরিবারের মত। মহিলারা সর্বদা পর্দায় চলাফেরা করতো। ১৯৪২ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় বড় তরফের পরিবারবর্গ পাবনা শহরস্থিত তাড়াশ বিল্ডিং এ আশ্রয় গ্রহণ করেন। খুব সম্ভবত: জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর (১৯৫২) তারা এ দেশ থেকে কলকাতায় চলে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে তাদের কোন বংশধর আছে কি না তা জানা যায় না।

তাড়াশ (ফরিদপুর) জমিদার বাড়ি

পাবনা জেলার তাড়াশ (ফরিদপুর) জমিদার বাড়িটি জমিদার বনওয়ারীলাল রায় এর অমরকীর্তি। ঊনবিংশ শতকের ষাটের দশকে তিনি এ জমিদার বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন বলে জানা যায়। এর ভবন গুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এটা ইউরোপীয় রেনেসাঁ রীতিতে নির্মিত। জমিদার বাড়িটির পূর্বপার্শ্বে একটি মাত্র প্রবেশ পথ ছাড়া চারদিকে সুগভীর দীঘি রয়েছে। প্রবেশ পথটির দু'পার্শ্বে দুটি করে চারটি সুডৌল স্তম্ভ এবং মাঝখানে বিশাল আকৃতির অর্ধবৃত্তাকারে খিলানে নির্মিত।[৫৪]

আলোক চিত্র-১

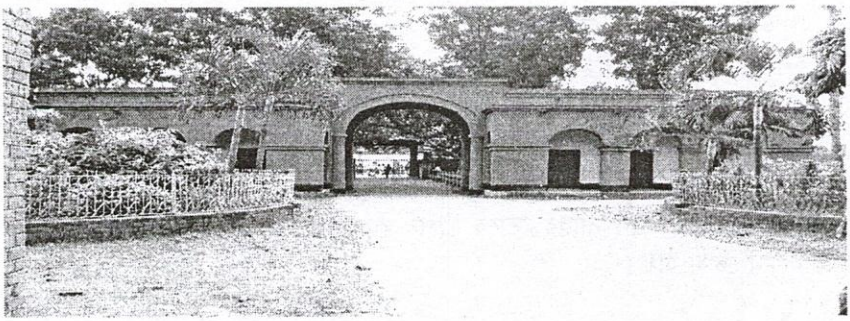

তাড়াশ (ফরিদপুর) জমিদার বাড়ির প্রবেশ পথ ।

মূল জমিদার বাড়িটি প্রায় ১৫.৬২০০ একর জমি নিয়ে গড়ে ওঠেছে। এর মধ্যে ৬.৫০০০ একর জলকর বিশিষ্ট সুপ্রশস্থ দীঘি ১.৬২০০ একর পুকুর পাড় এবং প্রধান প্রধান ভবনগুলি ৭.৫০০০ একর ভূমির উপর অবস্থিত ।

টাকশাল ও কয়েদ খানা

জমিদার বাড়িটির প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকতে সোজা পশ্চিম দিকে প্রায় ১০০ গজ দূরে সম্মুখে যে দ্বিতল ভবনটি চোঁখে পড়ে এটি জমিদার বনওয়ারীলাল রায়ের সময়ে কয়েদখানা ও টাকশাল হিসেবে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এ বিল্ডিংটি সমাজ সেবা প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং আনসার ও ভিডিপি অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর আয়তন দৈর্ঘ্য ১০৫ ফুট এবং প্রস্থ

৪২ ফুট। এ ভবনটির গঠন ও নির্মাণ আকৃতি খুবই চমৎকার। এর বারান্দার পিলারগুলো সুডোল এবং কারুকার্য খচিত। এ ভবনটির নিচ তলায় মোটা মোটা লোহার গ্রিল ও বড় লোহার দরজা এবং অন্ধকার কুঠুরি জমিদারদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা স্মরণ করে দেয়।[৫৫] জানা যায় তাড়াশ রায় পরিবারের জমিদারগণ যেমন, দানশীল ও উদার ছিলেন, তেমনি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তাদের অত্যাচার ও জুলুম কতখানি ছিল সে প্রসঙ্গে খন্দকার আব্দুর রহিম তার সিরাজগঞ্জের ইতিহাস নামক গ্রন্থে বলেছেন, তাড়াশ জমিদারদের অত্যাচার ও জুলুমের বিরুদ্ধে অত্র এলাকার বিশিষ্ট জন মাওলানা সেরাজুল হক কঠোর প্রতিবাদ করেছিলেন।[৫৬] বলাবাহুল্য সে কালের রাজা ও জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী নতুন কিছু নয়। তাড়াশ জমিদার বংশের ক্ষেত্রও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

কাছারি ভবন

জমিদার বাড়ির টাকশাল ও কয়েদ খানা ভবনটির সাথে আরও তিনটি জোড়া দ্বিতল ভবন এবং সদ্য নির্মিত শিক্ষা ভবনসহ তিনটি একতলা ভবন নিয়ে উপজেলা 'পর্ষদ' কার্যালয় গড়ে ওঠেছে। এর মধ্যে জমিদার বনওয়ালী লাল রায়ের আমলে নির্মিত ১৬ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি একতলা কাছারি ভবন। এর আয়তন দৈর্ঘ্য ১৪৫ ফুট এবং প্রস্থ ৭৫ ফুট। ভবনটির L- Pattern এ নির্মিত। এর উভয় পার্শ্বে সুপ্রশস্ত বারান্দা আছে। এ ভবনটির দেয়াল বেশ চওড়া এবং এর পরিমাপ ২ ফুট ২ ইঞ্চি। এর দেয়াল নির্মাণে চুন ও সুরকির ব্যবহার করা হয়েছে। ভবনটিতে প্রায় ৩০ টি দরজা আছে। দরজাগুলোর উচ্চতা প্রায় ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। ভবনটির মধ্যে ছোট বড় আকৃতির আটটি কক্ষ আছে। কক্ষগুলোর পরিমাপ যথাক্রমে দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট ও প্রস্থ ১৬ ফুট এবং বড় কক্ষগুলোর দৈর্ঘ্য ২৪ ফুট ও প্রস্থ ২০ ফুট বিশিষ্ট। উল্লেখ্য যে, এর ভিতরের দরজা গুলো এমন সারিবদ্ধভাবে স্থাপন করা যেন, এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষের সকল কার্যক্রম দেখা যায়।

আলোক চিত্র -২

তাড়াশ জমিদার বংশের বড় তরফের প্রধান কাছারি ভবন

জমিদারদের সময় এখানে খাজনা আদায় এবং প্রজাদের অভাব অভিযোগ শ্রবন করা হতো। বর্তমানে এ ভবনটি ফরিদপুর উপজেলা ভূমি রাজস্ব অফিস নামে পরিচিত। এ ভবনটি জমিদার বাড়ির প্রবেশ পথের ডানদিকে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত।

নাট্যমন্দির ও বিনোদবিগ্রহ মন্দির

জমিদার বাড়িটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দ্বিতল ভবন সংলগ্ন সুউচ্চ নাট্যমন্দির ও সুউচ্চ দেবালয়টি (মন্দির) জমিদার বনওয়ারীলাল রায় এর অমর স্মৃতি। নাট্যমন্দিরটির আয়তন দৈর্ঘ্য ৫৫ ফুট ও প্রস্থ ৫২ ফুট। কারুকার্য খচিত এ নাট্যমন্দিরটি নির্মাণে ভিতরে ও বাইরে ইউরোপীয় রেনেসাঁ রীতি ব্যবহার করা হয়েছে।

মন্দিরটির বাইরের দেয়ালে বিভিন্ন প্রাণীর ছবি অংকন করে এর সৌন্দর্য যেমন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তেমনি ভেতরের নির্মাণ পরিকল্পনা আকর্ষণীয়। এর দরজা ও জানালাগুলো অনেক বড় বড়। দরজার পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৭ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। জানালা গুলোর পরিমাপ দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ও প্রস্থ ৪ ফুট। এ নাট্যমন্দিরটির একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, এর দোতলায় বসে বিনোদ বিগ্রহ মন্দিরের সকল পুজার্চনা নাট্য মন্দিরের নাচ-গান ও অভিনয় দেখা যেতো। জমিদার পরিবারের মেয়েদের কড়াকড়ি পর্দার কারণেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল বলে মনে হয়। জমিদার রায় বাহাদুরের সময়ে কলকাতার অনেক নামী-দামী জমিদার ও অভিনেতা এখানে আসতেন এবং তারা এ নাট্যমন্দিরের উৎসবাদি উপভোগ করতেন।

নাট্যমন্দির সংলগ্ন একটি দেবালয় রয়েছে। এর আয়তন দৈর্ঘ্য ৪৮ ফুট ও প্রস্থ ৩০ ফুট। মাটি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ২০ ফুট। মন্দিরটির ভিতরের নির্মাণ শৈলী খুবই সুন্দর। এর দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রবেশ পথ রয়েছে। এর উচ্চতা দৈর্ঘ্য ৮ ফুট এবং প্রস্থ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। জমিদাররা যতদিন বনওয়ারীনগরে অবস্থান করেছিলেন ততদিন বিনোদ বিগ্রহ মূর্তিটি এ দেবালয়ে ছিল। এ বিনোদ বিগ্রহ মূর্তিটি সম্পর্কে জানা যায় শ্রী শ্রী বিনোদ রায় বিগ্রহটি তাড়াশ জমিদার বংশের গৃহদেবতা ছিল। পূর্বে এ দেবতাটি নবগ্রাম নির্বাসী বাঞ্ছারাম মহাশয়ের কুলদেবতা ছিল। বাঞ্ছারাম অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে ঐ সেবা তাড়াশ জমিদার বংশ গ্রহণ করে। প্রথমে নবগ্রামে রেখেই সব শরিকে মিলে এ বিগ্রহটির সেবা করতো। শুধুমাত্র বছরে একবার সাধারণত বিজয়ার পর থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত একে তাড়াশে নিয়ে এসে নিজ তত্ত্বাবধানে এর সেবা নির্বাহ করা হতো।

পূর্বে বিনোদ রায় বিগ্রহের কোন স্ত্রী মূর্তি ছিল না। বিজয়ার পর উক্ত বিগ্রহটি তাড়াশে আসলে একদা বাসুদেব তালুকদারের পৌত্র রামহরি রায়ের কন্যা লক্ষ্মী বিগ্রহ মন্দিরে সন্ধ্যা প্রদীপ প্রদান কালে অন্তর্হিত হয়। রায় মহাশয় রাত্রে স্বপ্ন দেখেন যে, উক্ত বিনোদ রায় বিগ্রহজি তার কন্যাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো জানতে পারেন যে, বনগ্রামের করতোয়া নদীতে ভাসমান কাঠ খণ্ড দ্বারা লক্ষ্মী মূর্তি নির্মাণ করে লৌকিক আচারে বিনোদ রায়ের সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে। আদেশ অনুযায়ী কার্য হবার

পর থেকে উক্ত বিগ্রহটির সহিত তাড়াশ জমিদার বংশের জামাতার ন্যায় আচরণ করা হতো।[৫৭] ফরিদপুর বিনোদ রায় দেবালয়টি জমিদার পরিবারের লোকজন এবং স্থানীয় বসবাসরত হিন্দুরা পূজার্চনা করতো।

আলোক চিত্র-৩

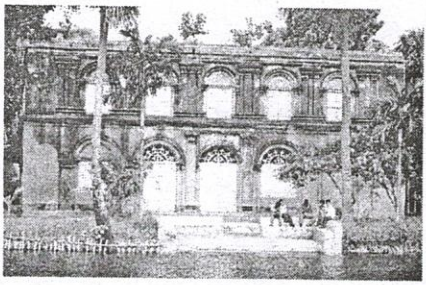

ফরিদপুর বা তাড়াশ জমিদার বাড়ির নাট্যমন্দির

জমিদারের বাস ভবন

জমিদার বাড়িটির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ জমিদার বনওয়ালীলাল রায় এর বাস ভবন। বাস ভবনটি জমিদার বাড়ির দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এর নির্মাণ পরিকল্পনা ছিল অতিচমৎকার। কিন্তু বর্তমানে এর নতুন সংস্কারের ফলে ভবনের মূল কারুকার্য ও নকশার অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। এ বাস ভবনটির সংলগ্ন দক্ষিণ পার্শ্বে দীঘির মধ্য পর্যন্ত তিনটি ধাপে নির্মিত ছাদবিহীন বিল্ডিংয়ের আকারে ' গোসল খানা' বা 'রানী ঘাট' জমিদার রায় বাহাদুরের আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে মনে করা হয়। রায় পরিবারের মহিলারা যে পর্দানশীল ছিলেন, এটি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে গণ্য করা যায়। রানীঘাট সংলগ্ন পূর্ব পার্শ্বে দক্ষিণ দুয়ারে একতলা ভবনটি জমিদারের বালাখানা ছিল। সন্ধ্যার পর জমিদার পরিবারের লোকজন এখানে বসে আরাম আয়েশ করতেন। এ ভবনটি বর্তমানে ফরিদপুর উপজেলা উপবৃত্তি অফিস হিসেবে পরিচিত। এ ভবনটির সংলগ্ন পূর্ব পার্শ্বে আরও দু'টি দ্বিতল ভবন রয়েছে এ গুলো উপজেলা 'পর্ষদ' কার্যালয়ের প্রয়োজনে নির্মিত হয়েছে।

আলোক চিত্র-৪

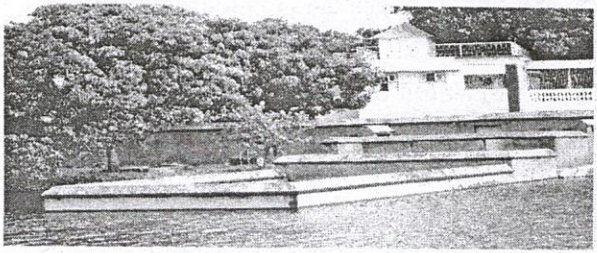

রানীঘাট সংলগ্ন জমিদারের বাসভবন

বৃক্ষ ও উদ্যান

জমিদারদের সময়ে এখানে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নারিকেল ও বিভিন্ন ধরনের বাহারী বৃক্ষ রোপন করা হয়, যার কিছু কিছু এখনও শতাব্দির অধিক কালের স্মৃতি নিয়ে আজো মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গোটা জমিদার বাড়িতে গড়ে ওঠা উদ্যান ও ভবনগুলো থেকে মনে হয় জমিদার বনওয়ারীলাল রায় একটি সুন্দর পরিকল্পনা নিয়ে এ জমিদার বাড়িটি গড়ে তুলেছিলেন। সমসাময়িক অন্যান্য জমিদার বাড়ির ন্যায় বনওয়ারীনগর বা ফরিদপুর জমিদার বাড়িটি এখনও অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। তবে সম্প্রতি কিছু কিছু ভবনের সংস্কার এবং রং পরিবর্তনের ফলে পুরনো এ ঐতিহ্যবাহী জমিদার বাড়িটি তার ঐতিহ্য অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেছে। অপরিকল্পিত সংস্কার এবং নাবায়ন এর জন্য দায়ী।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, তাড়াশ জমিদার বংশ নিঃসন্দেহে পাবনার জমিদারদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ জমিদার বংশ পাবনার এতদঞ্চলের উপর তাদের শাসন কর্তৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাড়াশ জমিদার বংশের অনেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে জমিদারি স্বত্ব ভোগ করেছেন। প্রজাপীড়ন ও অত্যাচারের মাধ্যমে এ জমিদারি গৌরব অর্জন করলেও তাদের চরিত্রের ও কৃতকর্মের খারাপ দিক গুলো বাদ দিলে এ বংশের কয়েকজন জমিদার বিশেষ করে দত্তক বনওয়ারীলাল রায় ও দত্তক রায় বাহাদুর বনমালী রায় এর নাম চিরস্মরণীয়। কেননা বৃহত্তর পাবনার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, চিকিৎসা, ধর্মীয় এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা যে অবদান রেখে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে তাদের স্মৃতির পাতায় অক্ষয় হয়ে থাকবে।

তথ্যসূত্র

১. মাহবুবর রহমান, " বাংলার রাজা ও জমিদার শ্রেণী : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", *গবেষণা পত্রিকা*, তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৯৭-৯৮,রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, কলা অনুষদ, রাজশাহী, ১৯৯৮. পৃ. ১৯২।

২. ইরফান হাবিব,*মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা* (১৫৫৬-১৭০৭) (কলিকাতা: কে.পি.বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৬৮৫), পৃ. ১৫১।

৩. মাহবুবর রহমান, " বাংলার রাজা ও জমিদার শ্রেণী ঃ একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা," *প্রাগুক্ত*,পৃ.১৮৭।

৪. মহিবুল ইসলাম, "ডিমলার জমিদারদের জীবন ও কর্ম, " *The Islamic University Jurnal*, Vol.8, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, ২০০৬, পৃ. ১১৩ ; রাধারমণ সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস* (ঢাকা: নবধারা, ২০০৬), পৃ. ২৩৮ ; আয়েশা বেগম ,*পাবনার ঐতিহাসিক ইমারত* (ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০২), পৃ. ১১৮।

৫. নূরুল ইমলাম খান (সম্পা.), *বাংলাদেশ জেলা গেজেটীয়ার পাবনা* (ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রানালয়, ১৯৯০), পৃ. ২৯-৪২ ; মো. হাবিবুল্লাহ, *পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ২২।

৬. W.W. Hunter, *A Statical Account of Bengal* (Delhi : D.K. Publishing House,1947), Vol. IV, pp.156-57 ; কে আলী, *মুসলিম বাংলার ইতিহাস* (১২০০-১৭৬৫ (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ১৯৭৭), পৃ. ২৯২।

৭. মাহবুবর রহমান, "বরেন্দ্র ভূমির রাজা ও জমিদার,"*বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, মুহ. মমতাজুর রহমান [সভাপতি সম্পাদনা পরিষদ বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটি] অতিরিক্ত কমিশনার (অব.) রাজশাহী বিভাগ রাজশাহী (ঢাকা: গতিধারা, সংস্ক. ১ম, ২০০৯), পৃ. ৮৯২ ; মো. হাবিবুল্লাহ, পাবনা জেলার সমাজ ও সংস্কৃতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২-২৪ ; রাধারমণ সাহা, পৃ. ২৬।

৮. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৮।

৯. মাহবুবর রহমান, "বরেন্দ্র ভূমির রাজা ও জমিদার,"*বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯২-৮৯৩।

১০. আব্দুল হামিদ, *চলন বিলের ইতিকথা* (ঢাকা: ম্যাগনাম ওপাস, সংস্ক. ২য়, ২০০২), পৃ. ১৯৫ ; রাধারমণ সাহা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪১ ; ড. আয়শা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭।

১১. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১ ; আব্দুল হামিদ, *প্রাগুক্ত*, ১৯৯।

১২. *প্রাগুক্ত*, ১৯৯ ; রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১।

১৩. অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬ ; রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪২।

১৪. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩।

১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩ ; ড. আয়শা বেগম, *প্রাগুক্ত*, ২০০৭।

১৬. Jadunath Sarkar (ed.),*The History of Bengal* (Dacca: The University of Dacca, Third ed. 1976), Vol.II, p.284.

১৭. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১।

১৮. আয়েশা বেগম ,*প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৭।

১৯. David .J . Mc Cutchion, *Last Mediaeval Temples of Bengal* (Calcutta: The Asiatic Society, 1972), p.25.

২০. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৩-১৯৪।

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ .২৪২ ; অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯-২০০।

২২. সমরপাল, *নাটোরের ইতিহাস* (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশনী,সংস্ক. ২য়, ১৯৮০), পৃ. ৩৩-৩৪।

২৩. *প্রাগুক্ত*, ৩৬-৩৭।

২৪. মাহবুবর রহমান, "বরেন্দ্র ভূমির রাজা ও জমিদার", *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ . ৮৩৭।

২৫. অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ, চলন বিলের ইতিকথা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৯৬ ; রাধারমণ সাহা, পাবনা জেলার ইতিহাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩।

২৬. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, ২৪৩।

২৭. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, ২৪৬।

২৮. রাধারমণ সাহা,*প্রাগুক্ত* ,পৃ. ২৪৪।

২৯. মাহবুবর রহমান, "বরেন্দ্র ভূমির রাজা ও জমিদার", *বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ . ৮৯৪।

৩০. আয়েশা বেগম, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ১২২।

৩১. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*,পৃ .৪০১।

৩২.এস এম রইজ উদ্দিন, বৃহত্তর পাবনা জেলা ও সংশোধী ভূমি জরিপ (খুলনা: রংধনু প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ৩৭।

৩৩. আবু বক্কর সিদ্দিক ,"ফরিদপুর উপজেলা বনওয়ারীনগর রাজবাড়ির ইতিকথা," *দৈনিক ইত্তেফাক,ঢাকা*, ১৫ নভেম্বর,২০০৬।

৩৪. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩-২৪৪।

৩৫. আব্দুল হামিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭।

৩৬. বনমালী ইনষ্টিটিউট পাবনা (সম্পা.),মুক্তিযুদ্ধের রজত জয়ন্তীতে মহান বিজয় দিবস নাট্যোৎসব-১৯৯৬, *স্মরণিকা*, পৃ. ২।

৩৭. নূরুল ইসলাম খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৪।

৩৮. খন্দকার আব্দুল মতিন, "নব্বই বছর প্রান্তে" ইলিয়ট বনমালী টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট পাবনা (সম্পা.), *বার্ষিকী*, ১৯৮১, পৃ. ১।

৩৯. L.S.S.O' Malley, *Bengal District Gazetteer Pabna* (Calcutta: The Bengal Secretariat book depot,1923), p.131.

৪০. Nurul Islam Khan (ed.), *Bangladesh District Gazetteer Pabna* (Dacca: Bangladesh Government Press,1978), p.209.

৪১. L.S.S.O' Malley, *op. Cit*, p.106.

৪২. মনোয়ার হোসেন জাহেদী (সম্পা.) ,"শতাব্দীর ছায়াপথে এডওয়ার্ড কলেজ", *শতবর্ষ পূর্তি স্মারক*, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, ১৯৯১, পৃ. ১৯।

৪৩. নূরুল ইসলাম খান ,*প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০।

৪৪. আব্দুল হামিদ,*প্রাগুক্ত* ,পৃ. ২৯১।

৪৫. চৌধুরী মহম্মদ বদরুদ্দোজা, *জিলা পাবনার ইতিহাস* (পাবনা : প্রকাশক লেখক নিজে, ১৯৮৬), খ. ৩য় , পৃ. ১৫৩।

৪৬. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫ ; আব্দুল হামিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭।

৪৭. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫।

৪৮. L.S.S.O' Malley, *op. Cit*, p.131.

৪৯. বনমালী ইনষ্টিটিউট পাবনা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২।

৫০. আব্দুল হামিদ, *প্রাগুক্ত* ,পৃ.২৯১।

৫১. L.S.S.O' Malley, *op. Cit*, p.131.

৫২. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৬।

৫৩. আব্দুল হামিদ, *প্রাগুক্ত* ,পৃ. ১৯৮।

৫৪. আয়েশা বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২।

৫৫. পাবনা জেলার ফরিদপুর উপজেলা ভূমি অফিস থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, তাড়াশ জমিদার বাড়িটি , মৌজাঃ খলিশাদহ সিট নং ২,খতিয়ান নং ১,আর,এস ২৩১৪, ২২৯৪, ২২৯৫, ২৩১৬,২২১৭,২২৫৮,২২৫৯ তে অবস্থিত।

৫৬. খন্দকার আব্দুল করিম ,*সিরাজগঞ্জের ইতিহাস* (টাঙ্গাইলঃ খন্দকার প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ . ২০৯।

৫৭. রাধারমণ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৪৩।

তাড়াশ জমিদার বংশের তালিকা

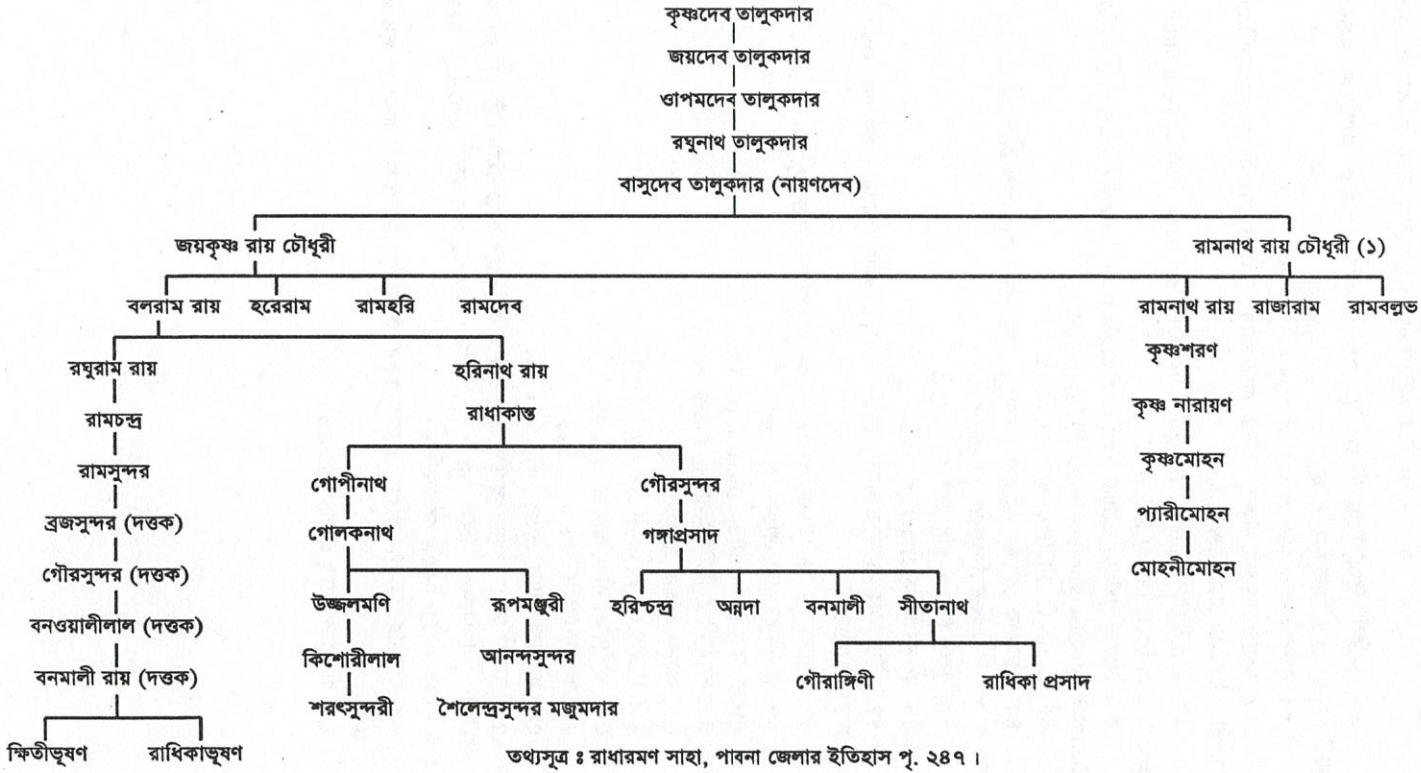

তথ্যসূত্র ঃ রাধারমণ সাহা, পাবনা জেলার ইতিহাস পৃ. ২৪৭।

ISSN 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার কৃষক সমাজের গঠন

নুরুল ইসলাম*

Abstract: Bangladesh is an agricultural country. Agriculture is the occupation of the majority of the people of Bangladesh and welfare of this country largely depends on it In a word, agriculture is the operating power in economy of this country. But the farmers who were the main group in agriculture are not solvent. As a pivotal member of the society they enjoyed a dignity in the society since primitive age. But, since the beginning of the reign of English East India Company, their condition started worsening as a result of different policies to satisfy the interest of the landlords. In that period the Permanent Settlement of 1793 deprived the peasants of their traditional rights on land and put them at the mercy of a new class of Zaminders. But to protect the interest of the peasants some other Acts for example, the Rent Acts of 1828, 1838 1859 and 1885 etc were passed by the government. Inspite of passing this act the miserable condition of the peasants was not solved. At last by passing the Act of 1950, Zamindary system was abolished and peasants' right on land was established. An attempt has been made in this article to highlight the classification and condition of Bengal peasants in the first half of the Twentieth Century.

ভূমিকা

প্রতিটি যুগে সমাজের স্বাভাবিক গঠন বা আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো গড়ে উঠে তিনটি শ্রেণীকে নিয়ে—উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন বা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সমন্বয়ে। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার কৃষক সমাজও এর ব্যতিক্রম ছিল না। বিশেষ করে মোগল বা নবাবী আমলে যারা ছিল উচ্চ বা প্রথম শ্রেণী তথা অভিজাত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত তাদের মূল অংশ আত্মীভূত হয়েছিল উপনিবেশিক যুগের উচ্চ বা প্রথম শ্রেণীতে। মোগল ও নবাবী যুগে জায়গীরদার-জমিদাররা ছিলেন রাষ্ট্রের পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহের কমিশনভোগী এজেন্ট, কিন্তু এরা ইংরেজদের সময়ে বিশেষ করে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মধ্য

* সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

দিয়ে জমিতে রাজস্ব আদায়ের শুধু অধিকার লাভ করেনি, পাশাপাশি মালিকানা-স্বত্বও অর্জন করেছিল।

আলোচ্য সময়ে বাংলার কৃষক সমাজের গঠন সম্পর্কিত আলোচনায় (বাংলার কৃষক সমাজের স্তরবিন্যাস সম্পর্কিত) বিভিন্ন গবেষকদের মধ্যে ড. রঙ্গলাল সেন বলেন, ১৯৪৭ সালে যখন উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন এর কৃষি সমাজ কাঠামোয় চারটি প্রধান শ্রেণী লক্ষ্য করা যায়। এগুলি হল ক. গুটিকয়েক মুসলমান বড় জমিদারসহ বৃহৎ জমিদারদের একটি ক্ষুদ্র প্রভাবশালী গোষ্ঠী; খ. হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের ভেতর প্রায় সমানভাবে বিভক্ত ছোট জমিদার, জোতদার ও ধনী কৃষকের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ; গ. মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বয়ংসম্পূর্ণ মালিক কৃষকের একটি বিরাট শ্রেণী এবং ঘ. হিন্দু ও মুসলমান উভয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় সমভাবে বণ্টিত এক বিপুলসংখ্যক গরিব কৃষক, বর্গাদার ও ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক।[১]

হাসনাত আবদুল হাই তাঁর এক অনুসন্ধানমূলক রচনায় এ বিষয়ে বলেন, উপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ফলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির (১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ) আগে বাংলার পল্লী অঞ্চলের সামাজিক স্তর বিন্যাস ছিল মোটামুটি চার শ্রেণী নিয়ে। এক. জমিদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বাধিকারী, মূলত পরজীবি শ্রেণী; দুই. অবস্থাপন্ন রায়ত; তিন. আত্মপোষণক্ষম রায়ত এবং চার. বর্গাদার ও ভূমিহীন শ্রমিক।[২] আবার ড. অমলেন্দু দে ১৯৪১ সালের লোকগণনার ভিত্তিতে বাংলার জন-বিভাগ করেছেন, বৃত্তি অনুযায়ী তিনি তাদেরকে নয়'ভাগে ভাগ করেছেন, যথা- জমিদার-জোতদার, ধনী চাষী বা ধনী গৃহস্থ, চাষী গৃহস্থ, আধিয়ার বা বর্গাদার, কিষাণ বা কৃষাণ মজুর, কারিগর, ব্যবসায়ী, কর্মচারী ও অন্যান্য।[৩]

ড. দে'র মতে, এ আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো ১৯৪৬ সাল অর্থাৎ দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।[৪] এভাবে আরো অনেক গবেষক বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার কৃষক সমাজের গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ সকল বিষয়ে বর্তমান আলোচনার সাথে সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হল ড. রামকৃষ্ণ মুখার্জির *Six Villages of Bengal* নামক গবেষণালব্ধ রচনা। তিনি ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে বগুড়া জেলা-শহর সংলগ্ন একটি এবং ক্ষেতলাল উপজেলার পাঁচটি মোট ৬টি গ্রামের উপর সরেজমিন জরিপের ভিত্তিতে তাঁর এ মূল্যবান সমীক্ষা-প্রতিবেদন তৈরী করেছিলেন। তাঁর প্রদর্শিত ভূমি বা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক কাঠামোটি নিম্নরূপ:[৫]

১. রাষ্ট্র (জমি থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রাপক);
২. জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী ভূস্বামী- যারা খাজনা আদায় করে এবং সেখানকার একটা অংশ নিজেরা ভোগ করে।
৩. জোতদার-যে ভাগচাষ বন্দোবস্তে জমি রায়তকে দেয় এবং শুধু খাজনা পরিশোধের বিনিময়ে ফসলের অর্ধেক পায়।

৪. ধনী কৃষক - যে নিজে জমি চাষ করে না কিন্তু মজুর দিয়ে চাষ করায়।

৫. রায়ত বা চিরায়ত কৃষক- যে স্বয়ং জমির মালিক, নিজে জমি চাষ করে ও পুরো ফসল একা ভোগ করে।

৬. বর্গাদার বা ভাগচাষী - যে জোতদারের কাছ থেকে আধা-আধি বন্দোবস্তে চাষের জন্য জমি নেয় এবং খাজনা ছাড়া উৎপাদনের সকল খরচ বহন করে।

৭. কৃষি মজুর - যে ধনী কৃষক এবং কখনও কখনও রায়তের কাছে মজুরির বিনিময়ে শ্রম দেয়।

উপরোক্ত বিভাজনসমূহ আলোচনায় বাংলার ভূমি রাজস্ব ও ভূমি রাজস্বের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণী বা গোষ্ঠীসমূহকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে বাংলার কৃষক সমাজ গঠন করা যায়। যথা-

ক. জমিদার;
খ. জোতদার;
গ. বর্গাদার;
ঘ. রায়ত বা ক্ষুদ্রচাষী এবং
ঙ. ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক।

জমিদার

বাংলায় মূলত ভূমি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। ভূমির মালিক ছিল স্বল্পসংখ্যক জমিদার এবং ধনী চাষী বা জোতদার। ভূমিতে চাষাবাদ করত সমাজের অধিকাংশ লোক, হয় বর্গাদার হিসেবে, না হয় কৃষক (চাষ কার্যে নিয়োজিত শ্রমিক) হিসেবে। জমিদারদের মধ্যে প্রতি দশজনের মধ্যে ন'জনই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। নিম্নবর্ণের হিন্দু আর মুসলমানরা ছিল বাংলার অশিক্ষিত কৃষকসমাজ।

জমিদার বা জমিদারির উৎপত্তির সঠিক ইতিহাস যেমন এখানো পর্যন্ত অজ্ঞাত, তেমনি এর সংজ্ঞাও খুব একটা সুবিদিত নয়। আক্ষরিক অর্থে 'জমিদার' বা 'জমিনদার'... এ ফারসী[৬] যৌগটির অর্থ জমির মালিক বা যার জমি আছে।[৭] ভারতে শব্দটির উদ্ভব হয়েছিল আনুমানিক ১৪ শতকের দিকে। W H Moreland তাঁর রচিত *The Agrarian System of Moslem India* গ্রন্থে বলেন, চৌদ্দ শতকের দুজন সুপরিচিত ঐতিহাসিক জিয়া উদ্দিন বারনী ও আফিফ, বিশেষত শেষোক্ত জন 'জমিদার' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন এবং তখন থেকেই এর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়।[৮] উৎপত্তিগতভাবে জমিদার বলতে বুঝায়, 'কোন ব্যক্তি যিনি জমির অধিকারী, কিন্তু এখন এর অর্থ দাঁড়িয়েছে: কোন ব্যক্তি যিনি গ্রাম বা শহরের জমির মালিক এবং চাষাবাদ চালাচ্ছেন।[৯] যতদুর জানা যায় মোগল সম্রাট আকবরের আমলে মূলত পর্যালোচ্য জমিদারের উদ্ভব। মুসলমান আমলে বিশেষ করে মোগল শাসনামলে জমিদাররা ছিল সরকারের পক্ষে রাজস্ব আদায়ের একটা নিয়োজিত শ্রেণী মাত্র, যাদেরকে কমিশনভোগী এজেন্ট বলা যায়। সরাসরি ভূমি মালিক বলতে অর্থাৎ মালিকানাজাত যে ক্ষমতা তথা ভূমি বিক্রয়, দান, বন্ধক, বন্দোবস্ত প্রদান বা

অন্যবিধ কোন অধিকার তাদের ছিল না। মোটকথা সম্রাটের সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করত তাদের জমিদারী, হোক তা বংশানুক্রমিক।

আলোচ্য সময়ে ভূমি রাজস্বের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত বেশ কয়েক ধরনের জমিদারির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টের 'Different classes of Zamindars' শীর্ষক অনুচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে :

> In analysing the status of the zamindars, it is important to bear in mind that before the Permanent Settlement there were different classes of revenue payers. There were, firstly, the original inedependent chiefs, such as the Rajas of Cooch Behar, Assam, Tripura, who retained possession of their territories on payment of revenue as tribute to the Moghul rulers; secondly, the old established landholding families, such as the Rajas of Rajshahi, Burdwan and Dinajpur, who were de facto rulers in their estates, and like the independent chiefs paid fixed land tax to the ruling power; thirdly, there were the collectors of revenue, who had been inducted by the Moghul Government, and whose office had tended, after several generations, to become hereditary; lastly, there were the farmers, who had been in charge of the collection of revenue after the grant of the Dewani, and who had come to be called by the general term 'zamindar'. It is obvious that if a settlement had to made with any one, the first two classes had a strong claim, the third class had a lesser claim, and the fourth had virtually no claim at all."[১০]

বলা বাহুল্য পূর্বোক্ত চার ধরনের মধ্যে শেষোক্ত জমিদারদের অধিকাংশ ছিল 'খুদ-কস্তা' বা ভূস্বামী কৃষক সম্প্রদায়; এরা প্রায় ১৭৮৭ সাল নাগাদ প্রকৃত জমিদারের মর্যাদা লাভ করে।[১১]

এ জমিদারেরা বাংলায় বৃটিশ শাসনের আগাগোড়া সরকারের বশংবদ কর্মচারী তথা অনুগত ভৃত্য ও সেবকের ভূমিকা পালন করে এসেছিল। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদার একই সঙ্গে জমির মালিক ও কর সংগ্রাহকে পরিণত হয়েছিলেন। সরকারের সঙ্গে এখন সম্পর্ক জমিদারের যারা রায়তদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সরকারের প্রাপ্য খাজনা কোষাগারে জমা দেবেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সরকার রাজস্বের হার যতোটুকু সম্ভব উঁচু করে ধরেছিলেন এবং রাজস্ব সংগ্রাহকের ব্যাপারে কোন কৈফিয়ত গ্রাহ্য করা হত না।[১২] অন্যদিকে, রায়তদের থেকে জমিদারের নির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায়ের শর্ত থাকা সত্ত্বেও, জমিদার প্রায় সে শর্ত লংঘন করে প্রজাদের কাছ থেকে জোরজুলুম করে খাজনা আদায় করত, অতঃপর বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যাস্তের পূর্বে সরকারী কোষাগারে স্থায়ী-প্রকৃতির পূর্বনির্দিষ্ট রাজস্ব জমা দিয়ে বংশপরম্পরায় তা ভোগ-অধিকার করত।

এ সময় বাংলার জমিদারেরা মূল খাজনা বৃদ্ধি না করে অবৈধ আবওয়াব আদায় করত। নদীয়া ও পাবনা জেলায় অবৈধ আদায়ের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশী। বাখরগঞ্জ সম্পর্কে

J. C. Jack বলেন, ঐ জেলায় কমপক্ষে কুড়ি লক্ষ টাকার আবওয়াব আদায় করা হত। এ টাকা ঐ জেলার মোট রাজস্বের চেয়ে বেশী এবং মোট রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ।[১৩] F. D. Ascoli -এর মতে ঢাকা জেলায় খাজনার প্রতি টাকায় গড়ে আড়াই থেকে পাঁচ আনা আবওয়াব দিতে হত।[১৪]

বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিদার ছিলেন হিন্দু। আঠার শতকের গোড়া থেকে যে ধারা শুরু হয়েছিল জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। বাংলার পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ সমস্ত অঞ্চলে প্রায় সমস্ত জমিদার ছিলেন হিন্দু। আবার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে মুসলমানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ সমস্ত অঞ্চলেও জমিদারদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। উদাহরণ স্বরূপ বগুড়া জেলাতে যেখানে জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ ছিল মুসলমান সেখানে মাত্র পাঁচজন মুসলমান জমিদার ছিল। রাজশাহী জেলায় মুসলমানরা ছিল জনসংখ্যার ৭৮ শতাংশ। এখানে মাত্র দু'জন মুসলমান জমিদার ছিল।[১৫]

মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে জমিদার তাঁর জমিদারী ঠিকিয়ে রেখেছিল। এতে তিনি নির্দিষ্ট হারে, নির্দিষ্ট সময়ে খাজনা পেতেন অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি আয় সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন এবং জমিদারী পরিচালনায় তাকে আর কোন সমস্যায় পড়তে হতো না। হাতে তখন তার প্রচুর সময়, কারণ উৎপাদনমূলক কোন ভূমিকা তার ছিল না যদিও তিনি যুক্ত ছিলেন জমির সঙ্গে। এছাড়া উদ্বৃত্তও তিনি লগ্নী করতে পারছিলেন না। আবার গ্রামের এ সীমিত পরিসরে সম্ভব ছিল না উদ্বৃত্ত খরচ করার। সুতরাং তাকে পা বাড়াতে হয়েছিল শহরের দিকে। সরকারী তথ্য অনুযায়ী উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এ যাত্রা শুরু। সে থেকে তাদের নাম হয়ে গেল অনুপস্থিত জমিদার।[১৬]

জমিদার শ্রেণী একই সঙ্গে জমিদারী, ব্যবসা, ব্যাঙ্কিং ও আইন ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ফলে প্রশাসনিক ও ব্যবসায়িক সুবিধার জন্য এদের অনেকে কলকাতায় সদর কার্যালয় স্থাপন করেন। এর ফলে বাংলার জমিদার শ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। আগের দিনের জমিদারদের মত এদের অনেকে জমিদারিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন না। বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে সৃষ্টি হয় অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণী। একজন সমাজ বিজ্ঞানী অনুপস্থিত জমিদার শ্রেণীকে তিনভাগে ভাগ করেছেন: ক. রাজধানীতে বসবাসকারী, খ. জেলা শহরে অবস্থানকারী ও গ. জমিদারীতে অবস্থানকারী অথচ রায়তের উন্নতিতে অনাগ্রহী।[১৭] তুলনামূলকভাবে অনুপস্থিত জমিদারদের জমিদারীতে শোষণ, পীড়ন, অত্যাচার ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য রকম কুফল বেশী দেখা দেয়। জমিদারের আমলা গোমস্তারা গ্রাম বাংলায় রায়তের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেন এবং জমিদার ও রায়তের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যগত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। গোমস্তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রায়ত জমিদারের বিরুদ্ধে বৃটিশ কোর্টে বিচার প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। আগের দিনের জমিদারদের সঙ্গে নতুন জমিদার শ্রেণীর এক লক্ষণীয় পার্থক্য হল উচ্চ ভূমি রাজস্বের জন্য এরা কৃষকদের কৃষিঋণ বা তাকাবি দিতে অপারগ হন। কৃষকরা কৃষিঋণের জন্য মহাজনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন।[১৮]

নিজ জমিদারীতে জমিদারের অনুপস্থিতির কারণ হিসেবে সিরাজুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন, যেহেতু জমির বাজার হয়ে উঠেছিল প্রতিযোগিতামূলক সুতরাং জমিদারেরা যেখানে জমিদারী পাওয়া গেল সেখানে তা কেনা শুরু করেছিলেন এবং এ সব জমিদারীর কোনটার সঙ্গে কোনটার সম্পর্ক ছিল না। তাই জমিদারের প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল একটি কেন্দ্রের।[১৯] মুনতাসির মামুনের মতে, যেহেতু জমিদারীতে তার কোন উৎপাদনমূলক ভূমিকা ছিল না এবং প্রজার সম্পর্ক ছিল তার একতরফা অর্থাৎ শুধু নেওয়ার, সে জন্যে অনুপস্থিত হওয়া ছাড়া তার আর কোন গত্যন্তর ছিল না। পূর্ব বঙ্গের অধিকাংশ জমিদার ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার। সরকারী হিসাব অনুযায়ী, বাকেরগঞ্জের অধিকাংশ, ফরিদপুরের চার ভাগের তিনভাগ এবং ময়মনসিংহের এক-অষ্টমাংশ থেকে এক-ষষ্টাংশ ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার।[২০] উদাহরণ হিসেবে পাবনা জেলার জমিদারীর একটি হিসাব নিচে দেয়া হল:

সারণি ১ : পাবনা জেলার অনুপস্থিত জমিদারের তালিকা / ১৯২৬

নং	জমিদারের নাম	নিবাস	
১	গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর		পাবনায় কাচারী
২	কেশবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	সাহাজাদপুর, বাগাবাড়ী, জমিরতা, উমরপুর	
৩	ওয়াজিদ আলী খান পন্নী	ঢাকা	কৈটোলা, সাহাবাজপুর
৪	বীরেন্দ্রকুমার রায়	মৈমনসিংহ	সাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ, আটঘরিয়া
৫	প্রমদানাথ রায় বাহাদুর	রাজশাহী	চাটমহর
৬	শরদিন্দুনাথ রায়	ঐ	সিলিমপুর, ভুলবারিয়া, সাঁড়া, করঞ্জা
৭	মনীন্দ্রনাথ নন্দী	ঐ	কিদিরপুর
৮	যোগেন্দ্র নাথ রায়	কাসিমবাজার	মালিফা
৯	খাজা হাবিবুল্লাহ	লালগোলা	পাবনাপত্তনী
১০	কিরণচন্দ্র রায় বাহাদুর	ঢাকা	রায় দৌলতপুর
১১	প্রমথভূষন দেব রায়	যশোর	গড়গড়ি
১২	হেমন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী	ঐ	কামালপুর
১৩	জানকীনাথরায় চৌধুরী	টাঙ্গাইল	সিরাজগঞ্জ, কাজীপুর
১৪	প্রমথনাথ রায় চৌধুরী	ঐ	নাটুয়ারপাড়া
১৫	হেরম্বনাথ চৌধুরী	ঐ	সিরাজগঞ্জ, মেহরা
১৬	বিনোদবিহারী চৌধুরী	আমবাড়িয়া	সিরাজগঞ্জ
১৭	সতীশচন্দ্র চৌধুরী	ধরাইল	শ্রীপুর
		নাগরপুর	খোকসা বাড়ী

উৎস: রাধারমন সাহা, *পাবনা জেলার ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ), পৃ. ১৬৩-৬৪।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর প্রাথমিক পর্যায়ে জমিদার ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচারী, কারণ জমিদার তখনও নিজ জমিদারীতে অবস্থান করছিলেন। সাহিত্যে ঐ সময়ে জমিদাররা চিত্রিত হয়েছেন দস্যু হিসেবে। এমনকি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও জমিদার সমর্থক 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছিল, জমিদার 'রাইয়তের রক্ত শোষিয়া লয়।'[২১] কিন্তু ক্রমে জমিদার যখন অনুপস্থিত জমিদারে পরিণত হলেন তখন তার হয়ে রায়তদের উপর প্রত্যক্ষভাবে অত্যাচার ও শোষণ করতেন গোমস্তা বা মধ্যস্বত্বভোগীরা। জমিদার ক্রমে পরিণত

হয়েছিলেন দূরের মানুষে। পূজাপার্বণে, ঈদে কদাচিত কখনো তিনি জমিদারিতে পদার্পন করতেন। কিন্তু দানধ্যান বা পিতৃত্বমূলক আচরণ করতেন এবং প্রজারা তার কাছে তার নায়েব গোমস্তার অত্যাচার সম্পর্কে বা অন্যান্য আবেদন অভিযোগ জানাতেন। জমিদারের সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক আমূল বদলে গিয়েছিল। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "রায়তের কাছে জমিদার দেবতা হতে পারে কিন্তু জোতদার ওরফে উপ-জমিদার যে উপ-দেবতা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ উপ-দেবতার উপদ্রব থেকে রায়তদের বাঁচাতে হবে।"[২২]

অন্যদিকে, আবার রায়তদের পক্ষে সরকারী যে কোন ধরণের সংস্কারের তারা ছিলেন ঘোর বিরোধী। ভূমি সংস্কারমূলক বিভিন্ন আইনের বিরুদ্ধে তাদের সভাসমিতি, স্মারকলিপি প্রভৃতি এর উদাহরণ।[২৩] কিন্তু জমিদারেরা যে প্রজাবৎসলও ছিলেন বা আঞ্চলিক উন্নয়নের জন্যে কাজ করতেন তা প্রমাণের জন্যে অনেকে গ্রামে গ্রামে জমিদারদের পাঠশালা বা স্কুল স্থাপনের কথা উল্লেখ করেছেন। সরকার ও তাদের ভালো কাজগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করেছিলেন, যেমন রিলিফ ও দাতব্য খাজনা মওকুফ ও অন্যান্য দয়া, এবং ব্যক্তিগতভাবে রিলিফের কাজে অংশগ্রহণ।[২৪] কিন্তু তাদের দানধ্যানের পরিমাণ কোথায় কোন খাতে তা করেছেন, বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, নিঃস্বার্থভাবে তারা দেশের জন্যে যা ব্যয় করেছেন তার থেকে বেশী না হলেও বিদেশী স্বার্থে তারা কম দান করেন নি। আর স্থানীয়ভাবে যা ব্যয় করেছেন তা নিজের প্রজাদের কথা ভেবে নয়, বৃটিশ কোন প্রতিনিধির সে অঞ্চলে পর্দাপণকে স্মরণ রাখার জন্যে বা উপনিবেশিক সরকারের অনুরোধে।[২৫] উদাহরণস্বরূপ ঢাকার নবাব আবদুল গণির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দানধ্যানের জন্যে তিনি ছিলেন বিখ্যাত। ঢাকা শহর উন্নয়নের জন্যেও তিনি অনেক দান করেছিলেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, রাজপ্রতিনিধিদের আগমন স্মরণার্থে বা কর্তৃপক্ষের অনুরোধে করা তাঁর দানের পরিমাণ নেহাৎ কম নয়।[২৬] এক কথায় বলা যেতে পারে, জমিদার সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন উপনিবেশিক কাঠামোর উপর। সমাজে তার কোন উৎপাদনমূলক ভূমিকা না থাকায়, পরিণত হয়েছিলেন তিনি পরগাছায়।[২৭]

রাজনৈতিকভাবে জমিদারেরা ছিলেন উপনিবেশিক সরকারের সমর্থক, কারণ এ শ্রেণী ছিল ঐ কাঠামোরই ফল। সরকারী প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাদের সমর্থন ছিল অকুণ্ঠ এবং সোচ্চার। ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক আইনসভায় ভূস্বামীদের জন্যে আসন সংরক্ষিত রাখার পরিপ্রেক্ষিতে জমিদার সংঘের সভাপতি ময়মনসিংহের মহারাজা বলেছিলেন, শ্রেণী হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব রাখতে হলে ইংরেজ শাসনকে সর্বতোভাবে শক্তিশালী করে তোলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।[২৮]

জোতদার

গ্রাম সমাজের অধিপতি জমিদারের চেয়েও আরেক শ্রেণীকে গ্রামের ক্ষমতা কাঠামোর প্রধান হিসেবে দেখা হয়। ১৭৯৩ সালের পর গ্রামাঞ্চলে জমিদারের ক্ষমতা প্রভূত বেড়ে গিয়েছিল। একই সঙ্গে গ্রাম সমাজে নতুন এক বিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার

করেছিল, যারা জোতদার নামে অভিহিত। বিদগ্ধজনেরা মনে করেন যে, বিশ শতকের প্রথম দিকে গ্রাম-সমাজের শ্রেণী দ্বন্দ্বের কেন্দ্র পুরনো দিনের জমিদার প্রজা থেকে আধুনিক কালের জমিদার জোতদার বনাম আধিয়ার ভাগচাষীর দ্বন্দ্বে সরে যায়। যদিও জমিদার কৃষি সমাজের মাথায়, কিন্তু অনেক সময় সে অনাবাসী। গ্রামের বাসিন্দা হিসেবে সে সবার উপরে এবং তার হাতে প্রচুর ভোগস্বত্ব জমি। সে নিজে দৈহিক পরিশ্রম করে না এবং জমি হয় ভাগচাষে দেয়, না হয় ভাড়াটে মজুর দিয়ে চাষ করায়। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হবার আগে (১৯৫০) , প্রায় একশ' বছর ধরে এ জোতদাররা গ্রাম বাংলার ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছিল।[২৯]

বাংলায় 'জোত' কথাটি সংস্কৃত 'যত্র' শব্দ থেকে এসেছে। জোত বলতে হয় চাষ কিংবা চাষের জমি বুঝায়। ১৯০৯ সালে জলপাইগুড়ির এক স্থানীয় অফিসার মন্তব্য করেন বড় ছোট সব জমিকে জোত বলা হয়।[৩০] সাধারণভাবে 'জোত' এর অধিকারী বা মালিককে জোতদার বলা হয়। অবশ্য এটি জোতদারের একটি অতি সাধারণ সংজ্ঞা। বিভিন্ন লেখক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে জোতদার -এর সংজ্ঞা দিয়েছেন:

F. W. Strong দিনাজপুরের জোতদারদের সম্বন্ধে বলেন, "দখলীস্বত্বাধীকারী কৃষকদের বলা হত রায়ত অথবা স্থানীয় ভাষায় জোতদার। এই শ্রেণীর সাথে নিু শ্রেণীর রায়তদের তফাৎ ছিল খুবই কম। কখনও কখনও নিু শ্রেণীর রায়তরা ভাগচাষীদের সাহায্যে নির্ধারিত খাজনায় জমি চাষ করত।"[৩১] এ থেকে আন্দ্রে বেতেই ধারণা করেন, এখানকার জোতদারদের বেশীর ভাগ ছিল ক্ষেতে কৃষিকর্মরত চাষী। [৩২]

W. W. Hunter এর মতে,

> "...jotdars are cultivators with rights of occupancy, and who, having held their lands for more than twelve years, are only liable to pay rent at fair and equitable rates, and can only be ejected from their lands in execution of a decree for non-payment of rent at the end of the years" [৩৩]

অর্থাৎ হান্টার জোতদারকে সরাসরি রায়ত হিসেবে অভিহিত করেছেন, সে যে শ্রেণীর রায়ত হোক না কেন।

ড. বিনয় ভূষণ চৌধুরী বলেন, যে ব্যক্তি বেশী পরিমাণ কৃষি জমির মালিক সে জোতদার। এ মালিকানা থেকে এক ধরণের ক্ষমতা আসে, যা ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়। যেমন এক শ্রেণীর ক্ষেত মজুর ও নির্ভরশীল চাষীর উপর প্রভূত্ব করার ক্ষমতা। এটা সে সব জায়গায় আরো বেশী করে আসে, যেখানে চাষের জমি আয়তনে বিশাল হওয়ার কারণে জোতদার নিজের পরিবার দিয়ে তা চাষ করতে পারে না, হয় ভাড়াটে চাষী মজুর রাখে, না হয় উপপ্রজা বা ভাগচাষীকে তার জমির খানিকটা অংশ দিয়ে দেয় চাষের জন্য। এছাড়াও যে সব জায়গায় সে চাষীকে ধার দিত, সেখানেও তার প্রভূত্ব অপরিসীম ছিল। এ থেকে দুটি সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। শুধুমাত্র বিশাল জমির মালিকানা থাকলে জোতদার ক্ষমতা বিস্তার করতে পারত, একথা ঠিক নয়। ছোট জমির মালিকেরাও একইভাবে আধিপত্য দেখাত।[৩৪]

অন্যদিকে ড. চিত্তব্রত পালিত উইলসন-এর শব্দকোষের সহায়তায় বলেন, যার জোত অর্থাৎ আবাদী জমি আছে সে জোতদার। আইনি দৃষ্টিতে, সে জমিদার অথবা ভূম্যধিকারী ভাড়াটে কৃষক এবং খাজনার তালিকায় রায়ত অথবা সাধারণ কৃষক হিসেবে নথিবদ্ধ। একটি বড় জোত আবার প্রজাস্বত্বে ভাগ করে দেয়া হত। সেক্ষেত্রে জোতদার একজন মধ্যস্বত্বভোগী। সে নিজে জমির একাংশ চাষ করতে পারে এবং বাকী অংশ ভাগচাষীদের অথবা কৃষকদের নগদ খাজনায় দিতে পারে। এভাবে দেখলে জোতদার নিছক কৃষক নয়, জমিদারের মত।[৩৫]

বাংলার এক জেলা থেকে আরেক জেলায় জোতদারদের মালিকানাধীন ভূসম্পত্তি বা ভূস্বত্বের আকার-আয়তনের তথা ভূমির পরিমাণের কোন সুনির্দিষ্টতা ছিল না। দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার থেকে জানা যায়, এখানকার জোতদারদের অধীনে মোটামুটি ২ একর থেকে ১,১৯০ একর পরিমাণ ভূমি ছিল অর্থাৎ ২-একরবিশিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী যেমন জোতদার বলে পরিচিত ছিল, তেমনি ১,১৯০ একর বিশিষ্ট ভূমধ্যকারীও পরিগণিত হত জোতদার নামে।[৩৬] রংপুর-দিনাজপুরের উপর সার্ভে রিপোর্ট তৈরী করতে গিয়ে A. C. Hartney দেখেছিলেন, এ অঞ্চলের প্রতি ১৬ জন কৃষকের মধ্যে ১ জন ছিল জোতদার এবং তাদের মালিকানায় সর্বনিম্ন ৩০ একর থেকে সর্বোচ্চ ১০০ একর পর্যন্ত ভূমি ছিল।[৩৭] জোতদারদের প্রধান বিচরণস্থল ছিল বাংলার বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে বা জেলায়, যেমন উত্তর বাংলা, ২৪-পরগণার কিছু অংশ ও খুলনায়[৩৮] বিশেষত সুন্দরবন, বাকেরগঞ্জ ও পশ্চিম ডুয়ার্সের বিশেষত দার্জিলিং জেলায়।[৩৯] এসব এলাকায় নতুন আবাদি ভূমি সম্প্রসারণের সাথে জোতদারদের দখল বিস্তৃতির একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অসংখ্য নদনদীবাহিত সুন্দরবঞ্চালে নতুন চর ভূমি জেগে উঠা মাত্র স্থানীয় ধনী কৃষক ও প্রভাবশালী জোতদাররা নিজস্ব লোক-লস্কর, লাঠিয়াল দিয়ে সেগুলি জবর দখল করত। আবার প্রতিনিয়ত জঙ্গল কেটেও আবাদ সম্প্রসারণের চেষ্টা করত। অতঃপর সেখানে নিজেদের পছন্দ মত ও আজ্ঞাবাহী 'উঠবন্দি' রায়ত-প্রজাদের এনে বসাত।[৪০] অবশ্য জোতদাররা প্রচলিত আইনে খুব স্বল্প খাজনায় সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে এগুলি ১০, ২০ বা ৩০ বছর মেয়াদে ইজারা নেয়ার কাজটিও সেরে ফেলত।[৪১] চাষী প্রজারা চরে বা নতুন আবাদী ভূমিতে ধান ইত্যাদি উৎপাদন করলে জোতদররা এর একটা বড় অংশ পেত। অন্যত্র বিশেষ করে দিনাজপুর, রংপুর, পশ্চিম ডুয়ার্স বা দার্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলের পতিত ভূমি, দুর্গম জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকায় এরা স্থানীয় আদিবাসী উপজাতীয়দের কাজে লাগিয়ে আবাদ সম্প্রসারণ করত। প্রাথমিক পর্যায়ে তারা এগুলি আদিবাসীদের ভোগদখল করতে দিলেও পরবর্তী সময়ে নানা অজুহাতে সেখান থেকে তাদের উৎখাত করে অধিক খাজনায় অন্যদের মধ্যে বিলি-বণ্টন করত।[৪২] বস্তুত এভাবে জোতদাররা এক-একজন বিপুল পরিমাণ ভূমি বা জোতের মালিক-অধিকারী হয়ে উঠত এবং সেই সঙ্গে গ্রাম থেকে গ্রামে প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করত।

জোতদাররা নতুন আবাদী জমিতে চাষাবাদের জন্য গরিব চাষীদের প্রাথমিক সহযোগিতার অজুহাতে 'দাদন', ঋণ বা অগ্রিম বাবদ নগদ অর্থ দিত, এমনকি হালের বলদ, লাঙ্গল ও শস্যবীজ পর্যন্ত। পরে ফসল উঠার সময় চাষীদের কাছ থেকে অগ্রিম দেয়া ঋণ, বীজ প্রভৃতির মূল্য তো গ্রহণ করত, অধিকন্তু খাজনা বাবদও হাতিয়ে নিত উৎপন্নের বড় অংশ। জোতদাররা যেমন বিস্তৃত জমির মালিক ছিল তেমনি বর্গাচাষী বা আধিয়ারদের মধ্যে বছরের পর বছর শস্যবীজ বিতরণ ও নগদ ঋণ আদান-প্রদান করে গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক শ্রেণীকাঠামোয় একটি শক্তিশালী নিয়ামক হিসেবে গড়ে উঠে। ফলে এক হিসেবে এদের ক্ষমতা ও প্রভাব-বলয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে জমিদার ও মহাজনের চেয়েও বেশী ছিল বললে অত্যুক্তি হবে না। বস্তুত আইনত জমিদাররা ভূমির প্রকৃত মালিক হলেও তারা চাষীকে কোনরূপ শস্যবীজ বা ঋণ দিয়ে আগেভাবে বসে আনতে পারত না। অন্যদিকে কুসীদজীবি মহাজনেরা প্রায় সময় ঋণের চালাচালি করলেও তাদের নিজস্ব ভোগদখলি ভূমি ছাড়া খুব কম ভূমি বর্গা বা আধি দেয়ার মত। ফলে জোতদারদের মত উভয় পথে এরা (জমিদার ও মহাজন) কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হত না। স্বভাবত গ্রামে জোতদাররা হয়ে উঠেছিল খুবই শক্তিধর ও প্রভাবশালী। ড. বিনয় ভূষণ চৌধুরী বলেন, গ্রাম বাংলায় প্রধানত জোতদারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৃটিশ শাসনকালের দুই শতক জুড়ে বাংলার কৃষি জগতের প্রধান সম্পর্ক ছিল আধাসামন্ততান্ত্রিক, যার বৈশিষ্ট্য ছোট চাষ জমি, ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষ এবং জোতদার ও আধিয়ারের মধ্যে প্রভূ-ভৃত্যের সম্পর্ক। যে সব জোতদার আবার তেজারতি ব্যবসা করত, তাদের সঙ্গে আধিয়াররা আরো বেশী দায়বদ্ধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে।[৪৩] এ আলোচনা থেকে কৃষি অর্থনীতি ও ক্ষমতা কাঠামোয় জমিদারদের তুলনামূলক কম আধিপত্য ও জোতদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাওয়া যায়।[৪৪]

ড. চিত্রব্রত পালিত বলেন,

> "...জোতদাররা ছিল গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণী। আভিজাত্যের চিহ্ন হিসেবে তারা হাতি পুষত। তাদের পুত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে আইনজীবি হত। তাদের নিজেদের পাকা বাড়ি ছিল এবং অসংখ্য গোলায় ধান মজুত থাকত। গবাদি পশুর ছাউনি আর গৃহভৃত্যের জন্য পৃথক আবাস ছিল। পোর্সার শাহ চৌধুরীদের দোতলা বাড়ি ছিল এবং ৬০ হাজার মন ধান গোলায় মজুত থাকত। এসব জোতদাররা কৃষি মজুর অথবা ভাগচাষীদের সাহায্যে বড় আকারে জমি চাষ করত। তারা গ্রামাঞ্চলে ঋণ দিত আর জেলার অধিকাংশ রপ্তানীযোগ্য শস্য বিপণন করত। . . . . এদের তলায় যারা ছিল তারা কোনও প্রকারে ভাগচাষ করে উপার্জন করত। সব শেষে ছিল এক বিশাল সংখ্যক আধিয়ার।[৪৫]

পরিশেষে বলা যায় যেহেতু জোতদাররা কৃষকদেরকে নানাভাবে শোষণ করত, তাদের কষ্টার্জিত শ্রমের ফসলের ভাগ নিত এবং অন্যান্য উদ্বৃত্ত ভোগ করত, সুতরাং জোতদাররা অবশ্য এক শ্রেণীর মধ্যস্বত্বভোগী ছিল। তবে জমিদারদের মতো কোনক্রমে প্রধান

সুবিধাভোগী ছিল না তা অনস্বীকার্য। আবার প্রধান সুবিধাভোগী না হলেও অন্যতম মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে যে এরা ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের পুরোপুরি সাহায্যকারী ও বাংলার রায়তের অনেক দুর্গতির অনুঘটক ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। ড. রংগলাল সেন যথার্থ বলেছেন, "এখানে একটি কথা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ১৭৯৩ সনে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তার পরবর্তীকালে আনুষঙ্গিক পত্তনি প্রথা সৃষ্ট যে জোতদার শ্রেণী উনিশ শতকের বাংলার সমাজ কাঠামোয় একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয় তাকে অনেক ঐতিহাসিক বাংলার বৃটিশ শাসক এলিট বর্গের প্রধান অবলম্বন ও গ্রাম বাংলার অনুন্নয়নের অন্যতম সামাজিক কারণ হিসেবে চিহ্নত করেছেন।"[৪৬]

বর্গাদার বা ভাগচাষী

'বর্গা', ভাগচাষ বা 'আধি' প্রথা – বাংলা তথা ভারতীয় চাষাবাদের এক অতিপ্রাচীন ব্যবস্থা।[৪৭] ভারতের বাইরেও পৃথিবীর অন্যত্র বিশেষত ইরাক, গ্রীস, ইতালি (রোম), ফ্রান্স, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অঞ্চলেও এর প্রচলন ছিল। মুঘল যুগে এর অস্তিত্ব ছিল। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশের ভূমি রাজস্বের ভার হাতে নেয় তখনও বর্গাপ্রথা প্রচলিত ছিল। বর্গা প্রথায় প্রজারা নানা নামে পরিচিত, যথা – বর্গাদার, আধিয়ার, ভাগ-জোতদার, ভাগচাষী ইত্যাদি। ইংরেজ আমলে ভূমিতে যে কয়'টি[৪৮] পদ্ধতিতে চাষাবাদ হত তার মধ্যে বর্গাচাষ ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। উনিশ শতকের গোড়ায় ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় সবচেয়ে বেশি ভাগচাষপ্রথা প্রচলিত ছিল। বাংলায় সবচেয়ে ভাগচাষপ্রবণ জেলা রংপুর ও দিনাজপুর সংক্রন্ত নিচের ছকে প্রদর্শিত পরিসংখ্যান থেকে তা প্রতীয়মান হয়ঃ

সারণি ২ : ভাগচাষী (আধিয়ার) ও ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক (%)

রংপুর	১৮০৮	১৯৩৮
ভাগচাষী বা আধিয়ার	৩৯.৪	১৯.১
কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুর	১১.৬	১২.৯
আংশিক মালিক, আংশিক ভাড়া দেয়া ও ভাড়ায় কাজ করা কৃষক	নাই	নাই
মোট ভূমিহীন কৃষক	৫০.০	৩২.০

দিনাজপুর	১৮০৮	১৯৩৮
ভাগচাষী বা আধিয়ার	৩৪.০	১৩.৮
কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুর	১৮.১	২৩.৫
আংশিক মালিক, আংশিক ভাড়া দেয়া ও ভাড়ায় কাজ করা কৃষক	নাই	নাই
মোট ভূমিহীন কৃষক	৫২.১	৩৭.৩

উৎস: রজত কান্ত রায় ও রত্নলেখা রায়, *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন*, ২য় ভাগ, (কলকাতা, ১৯৯৬), পৃ.৮৫।

উক্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে ভাগচাষী বা আধিয়ারের সংখ্যা অনেকখানি কমে গেলেও এ সময় কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।

'বর্গাদার' একটি ফারসী যৌগিক শব্দ, যার 'বর্গা' অর্থ ভাগ বা ভাটোয়ারা এবং 'দার' অর্থ মালিক বা অধিকারী --সুতরাং আভিধানিকার্থে বর্গাদার বলতে বুঝায় ভূমিতে উৎপন্ন ফসল বা শস্যের ভাগের মালিক বা অংশভোগী।[৪৯] বর্গাদারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বাসুদেব মাইতি বলেন, "একজন কৃষকের স্বত্ত্বীয় জমিতে অন্য একজন কৃষক শ্রম, বীজ, সার ও লাঙ্গল দিয়ে উৎপাদন করার পর উভয়ে ঐ উৎপন্ন শস্য ভাগ করে নেয়--চাষের এ প্রথাকে বলা হয় ভাগ চাষ এবং শস্য উৎপাদনকারী কৃষককে বলা হয় ভাগচাষী (বা ভাগীদার) এবং ঐ জমির স্বত্ত্বাধিকারী কৃষককে বলা হয় মালিক (জোতদার)।[৫০] বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা'র প্রতিবেদনে বর্গাদার নির্দেশ করা হয়েছিল, "যে কৃষক সাধারণত নিজের লাঙ্গল-গরু দিয়ে নিজের খরচায় অপরের জমি চাষ, বপন, কাটাই ও মড়াই করে উৎপন্ন ফসলের একটি ভাগ জমির মালিককে দেয় এবং অবশিষ্ট অংশ নিজে নিয়ে থাকেন, তাকেই ভাগচাষী বা বর্গাদার বলে। বর্গাদার সাধারণত জমির মালিককে উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ দিতে বাধ্য হন, তাই বর্গাদার বা ভাগচাষীর অপর প্রচলিত নাম আধিয়ার; এই প্রথাকেই বলে আধিপ্রথা।"[৫১]

বাংলার নিম্ন ও গরিবশ্রেণী বিশেষত ভূমিহীন কৃষকরা নানা কারণে স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি জমিদার বা ভূস্বামী, ধনী কৃষক ও জোতদারদের কাছ থেকে ভূমি নিয়ে বর্গা চাষ করত। আরো নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায় এছাড়া তাদের জীবিকা নির্বাহের আর কোন উপায় থাকত না। কেননা উপনিবেশিক বেনিয়া ভূরাজস্ব-কৃষি অর্থনীতির কারণে বাংলার ঐতিহ্যবাহি গ্রামীণ শিল্পগুলি বিপর্যস্ত ও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত শুধু হয়নি, বরং এগুলিতে নিযুক্ত শিল্প ও শিল্পশ্রমিকের জীবিকার অন্য কোন সহজ উপায় না পেয়ে সহজে তারা ভিড়ে যেত ভূমি বা কৃষি কাজে। অন্যদিকে জোতদার ও অবস্থাপন্ন ভূমি মালিকেরা এদেরকে খুঁজে নিত। অবশ্য এদের তা না করে উপায় ছিল না।

ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রচলনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া হিসেবে বা অন্যকথায়, হিন্দু ও মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে প্রতিনিয়ত ভূমি বিভাজনের ফলে এ সমস্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যরা যেমন মূল বংশ বা পরিবার থেকে ক্রমাগত আলাদা হয়ে পড়েছিল, তেমনি এদের তথাকথিত কৌলিন্য থাকায় এরা সাধারণ চাষীদের মত নিজেরা নগদ অর্থে ভাড়াটে 'মুনিষ' দিয়ে ভূমি চাষ করতে পারত না। সঙ্গত কারণে এরা দ্বারস্থ হত ভাগচাষী বা বর্গাদারদের। অবশ্য এ যুগের ক্রমপ্রসারমান বাজার অর্থনীতির তেজিভাবও এ সব ধনীগৃহস্থ পরিবারগুলোকে ভাগ-পদ্ধতির চাষাবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

বর্গা বা ভাগচাষের সাধারণ ও প্রচলিত নিয়ম হল উৎপন্ন ফসল চাষী ও জোতদার বা মালিকের মধ্যে ভাগ হবে আধা-আধি ফসল পদ্ধতিতে।[৫২] বর্গাপ্রথায় চাষের সমগ্র খরচ বহন করতে হত বর্গাদারদের। তবে বীজের ব্যাপারে নানা ধরনের নিয়ম প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঢাকার বাকেরগঞ্জের বর্গাপ্রথা সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয়েছে: "অধিকাংশ

ক্ষেত্রে মালিকের পক্ষ থেকে বর্গাদারকে কোনো প্রকার সাহায্য করা হয় না, যেখানে তা করা হয়, সেখানেও তা প্রয়োজনীয় বীজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।[৫৩] এছাড়া ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায় ব্যাপক অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়: "শতকরা ৪২ ভাগ ক্ষেত্রে ভূস্বামীরা বীজ সরবরাহ এবং ২ ভাগে ক্ষেত্রে হালগরুও সরবরাহ করে। [৫৪]ভাগচাষীকে উৎপাদিত ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ মালিকের হাতে তুলে দিতে হত এমনও উদাহরণ যথেষ্ট রয়েছে। আবার বাংলাদেশের তেভাগা আন্দোলনের দাবী ছিল ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ ভাগচাষীরা পাবেন এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে ও সমসাময়িকভাবে হলেও কোথাও কোথাও এটি প্রযোজ্য হয়েছিল।[৫৫] বাসুদেব মাইতি উল্লেখ করেন, "ভাগচাষ বিষয়ে সাধারণ প্রথা হচ্ছে, জমির মালিকের সঙ্গে ভাগচাষীর মৌখিক আলোচনার মাধ্যমে ভাগচাষী মালিকের জমি চাষ করে। প্রধানতঃ ধান চাষ এবং সাধারণতঃ উৎপন্ন ধানের এবং খড়ের অর্ধেক ভাগচাষী মালিককে দেয় এবং বাকী অর্ধেক নিজে নেয়। কোথাও কোথাও মালিক শুধু অর্ধেক ধান নেয়, ভাগচাষী অর্ধেক ধান ও খড় নেয়।[৫৬]" তবে আধা-আধি বখরা তখন প্রথমত হত যেক্ষেত্রে বর্গাদার বা ভাগচাষী চাষের সকল রকমের সরঞ্জাম যেমন লাঙ্গল, গরু, বীজ প্রভৃতি সরবরাহ করত। কিন্তু সেক্ষেত্রে ভূমি যথেষ্ট উর্বর এবং ভূমির মালিক স্বয়ং চাষের সরঞ্জামাদি বিশেষত বীজধান-সরবরাহ করে, সেখানে ফসল ভাগ হয় এক-তৃতীয়াংশ বর্গাদার ও দুই-তৃতীয়াংশ ভূমি মালিকের -এই হিসেবে।[৫৭]

এ অলিখিত চুক্তির প্রায়শ ব্যত্যয় ঘটত এবং সেটা মূলত মালিকের পক্ষ থেকে। মালিক, প্রকৃত ফসল ভাগাভাগির আগে, শস্য যখন কাটা হয়ে মাড়াইয়ের জন্য তার 'খোলেনে' (বর্হিবাটিসংলগ্ন বড় উঠান) আনা হত, তখন আগেভাগে সে কিছু পরিমাণ শস্য বিভিন্ন অজুহাতে অন্যায়ভাবে কেটে রাখত।[৫৮]

প্রকৃতপক্ষে মালিক ও উৎপাদকের মধ্যে ফসলের বিভাজনটা আধাআধি হোক বা দুই-তৃতীয়াংশ হোক, তার অর্থ এ নয় যে উৎপাদক ফসলের অর্ধেকাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ তার নিজের ভোগের জন্য পেয়ে যাবেন। বস্তুতঃ তারা এটা পেত না এ কারণে যে তাদেরকে মূল খাজনা ছাড়াও আরো বিভিন্ন ধরণের কর প্রদান করতে হত। মূল খাজনা ছাড়াও বর্গাচাষীকে ধান কাটার পর মাড়াইয়ের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে তা তুলতে হত ভূস্বামী কর্তৃক নির্ধারিত কোন স্থানে এবং ফসল বিভাজনের সময় এ 'ধান মাড়ানোর স্থান' ব্যবহার বাবদ ভাগচাষীর ভাগ থেকে 'উঠান থ্যাচানী' নামের আবওয়াব হিসেবে কিছু ধান কেটে রাখা হত। তাছাড়া ধানের গোলা মেরামতের খরচ বাবদ ভাগচাষীর ভাগ থেকে নেয়া হত 'গোলা বান্ধানী'। ধান ভাগাভাগির সময় মালিক পক্ষীয় যে লোক পরিমাপ করতো, তার পারিশ্রমিক হিসেবে কেটে রাখা হত 'মহলেদারী', মাড়ানোর স্থানে স্তুপীকৃত ধান পাহারা বাবদ নেয়া হত 'দস্তুরী'। ফসল বিভাজনের সময় যে হিসাব রাখত তার জন্যও কেটে রাখা হত আরেক ধরনের আবওয়াব।[৫৯]

উপর্যুক্ত খাতগুলো ছাড়া আরো অনেক খাত ছিল। ধান মড়ানোর কেন্দ্রে 'খোলান' ঝাড় দেয়া ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য জমির মালিক নিয়োগ করতেন একজন লোককে। তার পারিশ্রমিক বাবদ ভাগচাষীর ভাগের- ধান থেকে কেটে নেয়া হত 'খোলানী'। জমির

মালিকের দর্শন লাভ করতে হলে দিতে হত 'নজরানা'। বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হত মসজিদের জন্য চাঁদা। হিন্দু জমিদার বা বড় জোতদাররা পূজোর সময় বিরাট প্যাণ্ডেল বেঁধে পূজোর আয়োজন করতেন, তার ব্যয় নির্বাহের জন্যও বাধ্যতামূলক চাঁদা দিতে হত। জমিদার বা জোতদার যে বাহিনীর সাহায্যে কৃষকদের উপর নিপীড়ন করত সে বাহিনীর ভরনপোষণের জন্য ভাগচাষীসহ কৃষকদের দিতে হতো এক ধরনের আবওয়াব যার নাম ছিল 'বরকন্দাজী'।[৬০]

বর্গা বা ভাগচাষ পদ্ধতির খারাপ প্রবণতাগুলি ছিল মারাত্মক। এর মধ্যে একটি অন্যতম বিরূপ প্রবণতা হল, জমির মালিক বা জোতদাররা বর্গাদারদের কাছ থেকে যে হারে 'বখ্‌রা' নিত না কেন, তারা কখনো বর্গাদারকে প্রাপ্তি-রসিদ বা 'খাজনা' গ্রহণসংক্রান্ত কোন কাগজ দিত না।[৬১] এর ফলে নানা অজুহাতে, বিশেষত ১৮৮৫ সালের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' জারির ফলে যে কোন ধরনের কৃষক বা রায়তের একাধিক্রমে ১২ বছর দখলিস্বত্ব অর্জনের কারণে যখন তাকে একমাত্র দিওয়ানি আদালতের আদেশ বা রায় ছাড়া উচ্ছেদ করার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়, তখন থেকে ভূমি মালিকেরা চেষ্টা করত, রায়ত ও বর্গাদারদের এক-দুই বছর পরপর পাল্টে ফেলতে, অর্থাৎ একই জমি একবার এক তো পরের বার অন্য একজনকে। এতে করে বর্গাদারদের অধিকৃতি ও চাষাধীন ভূমি ঘন ঘন হাত বদল হত। কিন্তু এ সময় বর্গাদার স্বীয় দখলিস্বত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আদালতে কোনরূপ রসিদ বা কাগজপত্র দেখাতে পারত না।[৬২]

আধা-আধি ভাগ বা 'আধি' প্রথায় উৎপন্ন ফসল সমর্পণ যে কোন বিবেচনায় চাষীর জন্য ছিল যথেষ্ট কষ্টসাধ্য। Floud Commission-এর ভাষায়, "No one denies that the produce is an excessive rent"[৬৩]. এটি আরো দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াত যেক্ষেত্রে ফসল হোক বা না হোক, চাষীকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল ভূমিমালিককে দেয়ার চুক্তিতে ভূমি বর্গা নিতে হত। বস্তুত কোন কারণে কোন বছর ফসল কম বা সম্পূর্ণ হানি হলে এ সময় তাকে বাজার থেকে নগদ চড়া মূল্যে শস্য কিনে দিতে হত।[৬৪] অনিবার্যভাবে তখন তাকে ঋণ নিতে হতে মহাজনের কাছ থেকে। অবস্থা তখন কত মারাত্মক হত তা বুঝা যায় ড. বিনয়ভূষণ চৌধুরীর মন্তব্যে। তিনি বলেন, বেশীর ভাগ আধিয়ার ও ছোট চাষী তাদের মোট সম্পত্তির মূল্যের চেয়েও এসব ধনী মহাজনদের কাছে বেশী ঋণী ছিল এবং এরা অগ্রিম ধান চাল না দিলে বছরে ছ'মাস তাদের না খেয়ে থাকতে হত। এরা আবার দরকারে বীজও ধার দিত।[৬৫]

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের বর্গাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। স্থানীয় রীতি এবং মালিকের প্রয়োজন অনুযায়ী বর্গাব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। বর্গাদারদের অধীনে স্থাপিত জোতগুলি সাধারণত ছোট ও বিক্ষিপ্ত। এম. এম. গুপ্ত যে হিসাব দেখিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, বাংলার পঞ্চাশ লক্ষ অধীনস্ত রায়ত বা ভাগচাষীর অধীনে দু বিঘারও কম জমি ছিল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্গাদাররা ভিন্ন ভিন্নভাবে ও হারে খাজনা দিত। বেশীরভাগ

অঞ্চলে বর্গাদার বা ভাগচাষী উৎপন্ন ফসলের ৫০ শতাংশ মালিককে খাজনা হিসেবে দিত।[৬৬]

বর্গাদাররা আসলে ছিল এক ধরনের মেটায়ের রায়ত, যারা মালিকের অধীন জমিতে স্বত্বহীন এবং উৎপন্ন ফসলে উচ্চহারে খাজনা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইনে বর্গাদারদের অধীকারকে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। শুধু যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যে খাজনা দিত এবং সরকারি নথিপত্র ও আদালতে যাদের নাম নথিবদ্ধ ছিল তাদের বর্গাদার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে বলা হয়। এদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পর কৃষি অর্থনীতিতে বর্গাদারদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। ঐ আইনে কৃষককে জমি হস্তান্তরের অধিকার দেয়া হয়। ল্যাণ্ড রেভেন্যু কমিশন মন্তব্য করেছে ঃ 'অবাধ হস্তান্তর নীতি কৃষকের জমি মহাজনের হাতে বা কৃষির সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষের হাতে তুলে দিল। এর ফল হল সীমাহীন করের বোঝা নিয়ে বর্গাদার ও অধীনস্ত রায়তদের সংখ্যা বেড়ে চলল।[৬৭]

সারণি ৩ : কৃষক সমাজে বর্গাদার ও ক্ষেতমজুর -শতকরা হার

জেলা	বর্গাদার	ক্ষেতমজুর	জেলা	বর্গাদার	ক্ষেতমজুর
বর্ধমান	২৭.২	৪০.৪	ফরিদপুর	২৩.৮	২০.০
বীরভূম	১২.৯	৩৯.৬	বাখরগঞ্জ	৭.১	২৩.৬
বাকুড়া	৬.৬	২৪.৬	চট্টগ্রাম	১.৮	১১.৬
মেদিনীপুর ৬.৫	২৪.৯		ত্রিপুরা	১.১	৪.৮
হুগলি	২৭.৭	২৪.৯	নোয়াখালি	২.২	১৭.৯
হাওড়া ২৭.১	৩১.২		রাজশাহী	১৩.০	২৩.৮
২৪-পরগণা ১৮.৭	১৭.৩		দিনাজপুর	১৩.৮	২৩.৫
নদীয়া ৬.৭	৩৬.১		জলপাইগুড়ি	২৬.৬	৪.১
মুর্শিদাবাদ ১০.৯	৪০.৮		রংপুর	১৯.১	১২.৯
যশোর ৪.২	৭.৯		বগুড়া	১৩.৪	২৫.৯
খুলনা ১৩.২	৪১.৯		পাবনা	১৬.১	১৫.২
ঢাকা ৬.৯	২২.২		মালদা	১৮.৭	
	৩৯.৮				
ময়মনসিংহ ৭.৩	২০.০				

উৎস: Partha Chatterjee, *Bengal (1920-1947): The Land Question*, K.P. Bagchi, (Calcutta,1984), p .43.

মূলতঃ ১৯২৮ সালে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী আইন পাশ হওয়ার পর থেকে বর্গাদারদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং দেশবিভাগ-পূর্ব তথা ১৯৩৯-১৯৪৫ সাল সময়কালে বাংলায় ভূরাজস্বনির্ভর সমাজ কাঠামোয় বর্গাদার বা ভাগচাষীদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়। এ সময় যে ব্যাপক পরিমাণ ভূমি চাষ করা হত তার একটি নির্বাচিত পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। বস্তুত এ থেকে প্রতীয়মান হবে যে, এ যুগে তাদেরকে অস্বীকার করে ভূরাজস্ব সম্পর্কিত কোন আইনকানুন প্রণয়ন বা নীতি-আদর্শ বাস্তবায়নের কাজ ছিল অসম্ভব।

রায়ত বা ক্ষুদ্র ও গরীব চাষী

সাধারণত 'রায়ত' (আরবি শব্দ, অর্থ প্রজা বা চাষী[৬৮]) বলতে ভূমির বা কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদেরকে বুঝায়। এ অর্থে খাজনাগ্রহীতা জমিদার, তালুকদার

ও অপরাপর প্রকৃত ভূমি-মালিক ও মধ্যস্বত্বাধিকারী এবং মহাজন, নীলকরের মত অনুরূপ মধ্যস্বত্বভোগী গোষ্ঠী ব্যতীত বাংলার সকল শ্রেণীর রায়ত-প্রজা এর অন্তভূক্ত; সেক্ষেত্রে ধনী কৃষক ও জোতদার, মধ্য বা মাঝারি কৃষক এবং নিু বা ক্ষুদ্র ও গরীব কৃষক সকলে এ সংজ্ঞার মধ্যে এসে যায়।

ভূমির উৎপাদন তথা ভূমি থেকে আয়, ভূমিতে স্থিত স্বত্বের ধরণ ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে প্রখ্যাত ভারতীয় অর্থনীতিবিদ ড. ডানিয়েল থর্নার ভারতীয় কৃষি সমাজের যে শ্রেণীবিন্যাস করেছেন[৬৯] তাতে তিনি সাধারণ রায়ত বা ক্ষুদ্র ও গরিব প্রজা বলতে বুঝিয়েছেন,

> *Poor tenants*, having tenancy rights but less secure; holding too small to a family's maintenance and income derived from land often less than that earned by wage labour[৭০]

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রফেসর উৎসা পাটনায়েক বলেন,

> A peasant cultivator of *owned land* may be a poor, middle or rich peasant, depdnding on the amount of land, labour hiring and other characteristics. A peasant cultivator of whoily tenanted land may similarly be a poor peasant, middle or rich peasant. . . .The poor peasant cultivating wholly leased land pays the emtire surplus as rent; but if the surplus itself is largely produced by hiring the labour of others, this defines the rich peasant character.[71]

W. H. Moreland সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করে বাংলার কৃষককুল সম্বন্ধে যা বলেন,

> The peasant is the man who, whatever the incidents of his tenure may be, cultivates a holding entirely or mainly by his family labour, for his own profit, and at his own risk. He must be distinguished from the Intermediary, who claims a share of the produce, but does not himself take an active part in production, and on the other hand from the self whom he feeds, or the hired labourer to whom he pays wages.[৭২]

রায়ত তথা কৃষকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এক কথায় গ্রিয়ারসন বলেন, যারা মূলত ও প্রধানত নিজের জমি চাষ করে জীবনধারণ করে তারা কৃষক।[৭৩] আলোচ্য সংজ্ঞায় দেখা যায়, এখানে কৃষক বলতে শুধু সরাসরি জমি চাষের সঙ্গে জড়িতদের বুঝানো হয়েছে।

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা সাধারণ রায়ত বা ক্ষুদ্র চাষী ও গরীব চাষী বা কৃষক বলতে এমন এক শ্রেণীকে নির্দিষ্ট করতে পারি যারা প্রথমত ও প্রধানত ভূমি ও কৃষির সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত এবং যাদের—

এক. কারও কারও সামান্য পরিমাণ ভূমির স্বত্বাধিকার থাকত, যদিও তা ছিল অত্যন্ত ভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল এবং অধিকাংশের তা থাকত না।

দুই. এরা খাজনা দিত এবং অন্যভাবেও অবিরাম শোষণের শিকার হত।

তিন. জীবিকার প্রয়োজনে এরা অন্যত্র কায়িক শ্রম বিক্রি করত, বলাবাহুল্য যেটা উচ্চ বা ধনী কৃষকদের আদৌ এবং মধ্য বা মাঝারি কৃষকদের সচরাচর (অবস্থান্তর না ঘটলে) করতে হত না।[৭৪]

ইংরেজ শাসনামলে বাংলার রায়তশ্রেণীকে মূলত দু'টি পদ্ধতিতে বিভাজনের রীতি প্রচলিত ছিল। প্রথমত বাসস্থান ও অধিকারের ভিত্তিতে; দ্বিতীয়ত জমিদারকে খাজনা দেওয়ার পদ্ধতি অনুসারে। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী রায়ত ছিল তিন শ্রেণীর[৭৫] –ক. ঘারি (ফারসী 'হার' শব্দ জাত যার অর্থ খাজনা বা রাজস্ব), খ. ফসলি (আরবী 'ফস্বল' শব্দজাত যার অর্থ শস্য), গ. খামার। জমিতে আবাদ হোক বা না হোক – জমির জন্য যারা বিঘা প্রতি নির্দিষ্ট হারে খাজনা প্রদান করত তাদেরকে বলা হত 'হরি'। যারা উৎপন্ন ফসলের ভিত্তিতে জমির খাজনা দিত তারা ছিল 'ফসলি' রায়ত। উল্লেখ্য হরি এবং ফসলি উভয় শ্রেণীর রায়ত তাদের খাজনা দিত নগদ অর্থে। কিন্তু খামারী রায়তরা ফসলি রায়তদের মত উৎপাদিত শস্যে খাজনা দিত যা সাধারণ উৎপন্নের ৫০% হত। কিন্তু এরা নগদ অর্থে খাজনা দেওয়ার অধিকারী ছিল না।

বৃটিশ শাসনের শুরু থেকে শেষ অবধি (১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন পর্যন্ত) বিভিন্ন সময়ে কৃষক বা রায়তদের বিভাজন করা হয়। জন শোর তাঁর ১৭৮৯ সালের ১৮ই জুনের বিখ্যাত মিনিট্স -এ বাংলার রায়তকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। ক. খুদকাস্ত রায়ত এবং দুই. পাইকস্ত রায়ত। উইলিয়াম হান্টার খুদকস্ত রায়তকে Highest class of rayats বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৭৬] আঠার শতকের শেষের দিকে ইংরেজ কালেক্টরা বাংলার রায়তদেরকে বৃহৎ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন- ক. সম্পন্ন বা উচ্চ শ্রেণীর রায়ত এবং খ. সাধারণ বা নিু শ্রেণীর রায়ত। সম্পন্ন রায়তরা সাধারণত ছিল গ্রামের মণ্ডল বা প্রধান। এরা বিপুল পরিমাণ ভাগ জমির মালিক ছিল। এছাড়া অনেক করযোগ্য জমি গোপন রেখে এরা নিষ্কর বা লাখেরাজ ভোগ করত। অন্যদিকে সাধারণ রায়তরা সম্পন্ন রায়তদের তুলনায় তারা কোন কোন ক্ষেত্রে বেশী খাজনা দিত।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮৩২ সালের এক মিনিটস -এ বাংলার রায়তদেরকে তাদের ভূ-মধ্যধিকারের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথমত একান্তভাবে চাষাবাদের সাথে জড়িত ভূম্যধিকারী মালিক; দ্বিতীয়ত স্বত্ববিহীন বা উঠবন্দী প্রজা যারা বংশপরম্পরা তথা কালক্রমে ভূমিতে দখলী স্বত্ব অর্জন করে এবং তৃতীয়ত চুক্তিভিত্তিক বা ইজারাদার কৃষক।[৭৭]

১৮৫৯ সালে The Bengal Rent Act জারি করে খুদকস্ত ও পাইকস্ত রায়তদের বিভাজন দূর করা হয়। এ আইনে রায়তদেরকে নতুনভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। নতুন এ শ্রেণীকরণ ছিল নিুরূপ:

a) Raiyars holding land at fixed rates of rent from the time of the Permanent Settlement.
b) Raiyats having a right of occupancy, i. e., raiyats holding land for twelve years.

c) Raiyats not having a right of occupancy, i. e., raiyats holding land for less than twelve years.'[৭৮]

১৮৬৯ সালে জারিকৃত 'The Bengal Act' এর মাধ্যমে রায়তদের নতুন শ্রেণীকরণ করা হলেও এটি মূলত ১৮৫৯ সালের আইনের এক প্রকার প্রতিফলন ছিল। সর্বশেষ ১৮৮৫ সালের 'বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন' পাশের মাধ্যমে পূর্ববর্তী বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রেণী বিভাজনসমূহ বাতিল করে নিম্নলিখিত তিন ধরনের রায়ত সৃষ্টি করা হয়।

a) raiyats holding at fixed rates, which expression means raiyats holding either at a rent fixed in perpetuity or at a rate of rent fixed in perpetuity,
b) Occupancy-raiyats, that is to say, raiyats having a right of occupancy in the land held by them, and
c) Non-occupancy-raiyats, that is to say, raiyats not having such a right of occupancy.[৭৯]

উল্লেখ্য, ১৮৫৯ ও ১৮৬৯ সালের আইনে যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় থেকে স্থায়ীভাবে ভূমি আয়ত্বে রেখেছিল তারা নির্দিষ্ট হারে খাজনা দেওয়ার অধিকারী ছিল। কিন্তু ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়কালীন ভূম্যধিকারী নয় অথচ জমিদারদের কাছ থেকে মোকাররারি ইজারা লাভ করেছিল তাদেরকে রায়তের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটা স্বীকার করতে হবে যে, ১৮৮৫ সালের এ শ্রেণীকরণ যথেষ্ট ছিল না। উক্ত আইনের ৪ (৩) (এ) ধারায় বর্ণিত তিন ধরনের রায়তের বাইরে ২০ ধারায় 'Settled raiyats' নামে আরোও এক ধরনের রায়তের কথা বলা হয়েছিল।[৮০] কিন্তু এ ৪ ধরনের রায়ত-ছাড়া যারা উৎপন্ন দ্রব্যে তথা ফসলে জমির খাজনা দিত তাদের সম্বন্ধে কিছু বলা হয়নি। অথচ প্রকৃতার্থে তারাও ছিল রায়ত বা রায়ত সম-পর্যায়ের।

অতঃপর বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায় ১৯৫০ সালের 'রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন' (১৯৫১ সালের ২৮ নং আইন) প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্ব-প্রচলিত সমস্ত রকমের রায়ত বা কৃষি প্রজাকে একটি শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ বা চিহ্নিত করা হয়। এ আইনের ৮১ (১) ধারা অনুসারে সকল ধরনের কৃষি জমির দখলদারকে 'মালিক' হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। সুতরাং আমাদের আলোচ্য সময়ে ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে স্বীকৃত রায়তের শ্রেণী বিভাগ বিদ্যমান ছিল।

সারণি ৪: কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত উল্লেখযোগ্য তিনটি সামাজিক গোষ্ঠী: ১৯২১ (%)

জেলার নাম	জমিদার	রায়ত	কৃষি শ্রমিক
বর্ধমান	৪.১৯	৬৮.৪২	২৭.৩৯
বীরভূম	২.০০	৬২.৩৮	৩৫.৬২
বাঁকুড়া	৪.১৮	৬৮.৩৯	২৭.৪৩
মেদিনীপুর	২.৩৭	৮০.৪৫	১৭.১৮

হুগলি	৪.৮৭	৬৮.৫৭	২৬.৫৬
হাওড়া	৮.৮৯	৬১.০৬	৩০.০৫
২৪ পরগণা	৪.৩৯	৭৬.১৯	১৯.৪২
নদীয়া	৭.৮৫	৭০.০৫	২২.১০
মুর্শিদাবাদ	৪.১৫	৬৮.৯৯	২৬.৮৬
যশোহর	৬.৯৪	৮৫.৩৪	৭.৭২
খুলনা	৫.৭৩	৮৫.৬৮	৮.৫৯
ঢাকা	৫.০৮	৮৯.২৪	৫.৬৮
ময়মনসিংহ	২.৪৯	৯২.১২	৫.৩৯
ফরিদপুর	৬.৬১	৮৮.৮৪	৪.৫৫
বাকেরগঞ্জ	৪.২৬	৮৭.৭৫	৭.৯৯
চট্টগ্রাম	৯.৫৫	৭২.৫৩	১৭.৯২
কুমিল্লা	১.৯৩	৯৩.৮৭	৪.২০
নোয়াখালি	৩.৩৬	৮২.৫০	১৪.১৪
রাজশাহী	৪.৬০	৮৪.১৮	১১.২২
দিনাজপুর	১.০০	৮৭.২৮	৪.৯৮
রংপুর	১.৩৭	৯১.৬৮	৬.৯৫
বগুড়া	১.৯৯	৮৯.২৪	৮.৭৭
পাবনা	৪.১২	৮৮.২৮	৭.৬০
মালদা	২.১২	৭৫.৯৯	২১.৮৯
দার্জিলিং	১.৬৫	৯৬.২৬	২.০৯

উৎস: *Census Report, 1931, Bengal,* Vol. V, Table 2-5.

ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুর

বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে শেষ উল্লেখযোগ্য সামাজিক গোষ্ঠি হল ভূমিহীন কৃষক বা কৃষি শ্রমিক। এরা কৃষির সঙ্গে যুক্ত জনগোষ্ঠীর ৩০.২৬ শতাংশ, কৃষক সমাজের ২২.৫ শতাংশ। তারা ১৩.১ শতাংশ জমি চাষ করত। ১৯৪১ সনের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলার মোট কৃষি শ্রমিক বা ক্ষেতমজুরের সংখ্যা হল ৬৩,৩৭,২০০। এ বিশাল কৃষকসমাজ ছিল ভূমিহীন। কৃষিকাজে মজুরীর উপর এরা ছিল নির্ভরশীল। ইংরেজ লেখক ঐতিহাসিক গ্রীয়ারসন -এর সূত্রে কৃষিশ্রমিকের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তা হল, "যারা মূলত ও প্রধানত নিজের জমি চাষ করে জীবনধারণ করে তারা কৃষক; আর যারা অন্যের জমি চাষ করে প্রাণধারণ করে তারা কৃষিশ্রমিক"।[৮১]

বাংলার ভূমিহীন শ্রমিক শ্রেণীর প্রাথমিক ইতিহাস জানা যায় না। তাদের সংখ্যা জানার জন্য আদমশুমারি একমাত্র উৎস। ১৮৭২ ও ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে ভূমিহীন শ্রমিককে পৃথক শ্রেণী হিসাবে দেখানো হয়নি; তাদের কৃষক শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত করা হয়।[৮২] ১৮৯১ সাল হতে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ সময় থেকে আদমশুমারি দুই শ্রেণীর শ্রমিককে পরিসংখ্যানের অন্তর্ভূক্ত করে। তারা হলো সাধারণ শ্রমিক (অদক্ষ শ্রমিক) এবং কৃষি শ্রমিক (খামার শ্রমিক ও ক্ষেত মজুর)।[৮৩] এ শ্রেণীকে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক হিসেবে গণ্য করা যায়।

সারণি ৫: ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ও প্রবৃদ্ধির হার

আদমশুমারির সাল	সংখ্যা	প্রবৃদ্ধির হার
১৮৯১	৪১,০৬,৩৯৪	–
১৯০১	৪৩,৫৪.৭৭৯	৬.০৫
১৯১১	৪৫,৪৮,৯৩৩	৪.৪৬
১৯২১	৪৮,৯০,৩৩২	৭.৬৮

উৎস: এম. ওয়াজেদ আলী, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস, ১৭৫৭-১৯৪৭*, (ঢাকা, ২০০০), পৃ. ৩৭।

কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুরেরা প্রায় সারা বছর গ্রামের বিভিন্নশ্রেণীর ভূমিমালিক যেমন ধনীকৃষক, জোতদার প্রভৃতির ক্ষেতে-খামারে কাজ করত এবং এ জন্যে দৈনিক মজুরি বাবদ লাভ করত নগদ অর্থ বা দ্রব্য। চাষের সময় বা ফসল উঠানোর সময় কৃষি শ্রমিকদের চাহিদা ছিল সবচেয়ে বেশী। ঐ সময় তাদের মজুরীর হারও ছিল বেশী। Land Revenue Commission -এর হিসাব অনুযায়ী চাষ ও ফসল তোলার সময় এদের গড় মজুরী হত দৈনিক ৪ আনা ৩ পাই। অন্য সময় শ্রমের চাহিদা কমে যায় এবং সে সাথে মজুরীর হারও কমে যায়। চাষবাস ও ফসল তোলার সময় ছাড়া অন্য সময় কৃষি শ্রমিককরা গড়ে দৈনিক আয় করত ৩ আনা ৩ পাই।[৮৪] অবশ্য বিভিন্ন জেলায় কৃষি শ্রমিকদের মজুরীর হার ছিল ভিন্ন রকমের এবং বছর বছর তা উঠা নামা করত। সরকার আইন করে কৃষি শ্রমিকদের মজুরীর ব্যবস্থা করেননি। চাহিদার তুলনায় শ্রমের সরবরাহ ছিল বেশি। সেজন্য কৃষি শ্রমিকরা শ্রমের বিনিময়ে নূন্যতম মজুরিটুকু সংগ্রহ করতে পারত।

আলোচ্য সময়ে কৃষিসমাজে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল। এ বৃদ্ধির গতি আরও ত্বরান্বিত এবং কুঠির শিল্পশ্রমিকদের আরও অধিক সংখ্যায় নিরন্নের শ্রেণীস্রোতে সন্নিবেশিত করেছিল বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত ছোটবড় আকাল ও দুর্ভিক্ষ, বিশেষত বৃটিশ শাসনের শেষ মন্বন্তর-- ১৯৪৩ সালের মহাদুর্ভিক্ষ।[৮৫] বলাবাহুল্য, যে কোন প্রাকৃতিক দৈব-দুর্বিপাকে ও আকাল-দুর্ভিক্ষের প্রাথমিক শিকার হয় ভূমিহীন ক্ষেতমজুর তথা দিন-আনা খেটে খাওয়া শ্রেণী এবং তখন এদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কোন সীমা-পরিসীমা থাকে না।

বস্তুত বিশ শতকের প্রথম থেকে যে বাংলার কৃষিসমাজে প্রকৃত কৃষকের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে আনুপাতিক হারে ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুরের সংখ্যা অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিচের তিনটি ছক থেকে।

ছক/১		
কৃষকের সংখ্যা হ্রাস		
	১৯৩১	১৯২১
মালিক-কৃষক	৫৩,১৭,৯৭৩	৯০,২০,৪৭২
প্রজা-কৃষক	৮,৭৩,০৯৪	
জুম চাষী	১৩,৩১৮	
মোট	৬২,০৪,৩৮৫	৯০,২০,৪৭২
হ্রাস	২৮,১৬,০৮৭	

ছক/২		
কৃষিমজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি		
	১৯৩১	১৯২১
কৃষিশ্রমিকবা ক্ষেতমজুর	২৮,৭৪,৮০৪	১৭,৮৯,৯৮৪
বৃদ্ধি	১০,৮৪,৮২০	

ছক/৩		
কৃষিকাজ ত্যাগকারী সাধারণ কৃষক ও অন্যান্য বৃত্তিধারী		
	কৃষক	কৃষক ও পোষ্য
কৃষিকাজ ত্যাগ করেছে	২৮,১৬,০৮৭	৯৮,৫৬,৩০৪
কৃষিমজুর হয়েছে	১০,৮৪,৮২০	৩৭,৯৬,৮৭০
অন্যান্য কাজ নিয়েছে	+ ৬,৭১,৪৫৯	+২৩,৫০,১০৬
মোট	১৭,৫৫,২৭৯	৬১,৪৬,৯৭৬

উৎস: Census of India, Bengal, 1921 & 1931 অবলম্বনে, এম আজিজুল হকের *বাংলার কৃষক* থেকে সংগৃহীত, পৃ. ১৪৩-৪৫।

তথ্যসূত্র

১. ড. রঙ্গলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, বাংলা একাডেমী, (ঢাকা, ১৯৯৭), পৃ.৭৮-৭৯।

২. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, ৩য় খণ্ড, মাওলা ব্রাদাস, (ঢাকা, ২০০২), পৃ. ৩১-৩২।

৩. ড. অমলেন্দু দে, *বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, (কলকাতা, ১৯৯১), পৃ. ১৯৪।

৪. *ঐ*, পৃ. ১৯৪।

[৫]. আসহাবুর রহমান, *বাংলাদেশের কৃষিকাঠামো: কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, (ঢাকা, ১৯৮৬), পৃ. ৬৬।

[৬]. ফারসী ভাষায় 'জমিদার' শব্দের মূল অর্থ : সরকার যার উপর জমি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছে।

[৭]. Anil Chandra Banerjee, *The Agrarian System of Bengal, Vol. I. (1582-1793)*, K. P. Bagchi & Company, (Calcutta, 1980), p. 16.

[৮]. ইরফান হাবিব, *মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা*, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য সম্পা., কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোং, (কলকাতা, ১৯৯০), পৃ. ১৪৯।

[৯]. ঐ, পৃ. ১৫১।

[১০]. *Report of the Land Revenue Commission 1940*, p.14.

[১১]. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা*, মাওলা ব্রাদাস, (ঢাকা, ২০০২), পৃ. ৪০।

[১২]. নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ, *বাংলার সামাজিক জীবন*, (কলকাতা, ১৯৬৭), পৃ. ৮৫।

[১৩]. J. C. Jack, *Final Report of the Survey and Settlement operations in the District of Bakarganj District, 1900-1908*, (Calcutta, 1915), p. 185.

[১৪]. F. D. Ascoli, *Final Report of the Survey and Settlement Operation in the District of Dacca, 1910 to 1917*, (Calcutta, 1917), p. 88.

[১৫]. W W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. VII, (London, 1875), pp. 95, 135.

[১৬]. W W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. V, (London, 1875), pp. 214, 333.

[১৭]. R. A. Fricanbarg (Ed.), *Land Comtrol and Social Stracture in Indian History*, (Delhi, 1979), p. 169.

[১৮]. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস, উনবিংশ শতাব্দী*, কে. পি. বাগচী এ্যাণ্ড কোং, (কলকাতা, ১৯৯৫), পৃ. ৪।

[১৯]. Serajul Islam, *Permanent Settlement in Bengal: A Study of its operation, 1790-1819*, Bangla Academy, (Dhaka, 1979), p. 221.

[২০]. মুনতাসির মামুন, *উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গের সমাজ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, (ঢাকা, ১৯৮৬), পৃ. ৯৬।

[২১]. উদ্ধৃতি মুনতাসির মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৯৬।

[২২]. প্রমথ চৌধুরী, *রায়তের কথা*, (কলকাতা, ১৯৪৪), পৃ. ২৫।

[২৩]. দেখুন, Parbati Charan Ray, *The Rent Question*, (Calcutta, 1881).

[২৪]. Tarini Das Bannerji (Compiled), *The Zemindars and the Ryot in Bengal*,(Calcutta, 1883), p. 42.

[২৫]. মুনতাসির মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

[২৬]. নবাব আবদুল গনির দানের তালিকার জন্য দেখুন, মুনতাসির মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৫।

[২৭]. মুনতাসির মামুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০।

[২৮]. R. Palme Dutt, *India Today*, (Bombay, 1940), p. 219.

[২৯]. K N Chandra, *Agrarian Transition in India*, (Calcutta, 1986), p. 109.

[৩০]. সুগত বসু, *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন*, প্রথম ভাগ, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, (কলকাতা, ১৯৯৫), পৃ. ৮।

[৩১]. F W Strong, *Final Report of the Survey and Settlement of the District of Dinajpur, 1934-40*, (Calcutta, 1941), p. 68.

[৩২]. আন্দ্রে বেতেই, *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন*, ১ম ভাগ, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, (কলকাতা, ১৯৯৫), পৃ. ১৬।

[৩৩]. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. I, (London, 1875), p. 273

৩৪. *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন*, ২য় ভাগ, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, (কলকাতা, ১৯৯৫), পৃ. ১৬।

৩৫. *ঐ*, পৃ. ৯৪।

৩৬. L. S. S. O'malley, ed. (1907), *Bengal District Gazetteer : Darjeeling,* Calcutta, 1913. p. 107.

৩৭. A. C. Hartney *Final Report of the Survey and Settlement operation in the District of Rangpur, 1931 to 1938,* (Alipur, 1940), p. 298.

৩৮. Francis Buchanan-Hamilton, *Tenancy Relations and Agrarian development – A Study of West Bengal*, p. 30.

৩৯. A. C. Hartney, *Final Report of the Survey and Settlement of the District of Darjeeling, 1931 to 1938,* (Alipur, 1940), p. 298.

৪০. L. S. S. O'malley, *Final Report of the Survey and Settlement of the District of Darjeeling, 1931 to 1938,* (Calcutta, 1940), p. 156.

৪১. Francis Buchanan-Hamilton, *op. cit,* p. 35.

৪২. L. S. S. O'malley, *Final Report of the Survey and Settlement of the District of Darjeeling, 1931 to 1938,* (Calcutta, 1940), p. 161.

৪৩. Rajat Ray & Ratnalakha Ray, æ*The Dynamism of Continuity in Rural Bengal Under the British Emporium*" The Indian Economic and Social History Review, September, (Calcutta, 1973), p.121.

৪৪. *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন*, ২য় ভাগ, (কলকাতা, ১৯৯৫), পৃ. ৪।

৪৫. F. O. Bell, *Final Report of the Survey and Settlement of the District of Dinajpur, 1934-40*, (Calcutta, 1941), p. 62.

৪৬. রংগলাল সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৭৯.

৪৭. বাসুদেব মাইতি, *বর্গাচাষের ইতিবৃত্ত*, (কলকাতা, ১৯৯২), পৃ. ৪২-৪৪।

৪৮. ইংরেজ আমলে ভূমিতে চাষাবাদের জন্য বর্গা বা উৎপন্ন ফসল ভাগাভাগির চুক্তিতে চাষ, নিজের জমিতে নিজে বা পরিবারের সদস্যদের দিয়ে চাষ এবং কৃষিশ্রমিক বা ক্ষেতমজুর নিয়োগ করে অর্থাৎ ভাড়াটে লোক দিয়ে চাষ এ তিন পদ্ধতি চালু ছিল। দেখুন রংগলাল সেন ও সৈয়দ আলী কবীর -এর প্রবন্ধ, গ্রন্থ *বাংলাদেশে কৃষি প্রশ্ন: তত্ত্ব ও বাস্তবতা*, অধ্যাপক আসহাবুর রহমান সম্পাদিত, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড়, (ঢাকা, ১৯৯৭), পৃ.১১৩ ও ১৭১।

৪৯. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা, ২০০২), পৃ. ৪৩।

৫০. বাসুদেব মাইতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

৫১. পশ্চিমবঙ্গ, বর্ষ ৩০, সংখ্যা ৪২-৪৬, ১৯৯৭ (তেভাগা সংখ্যা, ১৪০৪), পৃ. ১৬।

৫২. Francis Buchanan-Hamilton, *op. cit*, p. 30.

৫৩. F. D. Ascoli, *Final Report of the Survey and Settlement operation in the District of Dacca, 1910 to 1917,*(Calcutta, 1917), p. 152.

৫৪. F. A. Sachse, *Final Report of the Survey and Settlement operation in the District of Mymensingh, 1908 to 1919,* (Calcutta, 1920), p. 126.

৫৫. Sunil Sen, *Agrarian Struggle in Bengal 1946-47,* (New Delhi, 1972), p. 33.

৫৬. বাসুদেব মাইতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।

৫৭. তথ্য সংগৃহীত, কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা, ২০০২), পৃ. ৪৩।

৫৮. Francis Buchanan-Hamilton, *op. cit*, p. 35.

৫৯. A. Cooper, *æSharecroppers & Landlords in Bengal, llll 1930-50: The dependency web & its implications", Journal of Peasant Studies,* Special issue on Sharecropping and Sharecroppers', (London, 1982), p. 239.

[৬০]. মেজবাহ কামাল, *'তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব,'* "বিচিত্রা", ঈদ-উত্তর বিশেষ সংখ্যা, ১১ বর্ষ ১১ সংখ্যা, ঢাকা পৃ. ৩২।

[৬১]. বাসুদেব মাইতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।

[৬২]. *Op. cit,* p. 35.

[৬৩]. *Report of the Land Revenue Commission, Bengal*, Vol. I, p. 68. উদ্ধৃতি কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা, ২০০২), পৃ. ৪৭।

[৬৪]. ঐ।

[৬৫]. B. B. Chaudhuri, æ*The Process of the Depeasntization in Bengal and Bihar, 1885-1947*", The Indian Historical Review, July, 1975, pp. 128-29.

[৬৬]. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস, বিংশ শতাব্দী*, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, (কলকাতা, ১৯৯৫), পৃ. ৪৫।

[৬৭]. *Report of the Land Revenue Commission, Bengal*, Vol. I, p. 68.

[৬৮]. ড. হরেন্দ্র চন্দ্র পাড়ল, *বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (ঢাকা, ১৯৬৭), পৃ. ৩৩২।

[৬৯]. ড. থর্নারকৃত এ শ্রেণীবিন্যাস হল 1. Maliks (a. Big landlords, b. Rich landowners), 2. Kisans (a. small landowners, b. Substantial tenants), 3. Mazdoors (a. Poor tenants, b. sharecroppers and c. Landless labourers), Peasant Movement in India, 1920-1950, p. 14.

[৭০]. D. Thorner's, *The Agrarian Prospect in India*, (Delhi, 1979), p. 4.

[৭১]. Utsa Patnaik, *Peasant Class Differentiation: A Study in Method* with *Reference to Haryana*, Oxdord University Press, (Delhi, 1987), p. 28-29.

[৭২]. W. H. Moreland, *The Agrarian System of Moslem India*, (Delhi, 1968), p. 3.

[৭৩]. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

[৭৪]. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা*, ৩য় খণ্ড, (ঢাকা, ২০০২), পৃ. ৫২।

[৭৫]. Anil Chandra Banerjee, (Ed.), *Bengal Ryots; their Rights and Liabilities,* K. P. Bagchi, (Calcutta, 1977), p. 2.

[৭৬]. W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal*, Vol. II, (London, 1875), p. 265.

[৭৭]. Dr. Lutful Kabir, *The Rights and Liabilities of the Raiyats under The Bengal Tenancy Act, 1885 and the State Acquisition and Tenancy Act, 1950,* Law house Publication, (Dacca, 1972), p. 50.

[৭৮]. *Ibid,* p. 51.

[৭৯]. *The Bengal Tenancy Act, 1885, govt. of East Bengal,* East Bengal Govt. Press, (Dacca, 1954).

[৮০]. কাবেদুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা*, মাওলা ব্রাদাস, (ঢাকা, ১৯৯৯), পৃ. ৯৯।

[৮১]. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, *প্রগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

[৮২]. এম. ওয়াজেদ আলী, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, (ঢাকা, ২০০০), পৃ. ৩৭।

[৮৩]. ঐ।

[৮৪]. *Report of the Land Revenue Commission, Bengal*, Vol. II, p. 117.

[৮৫]. পল আর /গ্রীনো, অনুবাদ শুভেন্দু দাশগুপ্ত ও অন্যান্য, *আধুনিক বাংলা : সমৃদ্ধি ও দারিদ্র : দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩-৪৪)*, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, (কলকাতা, ১৯৯৭), পৃ. ৪৬।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

অনীক মাহমুদের কবিতা: আখ্যানের কথকতা ও চিত্রকল্পের ব্যবহার

মোঃ আবদুল মজিদ*

Abstruct: Poet Anik Mahmud's poems are marked by self-analysis, enriched with sublimity and grace of human race. This paper tries to examine how in the poetry of Anik Mahmud the universal idea of spirit-truth-reality has got a vigorous and vivid expression beckoning and alluring the readers towards absolute truth and beauty.

এক.

বাংলা কাব্যের আঙিনায় সত্তর দশকের সাড়াজাগানো কবি অনীক মাহমুদ (জন্ম:১৯৫৮)। দেশ-কাল ও সময়ের ব্যাপ্তি ডিঙিয়ে অসীম ও অনন্ত বিশ্বের আন্তকার্যকারণ ও ভাবৈশ্বর্যে তিনি ক্রমেই নিজেকে ঋদ্ধ করে চলেছেন। সাহিত্যের অনুবিশ্বে আখ্যান, কথকতা, নিসর্গভাবনা, প্রেম ও বৈরিতা, মানুষ ও মানবিকতা ইত্যকার বিষয় কবি হিসেবে অনীক মাহমুদকে দিয়েছে সুনাম ও সুকীর্তি। কাব্যে ও গল্পে কাহিনীর ব্যাখ্যা ও সমীকরণ কোন এক সুদূর অনির্দেশ্য অতীতে আদিকথক তাঁর ইচ্ছা ও অনিচ্ছাগত বাসনার কথা শ্রোতাদের সম্বোধন করেই হয়তো বা কোন এক সময় প্রকাশ করেছিলেন। 'কথাবয়নের সেই যে শুরু হল, কথার যাদুতে মুগ্ধজনদের আকাঙ্ক্ষাও সেদিন থেকে অবারিত হয়ে উঠল। কী বলছেন কথক, কীভাবে পেশ করছেন বৃত্তান্ত, সময়ের কত মাত্রা ব্যক্ত হচ্ছে তাতে, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার অনুপাত কতখানি, মানুষের জগতে মিশে যাচ্ছে কিনা না-মানুষী ভুবন, এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ ছিল না কারণ কাহিনীর মায়ায় বুঁদ হয়ে মনে হত কথা অমৃতসমান আর কথকতার সূত্রধার ঈশ্বরপ্রতিম।'[১]

আখ্যান বা কাহিনীর সাথে কাব্যে আলঙ্কারিক চিত্রকল্পের এক নিগূঢ় সম্পৃক্ততা পরিলক্ষিত হয়। কেননা চিত্রকল্প হচ্ছে কবিতার হৃদয়স্পন্দন। মানবদেহের রক্তপ্রবাহে হৃদপিণ্ড যেমন বিশেষ অবদান রাখে, তেমনি কবির বিশেষ ভাবকে কবিতায় সম্পৃক্তায়ন ও সঞ্চালন করার কাজে চিত্রকল্প পালন করে অতুলনীয় দায়িত্ব। তাই চিত্রকল্পকে কবির বোধ ও বুদ্ধির ধারালো অনুষঙ্গে কল্পনা ও বিশ্বাসের সমোচ্চারিত অভিব্যক্তি ও ভাবমূর্তি হিসেবে গণ্য করা

---

* ড. মোঃ আবদুল মজিদ, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

১ তপোধীর ভট্টাচার্য, *আখ্যানের স্বরান্তর*, (কলকাতা:দিবারাত্রির কাব্য, ২০০৭), পৃ. ১২।

হয়। চিত্রকল্প প্রসঙ্গে স্টিফেন স্পেন্ডার বলেন: 'The image is the basic unit of poetry... ।'[২] স্টিফেন জে. ব্রাউন চিত্রকল্পকে কবিতার প্রাণ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর ভাষায়: 'This must surely be obvious as regards poetry: imagery is its very life[৩] বস্তুত সময়ের অমোচনীয় হৃদয়স্পন্দন ও কবির আপাত বিশ্বাসরাশি কবিতায় মূলত চিত্রকল্পের মাধ্যমে লাভ করে শৈল্পিক স্থিতি। ফলে কথক অনুষঙ্গ কাব্যে আখ্যান ও কাহিনীর ভেতর দিয়ে চিত্রকল্পের সারসত্য নির্ধারণ করে দেয়। এর কারণ কবির বিশ্বাস ও অনুভূতি ব্যক্তিত্বের প্রগাঢ় ভাবনায় আনন্দ, বেদনা, পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও পঠন সবকিছুই কবিতায় দ্রবীভূত হয়।

কাব্য-কাহিনীর সূত্র বিশ্লেষণে পাওয়া যায়, কাহিনী কেবল গল্পমায়ার অলীক বিস্তার নয়, তাতে প্রচ্ছন্ন থাকে ব্যক্তিত্ব ও যৌথস্মৃতির গ্রন্থনা, অস্তিত্ব প্রকাশের প্রাকরণিক অভিজ্ঞানের উপস্থাপনা। এ হিসেবে কল্পনানির্মিত প্রতিবেদনে সময় ও পরিসরের বহুমাত্রিক সত্য ব্যক্ত হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে গেছে; মানুষের চেতনাবিশ্ব রূপান্তরিত হয়েছে অভূতপূর্ব ভাব ও শৈলীতে। অন্তর্বস্তুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলে গেছে গল্প বলার ধরন। যদিও আমরা বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে কাহিনীর আকরণ ও নির্মিতিবিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। তথাপি, কাঠামো ও প্রকরণ ছাড়া কোন কাহিনী গড়ে ওঠে নি। এই রূপান্তরকে প্রকরণবাদ ও আকরণবাদ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছে। সম্প্রতি কাহিনীর খোলস থেকে মুক্ত হয়ে গেছে আখ্যানের নির্যাস। জন্ম নিয়েছে প্রণালীবদ্ধ আখ্যানতত্ত্ব যার দৃষ্টিতে আখ্যান সর্বত্র উপস্থিত। এ জন্যে আখ্যানতত্ত্ববিদেরা ইদানীং

মানুষের সংজ্ঞাকে একটুখানি পাল্টে দিয়ে বলেছেন 'Home fabulans' বা আখ্যানস্রষ্টা প্রাণী যারা নিজেদের নিয়ে আখ্যান তৈরি করতে পারে। অন্যদের বলতে পারে এবং ভাষ্যও করতে পারে।[৪] সুতরাং কবির সংবেদনশীল শিল্পচর্চার গভীরতর স্তরে লুকিয়ে থাকে অভিজ্ঞতার নির্যাস ও সৃষ্টিশীল অনুপ্রেরণার অভীপ্সা। এই নির্যাস অভিজ্ঞতা ও অভীপ্সা যখন অসাধারণ শব্দ-চিত্রের মাধ্যমে কবিতার বহুমাত্রিক বোধের সঙ্গম ঘটায় তখনই কাব্যে আখ্যানের স্বরান্তর ঘটে এবং চিত্রকল্পের প্রসার বৃদ্ধি পায়।

তাই কাব্যানুষঙ্গের ধারাপাতে স্মৃতির বিপুল ব্যাপ্ত ও গভীর পরিসরে সময়ের অর্জিত অভিজ্ঞতার, মানববিশ্ব-স্থাপত্যের নির্যাস ও ক্রম মুহুর্মুহু রূপান্তরিত হয়ে চলছে। এজন্য কবিতার চিত্রকল্প অভিনবত্ব, প্রণোদনা ও ইন্দ্রীয়জাগরুকগুণে সহৃদয় পাঠকের চিত্রকে সহসা চকিত, আলোড়িত ও অনুপ্রাণিত করে। কাব্য-কাহিনীর ঐশ্বর্যে আখ্যানতত্ত্ব ও চিত্র সচল ও সজীবতার ধারায় অগ্রসর হতে থাকে। কারণ 'কবিতার আধুনিক প্রতিমায়

---

[২] Stephen Spender, *The struggle of the Modern,* (London: University Paperbacks, 1965), P. 120.

[৩] Stephen J. Brown, *The world of Imagery*, (London: Kegan Paul Co.Ltd.. 1927), P. 7

[৪] তপোধীর ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থানিকরূপের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে মিশে যায় সময়ের বোধ, দেশ-কাল সম্পৃক্ত হয়ে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় এক একটি ছবি।'[৫] আর এইসব ছবি আখ্যানতত্ত্বের বিষয় ও চিত্রকল্পে নান্দনিক বাস্তবতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

দুই.

কবি অনীক মাহমুদ ১৯৫৮ সালের ২১ নভেম্বর বাংলা ১৩৬৫ সালের ৫ অগ্রহায়ণ রাজশাহী জেলার বাঘমারা থানার শুভডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের অধীন মচমইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম খন্দকার মজিবর রহমান ও মাতার নাম মানজা বেগম। তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম থেকে জানা যায়, 'অনীক মাহমুদের পিতৃদত্ত নাম খন্দকার ফরহাদ হোসেন। ১৯৭৭ সাল থেকে তিনি (অনীক মাহমুদ) এই লেখক নামে লেখালেখি করে আসছেন। ১৯৯৪ সালে লেখক নাম সংক্রান্ত একটি এফিডেফিট সম্পাদন করেছেন। সহোদর সাত ভাইবোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। দাদা ও পিতার জীবিকায় জমিনির্ভর অর্থনীতিক ব্যবস্থা সংযুক্ত থাকলেও তাঁরা গুরুগিরি পেশায় অভিষিক্ত ছিলেন।'[৬] অনীক মাহমুদের বাল্যশিক্ষা শুরু হয় বাবার কাছে। তারপর নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মচমইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে শৈশবের শিক্ষাজীবন অতিবাহিত হয়। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত মচমইল প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত মচমইল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি ১৯৭৬ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ১৯৭৬ সালে এস.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজশাহী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক বা এইচ.এস.সি. শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই কলেজ থেকে অনীক মাহমুদ ১৯৭৮ সালে দ্বিতীয় বিভাগে এইচ.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৯৭৮ সালে বাণিজ্য গ্রুপ ছেড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৮১ সালে অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে উত্তীর্ণ হন। ১৯৮২ সালে একইভাবে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে তিনি এম.এ. পাস করেন। ১৯৯২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'বাংলা কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান' শিরোনামে অভিসন্দর্ভ রচনা করে তিনি এম.ফিল. ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৪ সালে 'আধুনিক বাংলা কাব্যে সাম্যবাদী চেতনা (১৯২০-১৯৪৭)' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনা করে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৮৫ সালের ১ মার্চ অনীক মাহমুদ 'নিজেরা করি' নামক একটি বেসরকারি সংস্থায় 'কর্মসূচী সংগঠক' পদে যোগদান করেন। এই সংস্থার কর্ণধার ছিলেন খুশি কবির। এ সময় গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে ঘুরে প্রান্তিক মানুষের জীবনধারার সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন। ১৯৮৬ সালের জুলাই ব্যাচের ছাত্র হিসেবে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে এম.ফিল. পর্যায়ে গবেষণারত হন। ১৯৮৮ সালের ১৪ জানুয়ারি উপর্যুক্ত বিভাগে

---

[৫] শঙ্খ ঘোষ, *শব্দ আর সত্য*, (কলকাতা: প্যাপিরাস, ১৯৮২), পৃ. ৪৯।

[৬] গীতিময় রায়, ''অনীক মাহমুদের জীবন, কর্ম ও সাহিত্যলোক: একটি সংক্ষিপ্ত পরিলেখ'' *সুবর্ণসমিধ* শহীদ ইকবাল (সম্পাদিত), (রাজশাহী: রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮), পৃ. ৭৪৪।

'প্রভাষক' পদে চাকুরিতে যোগদান করেন। শুরু হয় অনীক মাহমুদের বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্ম পরিচালনার পরিধি। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি সহকারী অধ্যাপক, ১৯৯৫ সালের ৫ অক্টোবর, সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০০ সালের ৩০ মে, প্রফেসর পদে উন্নীত হন। ২০০৬ সালের ১৬ মে, অনীক মাহমুদ বাংলা বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অধ্যাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসহায়ক কাজের নানা পর্যায়ে অনীক মাহমুদ দায়িত্ব পালন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজের বিভিন্ন দিকে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনীক মাহমুদের জীবনে শৈশবের সাংস্কৃতিক আবহ সাহিত্যচর্চায় কাজ করেছে। অনীক মাহমুদের লেখালেখির হাতে খড়ি স্কুলজীবনে। প্রথম লেখা ছাপা হয় 'দৈনিক বার্তা'য় কিশোর কুড়ির মেলায় ১৯৭৭ সালে। লেখাটির নাম 'ছড়া'। ১৯৭৭ সাল থেকে সাপ্তাহিক ও জাতীয় দৈনিকে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে। সাপ্তাহিক, দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ছাড়াও অসংখ্য লেখা ম্যাগাজিনে তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প প্রকাশিত হয়েছে এবং এ ধারা এখনো অব্যাহত রয়েছে। অনীক মাহমুদ তাঁর সাহিত্য জীবনে বিভিন্ন অবদান রাখায় নানাভাবে সংবর্ধনা, সম্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। নিম্নে সাহিত্য সাধনার জন্য পুরস্কার ও সম্মাননা প্রাপ্তির একটি তালিকা প্রদত্ত হলো:

১. বাংলাদেশ পরিষদ সাহিত্য পুরস্কার
রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায় ১৯৮০ ও ১৯৮২ (কবিতা)।
২. স্পন্দন সংসদ পুরস্কার ১৯৮১।
৩. বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমী পুরস্কার ১৯৮২।
৪. বাংলাদেশ পাবলিক লাইব্রেরী পুরস্কার, রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায় ১৯৮৫
(কবিতা ও প্রবন্ধ)।
৫. জয় বাংলা ঐক্যজোট সম্মাননা রাজশাহী-১৯৯৮।
৬. পুঠিয়া সাহিত্য পরিষদ সম্মাননা-২০০০।
৭. নোঙর সাহিত্য গোষ্ঠী সম্মাননা-২০০৪।

অনীক মাহমুদ একান্তভাবেই নির্ভীক, আত্মপ্রত্যয়ী ও কর্মবিশ্বাসী একজন সাহিত্য-শিল্পী। নিবিষ্টচিত্তে বিচিত্র উপচারে নিরলসভাবে সাহিত্যে সৃজন, প্রকাশন প্রক্রিয়ায় তিনি ব্যাপৃত। তাঁর লেখালেখি নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের পত্র-পত্রিকা সদর্থক অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। সফল এই অধ্যাপক, গবেষক ও লেখকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি দেশ ও জাতির জন্য গর্বের ও অহঙ্কারের।

তিন.

কবিতায় বস্তুর ভাবনিরীক্ষণ ও বিষয়ের বিনির্মাণ অনীক মাহমুদের আত্মবিশ্লেষণের পথকে সুদৃঢ় করেছে। কবিতার জগৎ থেকে মানব বিহারের এক ঐশ্বর্যসাধনা প্রতিনিয়ত তাঁকে আখ্যান ও প্রতি-আখ্যানে শুদ্ধচারিতার দিকে ধাবিত করেছে। অর্জিত হয়েছে জ্ঞানের সাথে দীক্ষা ও যুক্তির মহাসোপান। ক্ষুদ্র পরিসর ভেদ করে প্রতিনিয়ত অগ্রসরমান হচ্ছে বৃহৎ

বিশ্বের অন্তর্লীন মহাজাগতিক সত্যানুসন্ধানে। একজন বড় মাপের কবির যেন এ এক চিরন্তর মহাযাত্রা। এ যাত্রা সুদূর প্রবাহমান ও পরাহত।

কবিতায় আখ্যানের কথকতা ও চিত্রকল্পের ভাবব্যঞ্জনা একটি মহৎ ও পরিশীলিত উপায়ানুসন্ধান যা কবিকে সত্য ও ন্যায়বোধের ভাবনাকে উৎকর্ষ দান করে। 'কথকসত্তার উদ্ভব ও বিকাশ যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে, সেই প্রাক-আধুনিক পরিসর থেকে অনিবার্য ঐতিহাসিক বিবর্তনের সূত্রে কথনবিশ্বের একবাচনিক নিয়ন্তা সর্বেসর্বা হয়ে উঠল লেখকসত্তা।'[৭] এই একই সূত্রের ধারাভাষ্যে বলা যেতে পারে অনীক মাহমুদের লেখকসত্তা প্রতিনিয়তই হাজার বছরের স্বাপ্নিক আরাধনার মহামন্ত্র। কাহিনী বা আখ্যানের তাত্ত্বিকসূত্র বিচারে তিনি হয়তো সোচ্চার হয়েই বলেছেন:

জগতের পেছনে রয়ে গেছে আরেক জগৎ
হা-হতোস্মি ইচ্ছের পেছনে ধাবমান আরেক ইচ্ছে!
কায়ার পেছনে ছায়া কর্মের পেছনে ফল
ফলের পেছনে শাঁস-শাঁসের পেছনে অস্তিত্বের অগ্ররূপ।[৮]

কবির এ বাণী শাশ্বতকালের পুরাণ ও ইতিহাসের দিক নিদের্শনার চিরায়ত ও অর্জিতব্য নির্যাসের অভিধা, যেখানে কাহিনীর তাত্ত্বিক রূপ ও কাঠামোর উপস্থিতি স্বব্যাখ্যানরূপে দণ্ডায়মান।

কাহিনী হচ্ছে এক ধরনের মনসমীক্ষণগত সারাৎসার। এর পেছনে নির্দিষ্ট ও অতুলনীয় নির্মিতব্য অনুভূতির ব্যাখ্যান যার মধ্যে মানুষের জন্ম, মৃত্যু, ইতিহাস-ঐতিহ্য ও রূপ-রূপান্তরের প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশা কাজ করে থাকে। আর এর জন্যই কবি তাঁর মন্ময় ও তন্ময় জগতের রোমান্টিক বাসনাকে কাজে লাগিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় বাহ্যিক ও দিব্যজ্ঞানের বিপুল বিস্ময়। মানুষ সন্ধান পায় খণ্ড হতে অখণ্ডের দিকে পরিক্রমণ ও পরিশীলন হওয়ার। বিশেষ সত্য হতে সর্বজনীন সত্যে পৌঁছার নিরন্তর অন্তহীন অন্তর্বয়নের প্রসঙ্গ। তাই কবি অপার জগতের ব্যক্ত ও অব্যক্তের অনিশ্চয়তাকে কঠিন সত্যে ধারণ করে সময় ও পরিসরে বিষয়ানুগ ভাবনাকে জীবনসংশ্লিষ্ট কাহিনী আর্বতে দিয়েছেন বহুমাত্রিক অভিজ্ঞান। অনীক মাহমুদ তাঁর কাব্যে এ সত্যের সাথী হয়ে আমাদের ধারণা দেন এভাবে:

বীজের জীবনে বৃক্ষসন্ধি অন্তঃস্রোতে পুষ্পের বাখানি
ক্রমশ বদলে যেতে যেতে ক্ষণ মিশে যায়
অথৈ কালের সমুদ্রে,
জলের বিবরে স্ফীত বরফী বিন্যাস
ডিমের কুসুমে স্নিগ্ধ জীবনের নিয়ত সঙ্গম
উন্মত্ত কীটের মাঝে পূর্ণতর প্রাণের কোলাজ।[৯]

---

[৭] তপোধীর ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২।

[৮] অনীক মাহমুদ, ''ইনফিনাইট'', *ভদ্রলোকসংহিতা*, (ঢাকা: সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০১২), পৃ. ২২।

উল্লিখিত কবিতার স্বব্যাখ্যাত অর্থ দাড়াঁয় এরূপ: ভাষা যেমন মানুষের অনন্য বৈশিষ্ট্য, কাহিনী রচনাও তাই। যেদিন থেকে মানুষ এমনকি প্রাণীকূল তার সত্তা ও চিন্তার উপর নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছে, কল্পনা দিয়ে যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের পরিপূরক বা প্রতিস্পর্ধী নব্য বাস্তবরচনা করতে শিখেছে সেদিন থেকে, তার অস্তিত্ব হয়ে উঠেছে দ্যোতনাময়।

চার.

অনীক মাহমুদের কাব্যে কাহিনী বা আখ্যানের বিস্তৃত ও বিশাল স্মৃতিপটের ভাববাহী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আদর্শহীন সমাজে আদর্শ-উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তন্ন-তন্ন করে এর সূক্ষ্মরীতি ও গরিমা খুঁজে বের করতে কবি তৎপর। আর এর জন্য প্রয়োজন চিন্তাস্রোতের স্বয়ংপ্রভ ভূমিকা। সাধরণ কবিতা বা কাব্যে এ প্রক্রিয়া ধারণ করা খুবই শক্ত। কেননা, কবিতার মধ্যে প্রতিনিয়ত যে বিপুল ও গভীর পরিসরে সময়, অর্জিত অভিজ্ঞতা, মানববিশ্ব স্থাপত্যের নির্যাস ও ক্রম মুহুর্মুহু রূপান্তরিত হয়ে পরিবর্তিত আকারে অগ্রসর হয়, তার স্থিতধি নির্ধারণ অনেক সময়ই সম্ভব হয়ে উঠে না। আর এ কারণেই ঔপনিবেশিক ধ্যান-ধারণার ইতিহাস পর্যালোচনা ও যথাপ্রাপ্ত বাধ্যবাধকতায় আখ্যানের যে আদল নির্মিত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়, তার বর্ণাঢ্য বিকল্প প্রতিস্থাপন করা মোটেই সহজ কাজ নয়। তার কারণ, আধুনিক মননবিশ্বে প্রেম, প্রকৃতি, মিথ, ইতিহাসভাবনা, নারীচেতনা ও মানবশরীরির বিচিত্র আঙ্গিক আবেশ ও আকর্ষণের দোলায় দোলায়িত নয়; এর মধ্যে রয়েছে হাজার বছরের উৎকৃষ্ট ভাবনার অভিজ্ঞতাসঞ্জাত আত্মজিজ্ঞাসার এক মহাপ্রকরণ। এদিক থেকে অনীক মাহমুদের কাব্যে ও কবিতায় চেতনা-বাস্তব-সত্য সম্পর্কিত চিরায়তভাবনাগুলোকে আহ্বান-প্রতিআহ্বান রূপে আখ্যানসূত্রে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। যা কাহিনী-উপকাহিনীর নিবিষ্টভাবনা ক্রমেই স্মৃতির আয়ুধে চিহ্নিত। আসলে সময়ের নিরালম্ব ও দহনময় স্বভাবের ছায়ায় অতীতের সৃষ্টিশীল মন কবির মধ্যে লালিত হয়েছিল। তাই কবি তাঁর কথনবিশ্বের অবারিত সত্যে পৌঁছে এভাবে তাঁর কাব্যে নির্মোহসত্য প্রকাশ করেছেন যা কাব্যে কাহিনীর উৎস ও উত্তরণ হিসেবেই কাজ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ:

> সময়ের সাবালক শিশু বেড়ে যায় ক্রমাগত-
> বয়সের পেলিক্যান উড়ে চলে স্বল্পায়ুর ভূর্জবৃক্ষ থেকে,
> বলে দাও খেয়ালী মুনিয়া! তুমিই আমাকে বলো,
> এই ভাবে কতোদিন কতোরাত বেয়ে যেতে হবে
> নিষ্ফল আশার তরী নিরাশার সদ্দুরচিরে?[১০]

---

[৯] অনীক মাহমুদ, ''জিজ্ঞাসা'', *এইসব ভয়াবহ আরতি* (ঢাকা: পরী প্রকাশন, ১৪১১), পৃ. ৩৪।

[১০] অনীক মাহমুদ, "কতদিন কতোরাত", *প্রেমবড় স্বৈরতন্ত্রী* (ঢাকা: আফসার ব্রাদার্স, ১৯৯৫), পৃ. ১৫।

কবি অনীক মাহমুদ জীবনানন্দের ইতিহাস ও সময়চেতনাকে ধারণ করেই হয়তো কিছুটা বর্গগত প্রবণতায় প্রবেশ করেছেন, কিন্তু তার নির্গমবিন্দু হয়তো খুঁজে পান নি। এক্ষেত্রে জীবনানন্দও তাঁর ''উত্তর সামরিকী'' কবিতায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কিছু পঙ্‌ক্তিতে সময়ের এই গোলকধাঁধাকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছেন। যেমন:

আমাদের আধো-চেনা কোনো এক পুরনো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী
আসেনি তো।
এই দুই দিগন্তের থেকে সময়ের
তাড়া খেয়ে পলাতক অনেক পুরুষ-নারী পথে
ফুটপাথে মাঠে জিপে ব্যারাকে হোটেলে অলিগলির উত্তেজে
কমিটি-মিটিঙে ক্লাবে অন্ধকারে অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে
সঞ্চারিত উৎসবের খোঁজে আজও সূর্যের বদলে
দ্বিতীয় সূর্যকে বুঝি শুধু অন্ন, শক্তি, অর্থ, শুধু মানবীর
মাংসের নিকটে এসে ভিক্ষা করে।[১১]

ব্যক্তির হৃদয়ারণ্য থেকে নিষ্ক্রমণের জন্যে মেধা ও বৌদ্ধিকতা যথেষ্ট নয়; বিচ্ছিন্ন এককসত্তা অবভাসের গতি পেরিয়ে যখন সামাজিক পরিসরের বহুবাচনিক উদ্‌যাপনে সম্পৃক্ত হয় মোহনার সংকেত তখনই শুধু স্পষ্ট হতে পারে। মোহনায় পৌঁছানো অবশ্য স্বতন্ত্র কথা; সময়তাড়িত পলাতক মানুষেরা আত্মপ্রতারক চেতনায় মোহিত হয়ে গতির সম্ভাবনাকে নিজেরাই কেবল খণ্ডিত করে। নগরের মতো বুদ্ধিসর্বস্ব অস্তিত্বেরও রয়েছে 'অলিগলি উত্তেজ' এবং মেকি সঙ্গবদ্ধতার ছলে অন্ধকারের প্রসার। 'অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে সঞ্চারিত উৎসবের খোঁজ'ও যে বিপুল অবভাস অনীক মাহমুদের মতো আত্মিক অবসাদক্লিষ্ট ব্যক্তির উপস্থাপনায় কাহিনীর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র ঘনঘটায় তার যথার্থই প্রমাণ পাচ্ছি। কোন জাতির সাংস্কৃতিক বিশ্ববীক্ষা অভিজ্ঞতার অবতল থেকে সৃষ্টি হয় জাতীয় আখ্যানপ্রণালী। বহমান কালস্রোত সেই মৌল আকল্পে নতুন নতুন পলিমাটির স্তর যুক্ত করে, হয়তো বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে রূপান্তর অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর তখনই কথকসত্তা বা কথকতার মধ্যে দেখা যায় বিচিত্র আততি ও দ্বিরালাপের প্রবণতা। উপন্যাস হোক, নাটক হোক অথবা কবিতা হোক পরস্পর ভিন্ন প্রত্যয়, মনোভঙ্গি, ভাবাদর্শসম্পন্ন বা ভাবাদর্শহীন পাঠকগোষ্ঠীর মধ্যে এই কল্পিত গ্রহীতাগোষ্ঠীর অবয়ব কীভাবে ফুটে উঠবে, তা অবশ্য বিতর্কের বিষয়। বিশেষত অনীক মাহমুদের মতো কবিদের ক্ষেত্রে এই সংশয় একটু বেশি

---

[১১] জীবনানন্দ দাশ, ''উত্তর সামরিকী'' *বেলা অবেলা কালবেলা*, রবিশঙ্কর মৈত্রী (সম্পাদিত), জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র, (ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০৩), পৃ. ৩৮০।

পরিমাণে লক্ষ্যযোগ্য। কিন্তু কবিতা সাহিত্যের জটিল ও মায়াবী স্বপ্নের এক অলীক উপাদান নয়, এর মধ্যে রয়েছে বাস্তবতার এক নিগূঢ় জীব-জৈবনিক অপরিহার্যসত্তা। আর এ কারণেই সার্থক আখ্যান হিসেবে কবিতার জগৎকে উন্মোচন করা সম্ভব। অনীক মাহমুদ তার 'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান' নাট্যকাব্যে পরিলক্ষিত ফরমে জাতীয় চেতনার এক নির্যাস গভীর আকরণে ধারণ করতে সমর্থ হয়েছেন। আবার চিন্তার আন্তর্জাতিক অভিঘাতও সূক্ষ্মভাবে নিজের মধ্যে শুষে নিতে পেরেছেন। কাব্যটির কাহিনীবৃত্তে পাওয়া যায়: একটি সুবিন্যাস জাদুঘরে বিশেষভাবে রক্ষিত একটি তরবারি একজন বুজুর্গদর্শক ভালোভাবে নিরীক্ষণ করছেন। তরবারির গায়ে একটি শব্দ 'আলমগীর' খোদাই করে লেখা রয়েছে। আরবি-ফারসি সমন্বিত আলমগীর শব্দটির অর্থ হচ্ছে বিশ্বজয়ী। বুজুর্গদর্শক জানতে পারলেন যে তরবারিটি মোগল সম্রাট সাজাহান তার বড় পুত্র দারাশিকোর বিরুদ্ধে মসনদ নিয়ে উত্তরাধিকার ভাতৃযুদ্ধে বিজয়ী অপর পুত্র আওরঙ্গজীবকে উপহার দিয়েছিলেন। তরবারি শক্তির প্রতীক ক্ষমতার উৎস। কবিতার সংলাপে কবি বলেছেন:

গ্রন্থিক: আমি সেই রক্তপ্লাবী তরবারি, স্বপ্নজ্যোৎস্নার কোষে
বদ্ধ হয়ে শত শত বছরের গ্লানি আর শৌর্যের নীরব সাক্ষী,
এখনও সমাদৃত জাদুঘরে, এখনও দৃষ্ট হই ক্লিষ্ট হই
দর্শকের চক্ষুপাশে বহুভোগ্য পণ্যের মতোন জীবিত জঞ্জাল,
আত্মগ্লানি অপঘাত শোণিতের নিবিড় উদ্ভাস,
স্মৃতিতক্ষকের আনগ্ন দংশনে বিক্ষত সর্বদা;[১২]

সেই ক্ষমতার রঙ্গনাট্যে বারবার রক্তস্নাত হয়ে এই তরবারি উপলব্ধি করেছে মসনদের কাছে পিতৃত্ব-ভাতৃত্ব-মাতৃত্ব অপাংক্তেয়। বারবার রঞ্জিত হয়ে তাকে শুনতে হয়েছে স্বজনহারা প্রিয়জনদের বুকফাটা গগনবিদারী হাহাকার। শত শত বছর ধরে তরবারি উৎসজাত ক্ষমতার আগমন ও উৎসাদন কিভাবে ঘটেছে হাতফেরির কারিশমায় সেটারও সাক্ষী এই তরবারিটি। দর্শকশ্রেষ্ঠ বুজুর্গ কোরাসকে কাছে পেয়ে সে শোনাতে থাকে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। তখন সেটি আর তরবারি থাকে না। সে যেন হয়ে ওঠে মানবিকবোধের আধারে-অভিজ্ঞতা-ইতিহাসের যুক্তিবিচারের অকপট ভাষ্যকার গ্রন্থিক। গ্রন্থিক শোনাতে থাকে তার কথা কোরাসকে। এই ঘটনা ক্রমেই বিচিত্র আখ্যান ও চিত্রকল্পে প্রাঞ্জল করে তুলেছে পুরোকাব্যটিকে। যার মধ্যে কবি তাঁর কথকবিশ্বের ইতিহাস, পুরাণ, দেশ-জাতি ও জাগৃতির মহাসড়ক নির্মাণ করে বিলীন হয়েছেন সভ্যতার আকীর্ণজলে।

অনীক মাহমুদের কাব্যে ও কবিতায় চিত্রকল্পের নির্যাস ও নির্মলরূপ লক্ষ করা যায়। কবি তার উপলব্ধি ও অনুপ্রেরণাকে নির্ভীকচিত্তে সেটি বিভিন্ন অলঙ্কার, উপমা ও রূপকের

---

[১২] অনীক মাহমুদ, ''স্পন্দন'' *'নষ্ট জ্যোৎস্নার ক্যারাভান*, (ঢাকা: পরী প্রকাশন, ২০০৬), পৃ. ৭।

মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্প ও আখ্যানের চিরায়ত রূপ চিত্রাতীত বাস্তবতা ও নান্দনিকতাকে ধারণ করেছে। 'চিত্রশিল্প যেমন শুধু চোখকে তৃপ্ত করে না, উদ্বুদ্ধ করে কল্পনাকেও, জন্ম দেয় তৃতীয় মাত্রার-চিত্রকল্পও তেমনি তৃতীয় মাত্রার জনয়িতা।'[১৩] চিত্রের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এমন একটি তথ্য, যা সহজেই বোঝা যায়, অবগত হওয়া যায়; একই সাথে কাহিনীর সংক্ষেপণসূত্রে প্রতিনিয়ত আবদ্ধ হওয়ার নিরন্তর প্রক্রিয়া এর মধ্যে কাজ করে থাকে। কিন্তু একই ধারার চিত্রকল্পের ভেতরে সংশ্লেষিত থাকে তথ্য, বোধ ও ক্রিয়াশীলতা।

'আত্মিক শক্তিই গুণময় শব্দের অর্থ, চিত্রের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর সংগঠনের সময়চেতনা, স্তবক ভাবানুভূতির ক্রম অগ্রসরমানতা ও উন্মোচন, সেন্সিবিলিটিময় চিন্তার নরম আলো প্রভৃতি বস্তুকে ও বিরোধকে সংশ্লেষণ করে তোলে। এই সংশ্লেষণের ফলেই চিত্রকল্প শুধু ছবি নয়, অনুভূতিময় অর্থ এবং প্রতীকিত অর্থ হয়ে ওঠে। এবং এই সংশ্লেষণ সচেতন বুদ্ধির সাহায্যে কখনোই গড়ে ওঠে না। কান্টের a Priori জ্ঞানের থেকেই যেন রহস্যবোধের অর্থ ও কবিতার প্যাটার্ন এক সঙ্গে চিত্রকল্পের মধ্যে দীপ্ত হয়।'[১৪] আর চিত্রকল্পের এই অবস্থান প্রক্রিয়ার ভেতরেই কাহিনীর সুপ্তবীজ ক্রমেই অগ্রসর হয়ে এর সঠিক মাত্রা দান করে থাকে। নিম্নে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো:

ক. কহিলাম আমি,'তুমি ভূস্বামী, ভূমির অন্ত নাই-
চেয়ে দেখো মোর আছে বড়োজোর মরিবার মতো ঠাঁই।'
শুনি রাজা কহে, 'বাপু, জানো তো হে, করেছি বাগানখানা,
পেলে দুই বিঘে প্রস্থে ও দিঘে সমান হইবে টানা–
ওটা দিতে হবে।'[১৫]

খ. মৃত্যুর ছায়াচ্ছন্ন সেই অন্তহীন বেবাহা ময়দানে
ঘুরিল হাতেমতায়ী; অন্ধকার রাত্রির আসমানে
কক্ষচুৎ উল্কা এক ছুটে চলে যেমন আঁধারে,
পায়না পথের দিশা, কিংবা এক অরণ্য-কিনারে
সামান্য আলোক নিয়ে ঘুরে মরে জোনাকী যেমন
পায়না বনের শেষ সীমান্ত;[১৬]

---

[১৩] বিশ্বজিৎ ঘোষ, *নজরুলমানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (বাংলা: একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৩৪।

[১৪] বার্ণিক রায়, *কবিতা: চিত্রিত ছায়া*, (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৬), পৃ. ৫৪।

[১৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ''দুই বিঘা জমি'' *চিত্রা*, (ঢাকা: সাহিত্যকোষ, ১৯৯৯), পৃ. ১৪২।

গ. ব্যর্থ বোধ দ্ব্যর্থ প্রেম আর নয়, চল গান গেয়ে
তেমাথার ইতিহাস জেনে যাক পরাজিত পশু
সবুজ নিশান নিয়ে বনরাজ আসুক না ধেয়ে
জীবনেরে ভালোবেসে হতে চাই আলোর পিপাসু
এই আলো এই বায়ু চাই আরো তারা ভরা প্রাণ,
মুক্তি দাও বন্ধ্যা পাখি বধির অরণ্যে ধরো তান।[১৭]

ক-নম্বর দৃষ্টান্তে ''দুই বিঘা জমি''র বক্তব্য যেমন চমকপ্রদ, আখ্যান উপস্থাপন কৌশল তেমনি নাটকীয়। অতর্কিতভাবে সেখানে জমিদার বাবুর প্রস্তাবটি 'বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।'[১৮] উপস্থিত হয়ে ছোটগল্পসুলভ খণ্ডিত সূচনার আমেজ বহন করে। সঙ্গে সঙ্গে অনুমিত হয় এ প্রস্তাবে অপর পক্ষের সম্মতির প্রশ্নটি গৌণ, প্রস্তাবকের প্রত্যাশার প্রকৃতিটির অনুধাবনই প্রধান। খ-নম্বর দৃষ্টান্তে আছে emotive power বা বোধ উদ্বোধক দ্যোতনা। চিত্রকল্পের সতেজ ইন্দ্রিয়বেদী সৌন্দর্যানুভূতি। একটি ক্লাসিক কাহিনীর আঁধারে পরাবাস্তববাদ চেতনার আশ্রয় নিয়ে ফররুখ মানুষকে অনুসন্ধান করেছিলেন। কিন্তু ভূমিষ্ঠ এই মানুষের প্রতি ফররুখ আহমদের অগাধ বিশ্বাস থাকলেও, মানুষের সততার প্রতি বাস্তবজীবনের কুশ্রীতার কারণে শেষপর্যন্ত বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। আর এখানেই এসেছে ফররুখের ব্যক্তিজীবনের সীমাবদ্ধতা। গ-নম্বর দৃষ্টান্তে উপর্যুক্ত ভাব ও বিষয়ের সারথী ও সাক্ষী হয়ে অনীক মাহমুদ অন্ধকার নয়, হতাশা নয়, নির্বেদ নয়-তিনি মানুষকে ডাক দিয়েছেন আলো, আশা আর সংলগ্নতার ভুবনে। মানবাত্মা যখন জাগ্রত হবে সদর্থক চেতনায়, সমগ্র দৃষ্টি দিয়ে মানুষ যখন উপলব্ধি করবে জগৎ ও জীবনকে, সে যখন দাঁড়াবে বৃহৎ দেশের প্রেক্ষাপটে, তখনই ঘটবে নিঃসঙ্গতার সংক্রাম থেকে ব্যক্তির উত্তরণ। জীবনবীক্ষণের মেরুকরণের এই ক্রমাগ্রসরমানতা যেমন ব্যক্তি হতে সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্র একই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক উৎস ও উত্তরণের উপায়ও তিনি প্রচ্ছন্ন প্রত্যয়ের মাধ্যমে তাঁর কাব্যের কাহিনী উৎসে সুস্পষ্ট ছায়াপাত ঘটিয়েছেন।

কাজেই আখ্যানের উত্থিতবীজমন্ত্রটি অনীক মাহমুদের কাব্যের পরতে-পরতে ইতিবাচক জীবনবোধের কথাই আমাদের অভিজ্ঞতায় সংবেদনার সঞ্চার করে প্রাতিস্বিকতা দান করেছেন।

---

১৬ ফররুখ আহমদ, *হাতেম তা'য়ী*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬), পৃ. ২১২।

১৭ অনীক মাহমুদ, ''হারানো দিনের গাথা'' *আসন্নবিরহ বিষণ্নবিদায়*, (ঢাকা: পরী প্রকাশন, ১৪১১), পৃ. ২৮।

১৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত।

কোনো কাব্যে কাহিনীর স্বতস্ফূর্ত কল্পনা ও প্রকাশ কবির শক্তি ও সম্পদ। কবি আপাতবিশ্বাসে বস্তুজগৎকে ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু কবির অভিজ্ঞতাকে অনন্যতা দান করে তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনা। এ ক্ষেত্রে কবি তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতিকে অতিক্রম করে অভিজ্ঞতা ও চিন্তাশক্তিকে করে তোলেন সর্বজনীন বাঙ্ময়। কবির চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতা, কল্পনা ও কাহিনীর সাথে চিত্রকল্পের রয়েছে বহুমাত্রিক সম্পর্ক। চিত্রকল্পের ভেতর কল্পনা সংস্থিত আবার কল্পনার মধ্যে তৈরি হয় চিত্রকল্প। অর্থাৎ কাব্যে কাহিনীর উৎপত্তি ও তৎপরতা ক্রমেই কল্পনা ও চিত্রকল্পের ভাবব্যঞ্জনায় রাঙায়িত করে। কবি যখনই কোন প্রেক্ষাপট অনুভূতি বা উপলব্ধিগত প্রক্রিয়ায় ধারণ করেন, তখনই তাঁর মধ্যে ভাবের বস্তুগত তন্ময়তা কাজ করে এবং সেটি ক্রমেই বিষয়গত বিভাস ও আঙ্গিকে প্রাগ্রসর হতে থাকে। শুরু হয় কবি ও কাব্যের পরিলক্ষিত যাত্রাপথ। এ পথ অসীম ও অখণ্ড। এ সময়েরই এক সার্থক কবি অনীক মাহমুদ উপর্যুক্ত সত্যেরই এক বোদ্ধা। তাঁর কাব্যে কাহিনীর উৎস ও উন্নয়নের প্রথিত বিষয় ও বিমূর্তকে বিচিত্র পথে ব্যাখ্যার আলোকে উপস্থাপন করেছেন। ইতিহাস ও সময়ের সান্নিধ্যে দেশমাতৃকার আশীবার্দক এই কবি মিশে গেছেন মা, মাটি ও মানুষ আর সমাজ, দেশ, প্রকৃতি ও পুরাণের সাথে। ইতিহাসের ও মিথের খণ্ড-খণ্ড উপকাহিনীকে অখণ্ডচিত্রে সার্থক প্রতীমায় কাহিনীর ভাববিলাসে কবি আত্মশুদ্ধি দান করেছেন। তাঁর কাব্য-কাহিনীর অপরিসীম যাত্রাপথে যে তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক চিত্র প্রস্ফুটিত হয়েছে, সেটিতে উঠে এসেছে দেশপ্রেমের অত্যুজ্জ্বল মহিমা। তাই মানবিকতার কাছে কবি বড় কাতর, প্রেমের দুর্বার গতিতে কবি উন্মত্ত, পুরাণের পৌনঃপুনিকতায় কবি আস্থাশীল মহামানব, প্রকৃতির নির্ভীক মন্ত্রদানে অনন্য এক সাধক। তাঁর কাব্যের সমাসীন সত্যে পৌঁছাতে হলে এর সূত্রোক্ত ব্যক্তি অভীক্ষা, সময় ও সমাজ, দেশ ও আন্তর্জাতিকবীক্ষণের পরিবর্তিত গতি-প্রকৃতিকে গভীরভাবে অনুধাবন করা দরকার।

অনীক মাহমুদের কবিতায় কাহিনীর ধারাভাষ্যিক বয়ান অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত; কিন্তু কাহিনীর সংবেদনশীল ঐতিহ্য কাব্যের শক্তি ও প্রণোদনা জোগাতে যথেষ্ট সহায়ক। তাঁর কবিতার মধ্যে আছে আনন্দ, বিষাদ, উৎকণ্ঠা বিস্ময়, শোক, অর্থাৎ সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির নানাভাষ্য। শব্দের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে আখ্যানের এক জাদুময় শক্তি। কবি তাকে আপন আবেগ ও অনুরাগে অনুভব ও আতস্থ করেছেন। আর এই কাহিনীর নির্মিতি অনুভব ও বোধকে কবি চিত্রকল্পের মধ্যেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য উল্লেখযোগ্য:

> A few decades ago it was held that images must be visual, and also that images were not literal but produced by figurative language; but today it is agreed that images involve any sensations (including those of heat and pressure as well as those of eye, ear. etc) and that

the literal, sensory objects in the work (the heart as well as singing bird to which it is compared are images.[১৯]

কাহিনীকাব্যের তাত্ত্বিক ভাব ও বিষয় সুপর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কাব্যে কাহিনীর উপস্থাপনা গীতিকবিতার স্বধর্মী বলে মনে হতে পারে। উপরন্ত, গীতিকবিতার মত এক্ষেত্রে "The poet is personally occupied with himself"[20] এর মাধুর্য প্রকাশিত হলেও এখানে তা ঘটে কবির আত্ম-উদ্‌ঘাটন (Subjectives) এর প্রতীক্ষায় নয়, বরং আখ্যান ও চরিত্র বিশ্লেষণের পরোক্ষতায়। এজন্যে কবিকে ক্রিয়াসংকুল বহির্জগৎমুখী হতে গিয়ে তন্ময় (Objective) দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্রয় নিতে হয়। এদিক দিয়ে It (Objective Poetry) deals directly not with thoughts and feelings of the poet, but with outer world of passion and acticn,[২১] অবশ্য ক্লাসিক কাব্যের মত বিশুদ্ধ তন্ময়তাও এ যুগের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় আত্মোদঘাটনকামী মন্ময় (Subjective) কবি স্বভাবে সম্ভব নয়। সেজন্য ``Especially in our extremly composite modern poetry, personal and impersonal elements contunually combine''[২২] প্রকৃতপক্ষে তন্ময় এবং মন্ময় উভয় উপকরণের ব্যাপক ও জটিল মিশ্রজাত আধুনিক এক বিশিষ্ট কবিতাই কাহিনীকাব্যের রূপরীতি ও কাঠামোতে আবদ্ধ ।

এরই তাত্ত্বিক আবহে কবি অনীক মাহমুদের কাব্যের কাহিনীর উৎস, বিকাশ ও পরিণতির সারাৎসারে এর রূপক, উপমা, ও চিত্রকল্পের ভাবব্যঞ্জনায় গড়ে উঠেছে কাব্যভুবনের এক সন্দিগ্ধ লীলাজগৎ। এ প্রসঙ্গে কবির কাব্যের দু'একটি দৃষ্টান্ত:

ক. হে সুখ, হে শিশির সোহাগ,
তুমি আর একবার চেয়ে দ্যাখ ত্রিদিব নয়নে
এই বস্তি এই পরিত্যক্ত শ্যামের সংসার।[২৩]

খ. সত্যবোধে কুরুক্ষেত্র, সত্যবোধে ভীষ্মের প্রস্থান
ন্যায়বোধে কর্ণ-দ্রোণ, দুর্যোধন বিনাশে দ্বৈরথ!

---

[১৯] System Varnet, Morton Berwan, William Burto, *A Dictionary of Literary Terms* (London: Constable, 1964), p. 80.

[২০] Willium Henry Hudson, *An Introduction to the study of Literature*, (London: George G. Harrap & Co.Ltd, (Reprinted), 1955, P. 98.

[২১] Ibid , P. 96.

[২২] Ibid, P. 103.

[২৩] অনীক মাহমুদ, "হেমন্তে প্রতি", *একলব্যের ভবিতব্য*, (ঢাকা: পরী প্রকাশন, ২০০৭), পৃ. ১৮।

পার্থ, এইবার মৌনব্রত ত্যাগে হও বলীয়ান
শান্তির হিস্যায় নাও দৃপ্তকণ্ঠে কঠোর শপথ,
পরীক্ষিৎ বার্তা ঘোষে খুলে দেবে অর্গল বাধার
হে অর্জুন, ছিন্ন করো ছদ্মবেশ কবন্ধ আঁধার।[২৪]

গ. দীপ্ত নূর হোসেন নব্বই-এ ভাগালে স্বৈরাচারের কেতু,
রাহুগ্রাসের ছায়া পটুয়ার বেহায়া ভাঙা বোধের সেতু,
ফেরাউনের শুক্তি
নিপাত গিয়ে মুক্তি
বাঁচলো দেশ-জাতি
বুকে পিঠের উক্তি
পতিত স্বৈরাচার গণতন্ত্র উদ্ধার তার রক্তের হেতু।[২৫]

উপর্যুক্ত তিনটি দৃষ্টান্তে লক্ষণীয়, স্বদেশকে কবি নদী, নারী, পুরাণ, ইত্যাদির সৌন্দর্য, ঔদার্য ও স্বতন্ত্র মহিমার সঙ্গে এক করে দেখেছেন। যেখানে পুরাণ প্রসঙ্গ হাজার বছরের বাঙালিসত্তাকে রূপে-রসে, কাহিনীর আবর্তে এবং চিত্রকল্পে উদ্দিষ্ট ভাব ও ভাবের পোশাক হয়ে কাব্যভাষা নির্মাণে কবি যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। উল্লিখিত কাব্যভাষার মধ্যে রয়েছে বিষয় ও বস্তুগত প্রক্রিয়ার জটিল এক মিশ্রকলার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। সুতরাং কবির মনোরাজ্যে কাহিনীর সদ্যোক্তি ও অভিজ্ঞতার উপস্থিতি প্রতিনিয়তই ক্রিয়াশীল; যা তার তন্ময় ও মন্ময় আখ্যানে বক্তব্যের উপলব্ধিগত অভিজ্ঞতার বলয় ও বয়ানের মধ্যে ধরা পড়ে।

পাঁচ.

কবি মাত্রই কাহিনীর মায়ায় বিচিত্র বিষয় ও ভাবের আত্ম ও তত্ত্বানুসন্ধানী। পরিশীলিত ও পরিকল্পিত ধারণার বশবর্তী হয়ে বাচনিক আগ্রাসনে সমবায়ী সত্তার উপস্থিতি ও চিন্তাসূত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চান। ঠিক এমনটিই ঘটেছে অনীক মাহমুদের জীবন ও কবিকর্মে। জীবনকে তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে এর ভেতরের সত্তাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন এবং করেছেন। তাঁর সাধনার শক্তি এদেশের মানুষ, জীবন ও প্রকৃতি।

---

২৪ অনীক মাহমুদ,''বৃহন্নলা ছিন্ন করো ছদ্মবেশ-১০'' *বৃহন্নলা ছিন্ন করো ছদ্মবেশ* (ঢাকা: পরী প্রকাশন, ২০০৭), পৃ. ১৯।

২৫ অনীক মাহমুদ, *শঙ্খিল সপ্তমিকা ॥১২৫॥*, (ঢাকা: সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০১১), পৃ. ৫০।

নিরলস ধ্যানে তিনি আখ্যানের নির্যাস অনুভূতি নিয়ে বিচিত্র কাব্যগ্রন্থে গড়ে তুলেছেন জীব-জৈবনিক স্মৃতি ও বিস্মৃতির প্রলম্বিত আখ্যানবিশ্ব। আর এই আখ্যানবিশ্বের শৈল্পিক মর্যাদা পেয়েছে আকল্প ছবি, ভাস্কর্য, এমনকি সংগীতের মত শিল্পমাধ্যমে। উপর্যুক্ত বিষয় ও উপকরণের ধারাবাহিকতায় অনীক মাহমুদের কাব্য-কবিতায় এর বিশ্লিষ্ট নিগূঢ় ছায়া প্রকাশমান। তাই সাহিত্যের সংশ্লিষ্ট ধারায় কবিতার আঙিনায় অনীক মাহমুদ বিচিত্র রঙে রাঙায়িত। আমরা আশা রাখি, তাঁর কাব্যের বৌদ্ধিক ও আস্তিত্বিক সত্তা বিভিন্ন সুরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিস্তারের মধ্যে ধ্রুপদী খেয়ালে প্রসারণ ঘটুক।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে দার্শনিক উপাদান : প্রসঙ্গ দ্বৈতবাদ শিক্ষাতত্ত্ব ও বিকল্প আধুনিকতা

এ. এস. এম. আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া*

Abstract. Rokeya is known as an exponent of emancipation of women. She expresses her views in detail in her novels and articles. It is true that her voice and arguments are not adequately well-structured as one expects from philosophical discourse. In this article the author tries to find an answer to the question: Where is the place of philosophy in Rokeya's literature? In order to explain this aspect, the works of Rokeya have been analyesed with reference to philosophical ideas such as dualism, alternative modernity, and Marxisism.

ভূমিকা

রোকেয়া সমধিক পরিচিত সাহিত্যিক হিসেবেই। তাঁর সাহিত্যকর্মে মানবমুক্তি ও সামাজিক প্রগতির যে নির্দেশনা রয়েছে তাতে আমরা লক্ষ করি দার্শনিক উপাদানের উপস্থিতি। তিনি চিন্তাচর্চা করেন নি দর্শনের ধরাবাধা নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে। কিন্তু দর্শনের অমোঘ যে লক্ষ্য মানবমুক্তি, তা থেকে রোকেয়া মোটেই বিচ্যুত ছিলেন না। এ বিবেচনায় রোকেয়ার বক্তব্য যথেষ্ট দার্শনিক গুরুত্বের দাবি রাখে। কিন্তু এই গুরুত্বকে আমরা বোধ ও উপলব্ধির দিক থেকে কতোটা গ্রহণ করতে পেরেছি? এই প্রশ্নটির সদুত্তর খুঁজতে হলে রোকেয়ার চিন্তাকর্মকে ভাবতে হবে সমকালীন করে। এই ভাবনাই রোকেয়াচর্চাকে নতুন আঙ্গিক দিতে পারবে। এরকম আশাবাদের সঙ্গে আমরা আরো একটি বিষয় তলিয়ে দেখতে পারি : রোকেয়ার সাহিত্যকর্মে যে দার্শনিক উপাদান রয়েছে তার মূল লক্ষ্যটি কী? উক্ত প্রশ্নের সঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন জড়িত মানুষ হিসেবে ইতিহাসে নারীর স্থান কোথায়? আমাদের জীবন যাপন, বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসের শর্তসমূহকে বাদ দিয়ে উপর্যুক্ত প্রশ্নসমূহের সদুত্তর অনুসন্ধান করা যাবে না। রোকেয়ার জীবনজিজ্ঞাসার ধারাটিকে বুঝার জন্য, তাঁর চিন্তাধারায় অন্তর্নিহিত দার্শনিক উপাদানের অনুসন্ধান করার প্রয়োজনেই এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হবে এ প্রবন্ধের লক্ষ্য। এ প্রয়াসের অংশ হিসেবে আমরা কয়েকটি বিষয় পর্যালোচনা করব : এক. দার্শনিক দ্বৈতবাদী অনুসন্ধান প্রক্রিয়াটি রোকেয়ার রচনায় কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে? দুই. রোকেয়া কী আধুনিকতাবাদী (modernist) ছিলেন, নাকি তিনি বিকল্প আধুনিকতার (alternative modernity) প্রস্তাব করেছেন?

---

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা

এ দুটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের পূর্বে আমরা দেখব ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ধারাটির সঙ্গে রোকেয়ার দার্শনিক পদ্ধতির মেলবন্দনটি কোথায়।

রোকেয়ার দার্শনিক পদ্ধতির স্বরূপ

ভারতীয় জ্ঞানচর্চা তথা জীবনচর্চার মূল রুপায়নটি হলো সংশ্লেষিত (synthetical)। এখানকার সামাজিক জীবন-যাপনের সঙ্গে সবকিছুই অবিমিশ্রিভাবে রয়েছে। জীবন-যাপনের সঙ্গে জ্ঞানমার্গ, কর্মমার্গ তথা সত্য-অনুসন্ধান একই সমতলে বিরাজমান। একটা থেকে আরেকটা আলাদা করে দেখা যায় না। এখানকার মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাস থেকে জীবনাদর্শকে, সাংস্কৃতিক রুচিবোধ থেকে তাদের ধর্মীয় সংবেদনশীলতাকে, সত্যানুসন্ধান প্রক্রিয়া থেকে ভাবাদর্শকে আলাদা করা যায় না। আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সবকিছু একই সুতোয় গাঁথা। আবার জীবনবিমুখীন ভাবনা, অলসতা, নতুনের প্রতি ভয়, জীবনের প্রতি বীতস্পৃহা এসবও আমাদের জীবন-যাপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ঐতিহাসিকভাবে আমাদের অর্থনৈতিক জীবন হলো অভাব অনটন, কামনা, বাসনা ও অতৃপ্তির বেদনায় আড়ষ্ট। আবার সামাজিক জীবন হলো উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও আনুষ্ঠানিকতায় ভরপুর। জীবনের জন্য উচ্ছ্বাস ও আনন্দ অপরিহার্য হলেও এসবের মধ্যে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি নি শ্রম ও জীবন, উন্নয়ন ও অনুসন্ধানকে। আমাদের জীবন যাপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে থাকা এই উপাদানসমূহ আমাদেরকে উদ্যমী করা অপেক্ষা হতবিহ্বল করে তোলে। যে কারণে দেখা যায় নতুনের প্রতি ভয়, নতুন নতুন তথ্যানুসন্ধানের প্রতি বিমুখীনতা উভয়ই রয়েছে। সবমিলিয়ে জীবন-বিমুখ আমাদের জীবনাদর্শের একটি অংশ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এসবের পেছনে মোটা দাগের যে কারণ খুঁজে পাই তা হলো আমাদের বিশ্বাসে রহস্যবাদের (mysticism) প্রখরতা, মায়াবাদী (mayavada) অভিসিঞ্চন এবং ভাব-ভক্তির প্রতি প্রবল আসক্তি। হতাশা, রহস্যবাদ এবং অদৃষ্টবাদের প্রতি আমাদের মানসিক দুর্বলতার পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক ইতিহাসের চড়াই-উৎরাই।

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস হলো পরাভূত, পরাহত জাতিসত্তার ইতিহাস। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মননের চৌহদ্দি হলো শোষণ-ত্রাসন ও হুংকারের প্রতিচ্ছায়া। এক হাজারের বেশি সময় উপনিবেশিক শক্তির করতলে থেকে আমাদের মন ও মনন, জীবন ও যাপন পিষ্ঠ হয়েছে। এ কারণে আমরা পালিয়ে বেড়াই নিজ থেকে, নিজ ভাবনার গভীরতা থেকে, নিজের ন্যায্য প্রাপ্তি দাবি করার মতো সাহস থেকে। ইতিহাসের এ পাঠটি ব্যতিত রোকেয়ার চিন্তাকে মুল্যায়ন করা দুরুহ কাজ। উল্লেখ্য যে আমরা যে সময়টিতে রোকেয়ার কর্মময় জীবনকে পর্যালোচনা করছি তখন বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি, দেশীয় সামন্ত আধিপত্য এবং হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব সামাজিক জীবনে নতুন পরিপ্রেক্ষিত তৈরি করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় জীবন-ধারায় নতুন ভাবনার প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনের সূত্র ধরে দেশী এবং বিদেশী উভয় ভাবধারাই এখানে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন, তার সহযোগী তত্ত্ব ও মতাদর্শ পাচার হতে থাকে

ভারতে। সেই রকম মতাদর্শের মধ্যে উপযোগবাদ একটি। এই উপযোগবাদ আমাদেরকে যতোটা না স্বজাতিমুখী করেছে, ব্রিটিশের দাসত্ববৃত্তি করার মনোভঙ্গি তৈরি করেছে তার চেয়ে বেশি। রোকেয়ার গোটা সাহিত্যকর্মে পাশ্চাত্যে চিন্তার প্রতি এই লেজুড়বৃত্তিটি নেই।

আর বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রেনেসাঁর দাবিতে যে যুক্তিবাদী সামাজিক প্রগতি নির্মাণের দাবি করা হয়েছে তা যতোটা আধুনিকতার ছাঁচে পরিবৃত্ত তার থেকে ঔপনিবেশিকতার প্রভাবটিই মুখ্য। এর সমান্তরালে ইসলামী প্যান-প্যাসিফিজমের মাদকতা ধর্মীয় সংস্কৃতির সমন্বিত ও সার্বজনীন চরিত্রটিকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছিল। পাশাপাশি হিন্দু-মৌলবাদ আধিপত্যবাদের স্বরূপে উন্মোচিত হবার বিষয়টিও কাজ করেছিল। এই দ্বিমুখী সংকটের আবর্তে ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি কুটিল রূপ লাভ করে। এই মাত্রাটি আরো স্পষ্ট আকার ধারণ করে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। বঙ্গভঙ্গ একটি আপদকালীন নিশানা হলেও এই এলাকার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি, নৃতাত্ত্বিক পরিচিতি এবং ধর্মীয় সংহতিকে বিপর্যস্ত করে তোলার পেছনের শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এসবের সূত্র ধরে হিন্দু-মুসলিম দুটি বিভাজিত বাস্তবতা সৃষ্টি হয়। সেরকম রাজনৈতিক চোরাবালিতে রোকেয়ার শিক্ষা-আন্দোলন, নারীজাগরণ একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। সারা পৃথিবীর নবজাগরণের উত্থানে যারা ভূমিকা রেখেছেন এ দিক থেকে রোকেয়ার প্রচেষ্টাটি একটু ভিন্ন মেজাজের। সুতরাং আধুনিকতার বিকাশে রোকেয়া এক অনন্য তাত্ত্বিক। আধুনিক তাত্ত্বিক ধারার নানামুখী মাত্রিকতায় রোকেয়ার চিন্তা সমৃদ্ধ ছিল।

রহস্যবাদ, মায়াবাদ তথা বৈরাগ্যবাদ প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। ভারতবাসীর বৈরাগ্য সাধনা, কিংবা রহস্যবাদের দিকে অভিগমনটি প্রকাশিত হয় নানা ভাব ও তৎপরতায়। এসবের ভেতর দিয়ে আমাদের মধ্যে যে পলায়ন-মনোবৃত্তি রয়েছে তা অভিব্যক্ত হয় উদাসীনতা, বৈরাগ্যসাধনায়। পরিণতিতে আমরা হয়ে উঠি অলস ও নির্জীব প্রাণীতে। একারণে আমরা 'সময়জ্ঞান' ও 'রুচিজ্ঞান' — এ দু'টির কোনোটিকেই সেভাবে আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয় নি। গড়ে ওঠেনি সবল ব্যক্তিত্ব। আমাদের কথার সঙ্গে নেই কর্মের সঙ্গতি। আমরা যা ভাবি তা করি না, যা প্রতিশ্রুতি দেই তা রাখি না। আমাদের এই বৃহৎ ভূ-জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাষা, ধর্ম ও অনেকক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক অনুশীলনের তারতম্য থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের এই ন্যুব্জ দিকসমূহের মধ্যে মিলই বেশি পাওয়া যায়। রোকেয়া ভারতীয় জীবনধারার এই অভিঘাতটি উপলব্ধি করেছিলেন। এই উপলব্ধির কারণেই তিনি নিরীক্ষণ করেছেন জনগণের মুক্তি ও তাদের ভাগ্যাহত হবার ইতিহাস। এই নিরীক্ষণই তাঁকে বুঝতে সাহায্য করেছে আমাদের জাতীয় স্বভাব-চরিত্রে বিদ্যমান এসব সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা যায় কীভাবে।

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি" এরকম আদর্শের মোহজালে তিনি আচ্ছন্ন ছিলেন না। মুসলিম গোঁড়া সাংস্কৃতিক বলয়ে থেকেও সামাজিক প্রগতির প্রশ্নে পশ্চাৎপদতার সঙ্গে আপস করেন নি। হতাশা, কিংবা অলসতা দ্বারা আড়ষ্ট হন নি। প্রতিনিয়ত কাজ করেছেন, নতুন উদ্যম ও প্রেরণা দ্বারা উজ্জীবিত হয়ে দুরন্ত গতিতে ছুটেছেন। আপাদমস্তক একজন বাঙালি,

প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন দার্শনিক রোকেয়া নির্মাণ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে নিজেকে গড়েছেন, উন্নত জাতি গঠনের মনোবাঞ্ছা নিয়ে কাজ করেছেন। সুতরাং রোকেয়া চর্চা বলতে যদি তাঁর জন্ম আর প্রয়াণ দিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি তাহলে হবে না। বরং তাঁর জীবন দর্শনের স্পিরিটটিকে আমাদের জীবনদর্শনের অংশ করার প্রচেষ্টাই হতে পারে প্রকৃত রোকেয়া চর্চার দাবি। রোকেয়া দার্শনিক চর্চার এ দিকটি বুঝার জন্য আমরা তাঁর দর্শনের স্বরূপটি বুঝে নিতে পারি।

তিনি কোনো রচনায়ই বলেননি তাঁর আলোচনার পদ্ধতিটি কীধরনের বা কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর রচনা শৈলীর বিন্যাস এবং তা বাস্তবায়ন প্রচেষ্টা মধ্যে আমরা বুঝে নিতে পারি তাঁর দার্শনিক পদ্ধতির স্বরূপটি। রোকেয়ার দার্শনিক চর্চার মূল হলো তত্ত্ব ও প্রায়োগিকতাকে অপূর্ব সমীকরণে দাঁড় করানো। তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, ব্যক্তিত্বে ছিল বিচক্ষণতা ও সহনশীলতা। এসব চারিত্রিক দৃঢ়তার সমন্বয়ে রোকেয়া তত্ত্বকে (theory) প্রয়োগে (praxis) নিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা চালাতেন। রোকেয়ার চিন্তা-পদ্ধতির এই ধারাটিকে আমরা তুলনা করতে পারি মার্কসীয় জ্ঞানতত্ত্বের সমন্বয়বাদী ধারার সঙ্গে।[১] মার্কস উপলব্ধি করেছিলেন জগতকে নিয়ে ইতোমধ্যে বহু ব্যাখ্যা হয়েছে এখন প্রয়োজন তাকে পাল্টানো। অন্যভাবে বলা যায় জগত নিয়ে তত্ত্ব নয়, বরং প্রয়োজন জগতকে পাল্টানো। একই ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করি রোকেয়ার চিন্তায়। মার্কসের মতো তিনিও ভেবেছিলেন তত্ত্ব নিয়ে বসে থাকলে পরিবর্তন হবে না, সেই তত্ত্বকে রূপান্তরিত করতে হবে কর্মতৎপরতায়। এই কর্মতৎপরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত হলো তাঁর শিক্ষাভাবনা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে দলিত নারীর ওঠে আসার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য। কিন্তু, প্রতিভূ সমাজ ও ধর্মীয় ভাবাদর্শ হলো নারীর এগিয়ে আসার প্রতিবন্ধকতা। রোকেয়া এই প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে নারীর জন্য শিক্ষা প্রসারে কাজ করেছেন। এটি হলো প্রাক্সিসের দিক। তত্ত্বকে প্রয়োগে পরিণত করার ক্ষেত্রে রোকেয়া যে সফলতা অর্জন করেছেন তা আমাদের সামাজিক জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিই পারে আমাদের মন ও মননে রোকেয়াকে নতুন করে উজ্জীবিত করতে। এই উজ্জীবনকে স্বতঃস্ফূর্ত করার জন্য জাতীয় জীবনে রোকেয়াকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তোলা উচিত। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত থেকে তাঁর প্রাসঙ্গিকতাকে আমরা বিচার করতে পারি।

রোকেয়ার জীবনদর্শন : ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত

রোকেয়ার দর্শন ও চিন্তাকে যথার্থ মূল্যায়নের জন্য আমাদের সাধারণ মামুলি বোধ-বিবেচনা যথেষ্ট নয়। রোকেয়ার কর্ম ও চিন্তাকে মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন জীবন-যাপন থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপে মানবতার প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়, প্রগতিশীল সমাজের প্রতি

---

[১] Marx, Karl, Engles, Frederick, *Selected Works*, (Moscow: Progress Publishers,1975).

প্রতিশ্রুতি। প্রয়োজন শিক্ষা গ্রহণ করা রোকেয়ার জীবনদর্শন[২] থেকে। আমরা যে রোকেয়াকে জানি, তিনি যে জীবনদর্শনের কথা ভেবেছেন তা ইতিহাসের প্রথাগত ধারাপাতের বিরুদ্ধে একধরনের দ্রোহ বলা যায়। তাঁর জীবনদর্শন ও সংগ্রাম যে একাকার তা *সুলতানার স্বপ্ন* থেকেই স্পষ্ট হয় :

"...আমরা অপরের জমি-জমার প্রতি লোভ করিয়া দুই দশ বিঘা ভূমির জন্য রক্তপাত করি না; অথবা একখণ্ড হীরকের জন্যও যুদ্ধ করি না, Í যদ্যপি তাহা কোহেনূর অপেক্ষা শত গুণ শ্রেষ্ঠ হয়; কিম্বা কাহারও ময়ূর-সিংহাসন দর্শনেও হিংসা করি না। আমরা অতল জ্ঞানসাগরে ডুবিয়া রত্ন আহরণ করি। প্রকৃতি মানবের জন্য তাহার অক্ষয় ভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নরাজি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, আমরা তাহাই ভোগ করি।"[৩]

রোকেয়া যে জীবনদর্শনের কথা বলেন তা লোভ ও লালসা মুক্ত। যে জীবনে হিংসা নেই, ভোগবাদী জীবনের যন্ত্রনা নেই, রোকেয়া বিশ্বাসী ছিলেন সে ধারার জীবনদর্শনে। এরকম জীবনদর্শনে অভ্যস্ত হবার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার। এজন্য তিনি সারা জীবনের শ্রম ও চেষ্টা দিয়ে শিক্ষাকে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করেছেন পিছিয়ে পড়া মানুষের কাছে। আবার এই জীবনদর্শনের মধ্যে মানবাধিকার কিংবা প্রাণীর অধিকার সবই উপস্থাপিত হয়েছে। *সুলতানার স্বপ্ন* রূপকল্পে তিনি যখন বলেন, " আমাদের ধর্ম্ম প্রেম ও সত্য। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিতে ধর্ম্মত বাধ্য এবং প্রাণান্তেও সত্য ত্যাগ করিতে পার না।"[৪] এরকম সাহসী অভিব্যক্তিতে আমরা দার্শনিকতারই প্রতিবিম্ব পাই। চল্লিশের দশকে বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবলীলা, মানুষে মানুষে হিংসা ও বিদ্বেষ দেখে দার্শনিক রাসেলও এই প্রেম ও সত্যের কথাই বলেছেন। *An Outline of Philosophy* গ্রন্থে রাসেল বলেন "সেই জীবন ভালো যা প্রেম দিয়ে অনুপ্রাণিত এবং জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত"। প্রেম, মূল্যবোধ ও নীতিবোধ ইত্যাদিসব সামাজিক কল্যাণের সহযোগী শর্ত হিসেবে তিনি শিক্ষার প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। রাসেলও কিন্তু প্রেম ও জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার প্রসঙ্গের কথা বলেছেন। রাসেলের উপযুক্ত চিন্তার সঙ্গে রোকেয়ার ভাবনার দার্শনিক সাদৃশ্য অস্বীকার করার জো নেই।

---

[২] জীবন দর্শন কী? এ নিয়ে দার্শনিক বিতর্ক রয়েছে। তাত্ত্বিক এবং পরিবেশগত উভয় দিক থেকে জীবন দর্শনকে ব্যাখ্যা করা যায়। তাত্ত্বিক দিক থেকে জীবন দর্শন হলো জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি। পরিবেশগত দিক থেকে জীবন দর্শন হলো জীবনের অর্থ কী? কিংবা জীবনের মাত্রা কোন পর্যন্ত বর্ধিত হবে? জীবন অর্থ এখানে প্রাণ। প্রাণের মাত্রা কোন পর্যন্ত বর্ধিত? কিংবা প্রাণ যদি পবিত্র হয় তাহলে তা কী মানুষের পক্ষে ধ্বংস করা উচিত? কিংবা প্রাণের পবিত্রতার প্রতি আমাদেও দৃষ্টিকোণ কীরতম হওয়া উচিত? এ সম্পর্কিত আলোচনা এখানে গুরুত্ব পায়। আবার জীবন দর্শনের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটি হলো একেবাওে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতকি এবং রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রবন্ধে জীবনদর্শন বলতে এ দ্বিতীয় অর্থটি নেওয়া হয়েছে।

[৩] আবদুর রউফ, সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, 'নূর-ইসলাম', *মতিচূর* প্রথম খণ্ড, বিশ্বকোষ পরিষদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, (কলিকাতা: ২০০৬. পৃ.১৫৪)।

[৪] আবদুর রউফ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, *সুলতানার স্বপ্ন*, ২০০৬. পৃ.১৫৪।

রোকেয়ার অনন্য কর্মময় জীবন ও দর্শনে আমরা পুরোনো একটি প্রশ্নের উত্তর পাই : ইতিহাসে কি নারী উপেক্ষিত? নাকি মানুষ উপেক্ষিত? এ প্রশ্নের উত্তর প্রথাগত ইতিহাস চর্চার মধ্যে নেই। মানুষ ও মানুষের উৎপাদন সম্পর্কের সূত্রসমূহ বোঝার মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস বিনির্মিত হয়, কেবল তাঁর পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে এ প্রশ্নের যুৎসই উত্তর পাওয়া সম্ভব। রোকেয়া তাঁর জীবন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বুঝেছেন : ক্ষমতা, আধিপত্য, শোষণ-ত্রাসন নিয়ে মানুষই মানুষকে বঞ্চনা করছে, শাসিয়ে বেড়াচ্ছে। এই শাসন-শোষণের মধ্য দিয়ে যে সভ্যতার সৌধ আমরা নির্মাণ করছি, সেখানে মানুষ নেই, আছে প্রভু ও দাস। আছে দাপট ও দাসত্ব। এই দাপুটে অপসাংস্কৃতিক বোধ-উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আর যা কিছুই সম্ভব হোক না কেন, মানুষের ইতিহাস নির্মাণ সম্ভব নয়। এ কারণে দেখা যায় আমাদের একাডেমিক ইতিহাস চর্চায় যতোটা না সামন্ত-প্রভুদের যুদ্ধ জয়ের কড়চা, উচ্ছ্বাস, তার সিকি ভাগও মানুষের কথা নেই।

সূক্ষ্ম-বিচার বিশ্লেষণে সভ্যতার সৌধে রয়েছে আলো-আঁধারির খেলা, ইতিহাস চর্চার সাধারণ মাত্রা দিয়ে এ খেলা ঠাহর করা যাবে না। যে মানুষের ঘাম, রক্ত ও হাড়ভাঙা-খাটুনি মানুষেরই জীবনকে আয়েসী ও সহজসাধ্য করে তুলে — তার মধ্য দিয়ে সভ্যতা গড়ে ওঠে, আলোয় আলোয় উদ্ভাসিত হয় সভ্যতার অলি-গলি পথ। কিন্তু সেই সভ্যতার কর্ণধারের ভূমিকায় কি ঐ স্থপতিরা যেতে পারে Í যাদের ঘাম ও রক্তের ওপর সভ্যতার সৌধ প্রতিষ্ঠিত? কিংবা তাদের জীবন কি হয়ে ওঠে আয়েসী ও সহজসাধ্য? এ প্রশ্নসমূহের মধ্যে রয়েছে সভ্যতার অন্ধকারের দিক। সভ্য হয়ে ওঠার, কিংবা কোনো একটি জাতিগোষ্ঠীকে সভ্যতার মাপকাঠির নিরিখে মূল্যায়িত করার জন্য কতোগুলো প্যারামিটার থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমনটি আমরা জানি মানব উন্নয়ন ইনডেক্সের ক্ষেত্রে। সেই বিবেচনায় বিগত হাজার হাজার বছরের যে কয়েকটি জাতিগোষ্ঠীর নাম জানি Í গ্রিক, রোমান, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু-হরপ্পা Í তাদেরকে সভ্যতার আওতাভুক্ত করা যায় কি-না তা পুনর্বিবেচনার বিষয়। কারণ প্রাচীন জাতিগোষ্ঠী থেকে বর্তমান পর্যন্ত তারাই উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে যাদের অট্টালিকা, নির্মাণ-কৌশল, যন্ত্র ব্যবহারের পারদর্শিতা রয়েছে। আবার এসবের ভেতরে রয়েছে ভোগবাদী উল্লাস। এই উল্লাস ভোগবাদী চরিত্রটিকেই সামনে নিয়ে আসে।

তাহলে ভোগবাদী জীবন অভিমুখীন যাত্রাই কি সভ্যতা? কিন্তু সভ্যতা নির্মাণে যে মানুষের শ্রম, মেধা ও রক্তের অপচয় হয়েছে তারা কি সেই সভ্যতার সভ্য নয়? বাস্তবে দেখা যায় সেই জাতিসমূহ যারা জবরদখলের কৌশল অর্জন করেছে, অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের নির্মমতাকে বুঝতে পেরেছে তারাই সভ্যতার ধারক-বাহক। বাকিরা অধীনস্থ, পরাভূত — তারা শুধু দিয়েই যাবে, প্রাপ্তির প্রশ্ন অবান্তর। উনিশ শতকের শেষভাগে রোকেয়া প্রাপ্তি এবং অপ্রাপ্তির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি বুঝতে পেরেছেন। মার্কসবাদী বীক্ষার সঙ্গে রোকেয়া পরিচিত ছিলেন কিনা জানি না, তবে উপর্যুক্ত বিবেচনায় উপলব্ধি ও তৎপরতায়

তিনি কার্ল মার্কসেরই সমকক্ষ। মার্কস দার্শনিক পরিপ্রেক্ষিত ধরে বলেছিলেন "ধর্ম অফিম স্বরূপ।" রোকেয়া মনে করতেন, "অশিক্ষাই যতো বিনাশের মূল।" আর বাঙালির অশিক্ষিত থাকার পেছনে কাজ করছে ধর্মেও অপপ্রয়োগ।[৫] রোকেয়া যেভাবে বলেন :

"আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ঐ ধর্ম্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন বিশেষ ধর্ম্মের নিগূঢ় মর্ম্ম বা আধ্যাত্মিক বিষয় আমার আলোচ্য নহে। ধর্মে যে আইন-কানুন বিধিবদ্ধ আছে, আমি কেবল তাহারই আলোচনা করিব, সুতরাং ধার্ম্মিকগণ নিশ্চিত থাকুন। পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিংবা ঈশ্বর-প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এবং অসভ্য বর্ব্বরদিগকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা বৃদ্ধি হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকে (অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর দেখা যায়!!"[৬]

মার্কস যখন বলেন Í "ধর্ম আফিম স্বরূপ", তখন তিনি মূলত ধর্মের বেরাজালে টিকে থাকা নির্জীব ও নিস্প্রাণ মানব সম্প্রদায়ের কথাই বলেন। এই নির্জীব-নিস্প্রাণ মানুষ হয়ে ওঠার কারণ হিসেবে রোকেয়া দায়ী করেছেন অশিক্ষা তথা কুশিক্ষাকে। রোকেয়া তৎপরতা দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অশিক্ষার ফলেই আমরা ধর্মকে ধর্মহীনতায়, মানুষকে প্রাণীতুল্য করে জ্ঞান করি। এ কারণে দেখা যায় মানুষ অপেক্ষা ধর্ম, ধর্ম অপেক্ষা ধর্মহীনতা আমাদের সামাজিক জীবনে দাপটের সঙ্গে জায়গা করে নিয়েছে। তৎকালীন সমাজ-জীবনে অন্তর্নিহিত এই ফাঁকটুকু রোকেয়া বুঝতে পেরেছেন। এই বোধ-জ্ঞানই রোকেয়াকে একজন দার্শনিক এবং সমাজ সংস্কারকের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

মানবতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের জ্ঞান থেকে আমরা একটি বিষয় শিখেছি: মানুষ ও মানবতা লিঙ্গ বা অ-লিঙ্গের তোয়াক্কা করে না। যে মানবিক আর্তি পুরুষের আছে, সেই একি আর্তি কী নারীর নেই? যদি থাকে তাহলে কেন নারী থেকে পুরুষকে আলাদা করে দেখা হয়? সবল থেকে হীনকে ভিন্নসত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়? সেই মানুষকে ভিন্নসত্তা (others)[৭]

---

[৫] আলোচনা জন্য দেখুন ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, ২০১১. "রোকেয়ার চিন্তার বহুমাত্রিকতা ফ্যান্টাস্টিক ইউটোপিয়া, উত্তর-উপনিবেশবাদ এবং আবাসভূমির সন্ধানে", *সমাজ নিরীক্ষণ*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র।

[৬] রোকেয়া, ২০০৬, *সুলতানার স্বপ্ন*, *মতিচুর* (দ্বিতীয় খণ্ড), *রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, সম্পাদনা আবদুর রউফ, বিশ্বকোষ পরিষদ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ।

[৭] *ভিন্ন-সত্তা* (others) শব্দটির একটি সমাজতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে। মার্কসীয় দর্শনে সমাজের শ্রেণিচরিত্র সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় শ্রমিক এবং খেঁটে খাওয়া মানুষকে প্রলেতারিয়েত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। লুকাচ এ শ্রেণিটিকে সাব-অলটার্ণ হিসাবে উল্লেখ করেন। তবে তিনি সাব-অলটার্ণ হিসাবে অন্যান্য অধিকার বঞ্চিত শ্রেণিকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। প্রতিবেশ-নারীবাদী দার্শনিক ক্যারেন.জে ওয়ারেন বলেন, সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী অপেক্ষা সমকালীন বিষম সমাজে প্রকৃতি ও নারীকে যেভাবে মূল্যায়ন করা হয় তাতে করে এরাই হয়ে উঠেছে *অন্য-সত্তা*। ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতিতে প্রত্যয়টি অন্য-মানব (human others) হিসাবে পরিচিত, এখানে অন্তর্ভুক্ত শ্রেণি হল নারী, বর্ণগোষ্ঠী এবং শিশু। আবার *অন্য-পৃথিবী* (earth others) বলতে প্রাণী, উদ্ভিদ, প্রকৃতি এবং ভূমিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে।

হিসাবে কটাক্ষ করার পেছনের কারণটি কী? কারণ হিসাবে ঐ আধিপত্যবাদী চরিত্রটি দায়ী। রোকেয়া বুঝতেন : পুরুষবাদ, আর আধিপত্যবাদ ভিন্ন কোনো প্রপঞ্চ নয়। একই প্রপঞ্চের দুটি প্রকাশ মাত্র। কারণ যে পুরুষ সামাজিক শোষণকে জিইয়ে রাখে, সেই আবার স্বামীর ভূমিকায় নারীকে লাঞ্ছিত করে। 'নারী' প্রত্যয়ের সঙ্গে জড়ো করা হয় আনুষঙ্গিক কতোগুলো শর্তাদি : ধর্ম, বিধিনিষেধ, সংস্কার-কুসংস্কার। লক্ষ্য অভিন্ন — সেটি শোষণ। এ শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি অর্জনের জন্য নারীকে শিক্ষিত হয়ে ওঠতে হবে। শিক্ষা দু'দিক থেকে জরুরি : এক. শিক্ষিত ব্যক্তি, সে নারী বা পুরুষ যে-ই হোক নিজেকে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে ভাবতে পছন্দ করে, ফলে সে পরমুখাপেক্ষি না হয়ে নিজের উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পারে। দুই. আত্মমর্যাদাবোধের দিক থেকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী-বিশিষ্ট এবং স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হয়ে থাকে। সুতরাং মানব উন্নয়নে অংশীদার হবার জন্য এবং নিজের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য শিক্ষিত হয়ে উঠা খুবই প্রয়োজন। রোকেয়া এ দু'টি উপলব্ধিকে সম্মিলিত করতে চেয়েছেন। এই সম্মিলনের প্রয়াস হিসাবে পায়রাবন্দ থেকে সোদপুর, সোদপুর থেকে কলকাতা চষে বেড়িয়েছেন। রোকেয়া এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের অজানা সেই প্রশ্নটি : ইতিহাসে কী মানুষ উপেক্ষিত, নাকি নারী?—এর সদুত্তরের অনুসন্ধান করেছেন। রোকেয়ার আগে কাল মার্কসও প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এই প্রশ্নটির উত্তর অনুসন্ধানের। মার্কস এবং রোকেয়া এ দুজনই মানুষকে মহিমান্বিত করতে চেয়েছেন। রোকেয়ার পরিসর ছিল একেবারে পশ্চাৎপদ ভারতীয় নারী সমাজের একটি অংশ 'মুসলমান নারী'। মার্কসের পরিসর ছিল আরো ব্যাপক বিস্তৃত। কিন্তু লক্ষ্যগত দিকে থেকে দুজনের সঙ্গে সমন্বয়টাই বেশি। সবকিছু মিলিয়ে বলা যায়—মার্কস এবং রোকেয়া দু'জনেরই উত্তর হলো ইতিহাসে মানুষ উপেক্ষিত। 'নারী' এবং 'শ্রমজীবী' মানুষ দুই-ই শেষতক হয়ে উঠে ইতিহাসের দ্বৈত প্রকাশ। 'শোষিত' যেমন একটি প্রত্যয়। সামাজিক সম্পর্কের নানান মাত্রার মধ্য দিয়ে মানুষও 'শোষিত' হয়ে ওঠে, তেমনি ইতিহাসের নানান অভিঘাতের মধ্য দিয়ে আধিপত্য এবং মালিকানার পালাবদলের মধ্য দিয়ে মানুষের কোনো একটি অংশ 'নারী' হয়ে ওঠে। এই 'হয়ে ওঠা'র মধ্য দিয়ে ইতিহাস পক্ষাবলম্বন করে আধিপত্যবাদিদের। ইতিহাসের এই গড্ডালিকা প্রবাহ রুখে দেয়া যায় শিক্ষা এবং কর্মতৎপরতার সাহয্যে । রোকেয়া এই রুখে দেবার কাজটি করেছেন। রুখে দেবার মাধ্যম হিসেবে তিনি নারী ও পুরুষের মধ্যে জিইয়ে থাকা দ্বৈতবাদী মতাদর্শের বিরোধীতা করেছেন। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ বিষয়টি আলোকপাত করা হবে।

নারী-পুরুষ দ্বৈতবাদ ও রোকেয়া

রোকেয়ার দার্শনিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মননশীলতা অন্যান্য দার্শনিক অপতৎপরতার বিরুদ্ধে জবাবও বলা যায়। বিভিন্ন রচনা ও কর্ম-তৎপরতায় তিনি নারী ও পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন একই সমতলে। আমাদের বিদ্যায়তনিক দর্শন চর্চায় যে দ্বৈতবাদী তত্ত্বের আধিপত্য লক্ষ করা যায় রোকেয়ার এই প্রয়াসকে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা যায়।

দ্বৈতবাদের মূল দাবি হলো: সকল বস্তু ও ধারণারই একই সঙ্গে দুটি বিপরীতধর্মী সত্তা রয়েছে। দ্বৈতবাদী দর্শনের মুলকথা হলো দুটি "বিপরীত সত্তা উচ্চক্রমান্বয়িক সূত্রে আবদ্ধ" এই নীতিকে মেনে চলা।[৮] এ কারণে দ্বৈতবাদে ভেদাভেদ, উচুঁক্রমিক মাত্রিকতা এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রান্তিকীকরণের প্রবণতাটিই কাজ করে। দার্শনিকভাবে এই প্রবণতাটি অনেক প্রাচীন। প্লেটোর বিশুদ্ধ দর্শনে আমরা লক্ষ করি এই দ্বৈতবাদী দার্শনিক নির্মাণ। যেমন, প্লেটোর কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ (empirical world) হলো ভ্রান্ত ও অধ্যাস (illusory)। আর ধারণার জগৎ (world of idea) হলো বাস্তব জগৎ (real world)। তিনি যখন বাস্তব জগৎ এবং ভ্রান্ত জগৎ Í এ দু'ইয়ের মধ্যে পার্থক্য দাঁড় করান সেখানে আমরা পাই দুই বিপরীত বাস্তবতার অবস্থিতি। আবার দেহ ও আত্মা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি 'দেহকে' বিবেচনা করেছেন *ভৌত* হিসাবে যা তাঁর বিবেচনায় নিম্নমানের এবং 'আত্মা'কে বলেছেন *মানসিক এবং বৌদ্ধিক* হিসাবে যা উঁচুস্তরের। এভাবেই প্লেটো আমাদেরকে দুটি আলাদা সত্তার চেতনা নির্মাণ করেছেন। দুটি সত্তাকে আলাদা স্বীকার করে নেবার কারণেই এদের মধ্যে একটি ভেদ রাখতে হয় Í ভেদের একটি হলো অপেক্ষাকৃত উঁচু, অন্যটি নিচু। অন্যভাবে বলা যায়, একটি উৎকৃষ্ট, অন্যটি নিকৃষ্ট। এই দ্বৈততার সূত্র ধরেই প্লেটো নারীকে ক্রীতদাসের সঙ্গে তুলনা করেছেন।[৯] প্লেটো থেকে উদ্বৃত করা যাক : "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে মুক্ত পুরুষ করেছেন, স্ত্রীলোক বা ক্রীতদাস করেন নি।' *আবার রিপাবলিক* পঞ্চম গ্রন্থে তিনি বলেন, 'স্ত্রীলোকের মনের মতোই নিচু"।[১০] তিনি মেনো গ্রন্থে বলেছেন, 'নারীরা শুধু গৃহকর্ত্রী হবে', *ক্রেটিলাস-এ* বলেছেন, 'নারীরা বুদ্ধির দিক থেকে হীন'। *টাইমিয়াস-এর* বক্তব্যটি আরো বেশি দ্বৈতবাদী বৈশিষ্ট্যে ভারাক্রান্ত। এখানে তিনি বলেন, "মানব চরিত্রের দুটি ভাগের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচ্চতর ভাগটি হলো পুরুষ চরিত্র"। একই গ্রন্থের আরেকটি উদ্ধৃতি লক্ষ করা যাক : "দুষ্ট ও ভীত পুরুষ পরজন্মে নারী হয়ে জন্মায়" এসব উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে নারীকে প্লেটো অধস্তন ও হীন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নারীকে হনি করে দেখার বিষয়টি তাঁর দ্বৈতবাদী শিক্ষা থেকেই অনুসৃত।

অ্যারিস্টটলের দর্শনে আরো যৌক্তিক ও পরিণত রূপ লাভ করে দ্বৈতবাদ। চিন্তার মূলসূত্র হিসেবে তিনি যখন 'নির্মাধ্যম নিয়ম' (law of excluded middle), 'অভিন্নতার নিয়ম' (law of identity), এবং 'স্ববিরোধিতার নিয়ম' (law of contradiction)

---

[৮] দু'টি সত্তাকে স্বীকার করে একটি থেকে অন্যটি আলাদা, পৃথক ও স্বতন্ত্র হিসেবে বিবেচনা করার বিষয়টিই দর্শনের ইতিহাসে দ্বৈতবাদ হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। দ্বৈতবাদের পরিণত দার্শনিক ভিত্তিটি লক্ষ করা যায় আধুনিককালের রেনে ডেকার্তের দর্শনে।

[৯] এই সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দেখুন হাসনা বেগম : 'প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে নারী', নৈতিকতা সমাজ ও নারী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯০। নারী বিষয়ক প্লেটোর এই উদ্ধৃতিসমূহ অধ্যাপক হাসনা বেগমের উল্লিখিত প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত।

[১০] Plato, *Republic*, Book V.

এর কথা বলেন, তখন তাঁর দর্শনের দ্বৈতবাদী চরিত্রটি আরো স্পষ্ট হয়ে যায়। তাঁর চিন্তার মূলসূত্রসমূহের সারকথাই হলো একই সঙ্গে দুটি ভিন্ন সত্তা এক ও অভিন্ন হতে পারে না। এর অর্থ হলো দুটি ভিন্নসত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া। এরিস্টটলের এই "যৌক্তিক দ্বৈতবাদ" কীভাবে নারীবাদী ইস্যু? এ প্রসঙ্গে উত্তর-আধুনিক নারীবাদীরা বলেন Í এরিস্টটলের চিন্তার মূলসূত্রসমূহ চিন্তার ক্ষেত্রে দুই বিপরীতের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে। চিন্তার ক্ষেত্রে দুই বিপরীতের অস্তিত্ব আমাদের প্রায়োগিক জীবনেও দ্বৈততার অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে অভ্যস্ত করে। এই অভ্যস্ত হবার বিষয়টিই শেখায় নারী এবং পুরুষ হলো দু'টি ভিন্ন সত্তা। আধিপত্যের ধারায় নারী হলো নিচু, পুরুষ হলো উঁচু। আবার প্রকৃতিসাপেক্ষে প্রকৃতি হলো নিচু, মানুষ হলো উঁচু। এই উঁচু-নিচুর বাস্তবতায় উচ্চতর সত্তাটি নিম্নতর সত্তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে এটাই স্বাভাবিক।

দ্বৈতবাদের চূড়ান্ত স্বরূপটি লক্ষ করা যায়, 'কাঠামোবাদী ভাষা ও নৃতত্ত্ব' এবং ডেকার্তের দ্বৈতবাদে। কাঠামোবাদীরা 'দ্বৈত-বৈপরীত্য' এবং আধুনিকতাবাদী ডেকার্ত 'দেহ ও মন'-এ বিপরীতের প্রভাবকে স্বীকার করে নেন। উভয় দার্শনিকের প্রয়াসে স্বীকৃত দ্বৈততাই সামাজিক পর্যায়ে অসম বিন্যাসকে উৎসাহিত করছে। সামাজিক পর্যায়ে এই দ্বৈততা আমরা লক্ষ করি প্রভুর সঙ্গে দাসের, মালিকের সঙ্গে উৎপাদনকারীর, বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে শ্রমজীবীর, কৃষ্ণাঙ্গের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গের, নিম্নবর্গের সঙ্গে উচ্চবর্গের। জ্ঞানচর্চার নামে এভাবেই আমাদের সভ্যসমাজে লক্ষ করা যায় দ্বৈততার অনুশীলন।

রোকেয়া উপলব্ধি করতে পেরেছেন দ্বৈতবাদের শোষণবাদী চরিত্রটি। এই উপলব্ধির দার্শনিক অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায় তাঁর নিম্নোক্ত উক্তিতে:

"যে শকটের এক চক্র বড় (পতি) এবং এক চক্র ছোট (পত্নী) হয়, সে শকট অধিক দূরে অগ্রসর হইতে পারে না; সে কেবল একই স্থানে (গৃহকোণেই) ঘুরিতে থাকিবে। তাই ভারতবাসী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না।"[১১]

নারী-পুরুষের মধ্যে গড়ে ওঠা দীর্ঘদিনের এই দ্বৈত-চরিত্রটি রোকেয়া ভেঙে দিতে চেয়েছেন বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ম-তৎপরতার সাহায্যে। তিনি যেমন বিশ্বাস করেন কোনো শকটকে চলমান থাকার জন্য এর দুটি চাকাকেই সমান হবার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি রাষ্ট্র নামক শকটটিকেও চলমান রাখতে হলে পুরুষ চক্রটিকে সুযোগ সুবিধায় উর্ধ্বে রেখে নারী-চক্রকে বঞ্চিত করা যাবে না। গোটা মানবসমাজের অর্ধেককে বঞ্চিত করে বাস্তভিত্তিক কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। যথার্থ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উভয়েরই অংশগ্রহণ। কিন্তু নারী যদি শিক্ষা বঞ্চিত হয়, তাকে যদি পর্দা ও অবরোধে আবদ্ধ রাখা হয় তাহলে সে কীভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে? রোকেয়া তাই সামাজিক জীবনে জিইয়ে থাকা দ্বৈতবাদের এই অসম চরিত্রটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি মনে করেছেন নারীর মধ্যে থাকা বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাকে জাগিয়ে তোলার জন্যই তাঁদেরকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে

---

[১১] আবদুর রউফ, সম্পাদিত, *রোকেয়া রচনাসংগ্রহ*, 'নূর-ইসলাম', ২০০৬, পৃ. ৩১-৩২।

তোলা প্রয়োজন। শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত যোগ্যতাই তাকে স্বাধীনতা দিতে সক্ষম। এই উপলব্ধি এভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে 'বোরকা' প্রবন্ধে :

"শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদুরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন। এখন দূরদর্শি ভ্রাতাগণ বুঝিতে পারিয়েছেন যে ইহাতে তাঁহাদের ক্ষতি ও অবনতি হইতেছে। তাই তাঁহারা জাগিয়া উঠিতে ও উঠাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন। আমি ইতঃপূর্ব্বেও বলিয়াছি যে "নর ও নারী উভয় মিলিয়া একই বস্তু হয়। তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।" এযনও তাহাই বলি। এবং আবশ্যক হইলে ঐ কথা শতবার বলিব।"[১২]

রোকেয়া বলছেন "নর ও নারী উভয় মিলিয়া একই বস্তু হয়" এই উদ্বৃতিতে আমরা দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধেই অবস্থান লক্ষ করি। আবার তিনি যখন বলেন "তাই একটিকে ছাড়িয়া অপরটি সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না।" তখন উন্নয়ন ধারণারও একটি সম্যক পরিচিতি পাই। নারী ও পুরুষ উভয়ের সম্মিলনে সম্ভব হয়ে ওঠতে পারে পরিপূর্ণ উন্নয়ন। জাতিকে উন্নয়নের ধারায় ফেরানোর জন্যই প্রয়োজন স্বাধীনতা, আর শিক্ষাই পারে নারীর এই স্বাধীনতা বাস্তবায়ন করতে। বাঙালি নারীর শিক্ষিত করে তোলার এই প্রচেষ্টাকে আমরা ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করতে পারি।

নারী শিক্ষার ইতিহাস এবং রোকেয়া

ইতিহাসে মানুষ উপেক্ষিত। "অবলা, দুর্বল, মাতৃময়ী, স্নেহময়ী, রমণী" Í এরকম বিশেষণের ভারে ভারাক্রান্ত করে মানুষেরই একটি অংশকে পরিণত করা হয়েছে নারীতে। ইতিহাসে এ হলো মানুষের পদস্খলন। রোকেয়া মুসলমান বাঙালি নারীর নিস্পেষণের কথা বলেছেন ইতিহাসের এই দীর্ঘ ধারাপাতে। মুসলিম সামাজিক সাংস্কৃতিক কাঠামোর সীমানায় থেকে রোকেয়া উপলব্ধি করেছেন 'নারী'র উপেক্ষিত হবার প্রক্রিয়া। অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, বোধ-নির্বোধ ও কূপমণ্ডুকতার অবরোধে মুসলমান নারী সামিল হয়েছে অধোগতিতে। উপলব্ধির উৎকর্ষ দিয়ে রোকেয়া 'নারীর' বিরুদ্ধে ইতিহাসের এই পক্ষপাতদুষ্টতাকে অবমুক্ত করতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তাত্ত্বিকতা অপেক্ষা তৎপরতাকে। নিজে যা লিখেছেন তা তৎপরতা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। বিশেষ করে বাঙ্গালি মুসলিম নারীর কাছে শিক্ষার পশরা নিয়ে যাওয়ায়ই ছিল তাঁর এই তৎপরতার অংশ। এখানেই রোকেয়া অনন্য।

মুসলিম বোধ ও সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে ওঠা রোকেয়া প্রথাগত মুসলিম-নারীর মতো ছিলেন না। জীবনাচরণ, লেখনী সবকিছুর মধ্য দিয়ে তিনি অশিক্ষা-কুশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এ সংগ্রামে তিনি দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন :

---

[১২] আবদুর রউফ, ও অন্যান্য, ২০০৬, "বোরকা", পৃ. ৪৯।

এক. ধর্মের দোহাই দিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা সামাজিক মান-মর্যাদা থেকে নারীকে বঞ্চিত করার বিরোধিতা করেছেন। তিনি বুঝেছেন কাউকে যদি বোধ-বুদ্ধি দিয়ে খাঁটো করতে হয় — তাহলে তাকে কু-শিক্ষার বেরাজালে রাখতে হবে। আর বোধ-বুদ্ধিহীন নারীকে ব্যবহার করা যায় ইচ্ছামতো। নারী এই ইচ্ছেমতো ব্যবহারের সামগ্রী হয়ে ওঠেছে, ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। নারীর ভোগ্যপণ্য হয়ে উঠবার শর্তসমূহের বিরুদ্ধে তাই রোকেয়া বিরোধে জড়িয়েছেন। দ্বন্দ্বে গিয়েছেন। সবকিছুরই লক্ষ্য হলো নতুন বিকাশের দিকে অভিযাত্রা।

দুই. দ্বিতীয় শর্তটি ইতিবাচক। নারীর প্রতিকূলে প্রতিষ্ঠিত শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে তার বড় দরকার আত্মসচেতন হয়ে ওঠা, এই আত্মসচেতন হয়ে উঠার মধ্য দিয়েই নারী তার হৃত অধিকার ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হতে পারে। এই সক্ষমতার মধ্য দিয়ে নারী সামাজিক উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ পাবে।

ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে এক সময় নারী মানুষ-পদবাচ্য হিসাবে গণ্য হতো না। এর বড় কারণ ধর্মীয়-কুসংস্কার। ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে এই সংস্কার এতো দাপুটে ছিল যে সেখানে মুক্ত-চিন্তা ও যুক্তিবোধ মোটেই শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে দাঁড়াতে পারে নি। এই যুক্তিহীনতার ভেতর দিয়ে ধর্ম জায়গা দখল করে নিয়েছে অধর্মের। এই অধর্মই নারীর শত্রু। রোকেয়ার আগে রামমোহন রায়ও লক্ষ করেছেন যুক্তিহীনতার ভেতর দিয়ে কীভাবে ধর্মীয় কুসংস্কার আধিপত্যের জায়গা দখল করে নিয়েছে। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন আমাদের সংস্কৃতিতে নারী সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হলো: "নারী একারণে উপকারী যে সে শুধু রান্না-বান্না, যৌন-সঙ্গি এবং বিশ্বস্ত গৃহকর্ত্রী।"[১৩]

নারী সম্পর্কে আমাদের এই হীনমন্যতার কথা রামমোহন বলেছেন ১৮০৯ সালে। আর রামমোহন এই ধারণা পেয়েছেন জিরোমি বেন্থাম এবং রবার্ট ওয়েনের সান্নিধ্যে গিয়ে। এর মাঝে তিনি পাঠ করেছেন ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি নিয়ে লিখিত জেমস মিলের *History of India* গ্রন্থটি।[১৪] নানান মাত্রিক পঠন-পাঠন এবং পাশ্চাত্য নারীবাদী অভীক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি বুঝেছেন ভারতীয় হিন্দু সমাজ-সংস্কৃতিতে নারী কতোটা অবহেলিত। তাঁর ভাবনার সংস্পর্শে এসেছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা। রাধাকান্ত দেবের মতো গোঁড়া হিন্দুরাও তখন উপলব্ধি করেছেন নারীদেরও শিক্ষিত করে তোলা উচিত। এ ধারার সমান্তরালে এইচ.ভি.এল ডিরোজিও'র 'ইয়ং বেঙ্গল' সমাজের যুক্তিবাদী আন্দোলন নারী-শিক্ষার দাবিকে আরো জোরালো করে তোলে। এ দাবির

---

[১৩] আর বসু এবং এ.সি.বেদান্তবাগীশ, ১৮৭৩-৭৪, *রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী*, সম্পাদনায়, কলকাতা, আদি ব্রাহ্ম সমাজ, পৃ. ৯৯-১০০।

[১৪] Ghulam Murshid, *Reluctant Debutante: Response of Bengali Woman to Modernization, 1849-1905*, Sahitya Samsad, (Rajshahi University: Rajshahi, 1983). p. 23.

উন্মোচিত হয় বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দালনে। তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকার সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত তখন প্রচার করেন, "নারী কোনো দিক থেকে হেয়-নিম্ন নয়, নারী অনেক দিক থেকেই শ্রদ্ধেয়।"[১৫]

১৮৫০ থেকে ১৮৬০ সালের দিকে মদনমোহন, প্যারিচাঁদ মিত্র, পিয়ারী চরণ সরকার এবং দ্বারকানাথ প্রমুখ তাঁদের বিভিন্ন রচনায় যে সভ্যজাতি গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তাতে নির্দেশনা ছিল নারীর অবস্থান পাকাপোক্ত করা। কারণ সামাজিক সংস্কারের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য শর্ত, আর শিক্ষা প্রক্রিয়া থেকে কাউকে বাদ দিয়ে সেই সংস্কার পরিপূর্ণতা লাভ করে না। ১৮২৩ সালে *সমাচার দর্পণ* পত্রিকার সূত্রে জানা যায় : ইংরেজ রবার্ট ম্যান এর উদ্যোগে ১৮১৮ সালে বঙ্গের চার্চ মিশনারি সমাজের উদ্যেগে নারী-শিক্ষা গুরুত্ব পেতে থাকে। মিস মেরি এন কুক ১৮২৩-১৮২৮ সালের দিকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠা করেন আটটি বালিকা বিদ্যালয়। আর এসব বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মিস কুককে সাহায্য করেছেন একজন অজ্ঞাত মুসলিম বিদূষী নারী।[১৬]

জে.ই.ডি. বেথুন নারী-শিক্ষার ইতিহাসে আরেক বিদ্যুৎপ্রভা। কলকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করেছিলেন বেথুন। এ প্রসঙ্গে গোলাম মুরশিদ[১৭] বলছেন, হরদেব চট্টোপাধ্যায় যিনি প্রচলিত কুসংস্কারকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে তাঁর কন্যাদের বেথুন স্কুলে পাঠিয়েছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সামাজিক এসব সংস্কারকে কোনো প্রকার তোয়াক্কা না করে একই বিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁর কন্যা সৌদামিনিকে। ১৮৪৯ সালে ঈশ্বরগুপ্ত 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় আক্ষেপ করে বেথুনের এই প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এই ব্যঙ্গ নারী-শিক্ষায় বিরোধীদের উৎসাহী করেছিল। তারপরও এ যাত্রা এগিয়ে যায়। বেথুনের প্রচেষ্টা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হিন্দু জমিদার রামকৃষ্ণ কলকাতার সন্নিকটে প্রতিষ্ঠা করেন আরেকটি বিদ্যালয়। কিশোরীচন্দ্র মিত্র ঐ সময়েই রাজশাহীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বেথুনের প্রচেষ্টা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। ১৮৫৭-৫৮ সালে তিনি মোট আটটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দুই ধরনের অভিঘাত এরকম প্রচেষ্টার মূলে কাজ করেছিল : একদিকে রয়েছে পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার প্রেরণা, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের মেলে ধরার অভিপ্সাও। ধর্মীয় অনুভূতির শৃঙ্খল ভেঙে হিন্দু নারীরা যখন অগ্রযাত্রায় শরিক হচ্ছে মুসলিম সমাজ তখনও "বিবি-তালাকের ফতোয়া" নিয়ে মগ্ন। আর নারী-শিক্ষা সে তো আরো দূর-দ্বীপবাসিনী। সেই সময়ের মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমেদ, কিংবা আবদুল লতিফ কেউ নারী শিক্ষার প্রশ্নে এগিয়ে আসেন নি। কিন্তু

---

[১৫] Ghulam Murshid, 1983 : 24. দেখুন *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, পৌষ, ১৮৪৪, পৃ. ১৩৪।

[১৬] দেখুন আমিন, সোনিয়া নিশাত, ২০০২. *বাঙালি মুসলিম নারীর আধুনিকায়ন* (১৮৭৬-১৯৩৯), বাংলা একাডেমী, নভেম্বর : ১১২।

[১৭] Ghulam Murshid, 1983.p. 23.

কুমিল্লার নবাব ফয়জুন্নেছা সাহসী ভূমিকা রাখেন। ফয়জুন্নেছাও মনে করেছেন Í শিক্ষা ব্যতীত আধুনিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং আধুনিক সমাজের ধারণা পূর্ণাঙ্গ হবে না যদি না অবহেলা করা হয় নারী শিক্ষাকে । এ দুই প্রতিশ্রুতির সম্মিলনে ফয়জুন্নেছা এগিয়ে এসেছিলেন শিক্ষা সংস্কারে। তাঁর এই প্রণোদনা উদ্বেলিত করেছিল বাঙালি নারীকে। ফয়জুন্নেছার এই প্রচেষ্টার পরিপূর্ণতা লক্ষ করি রোকেয়ার জীবন ও সংগ্রামে। এ বিবেচনায় ফয়জুন্নেছার চিন্তা ও কর্মের যোগ্য উত্তরাধিকার রোকেয়া।

মুসলিম সামাজিক জীবনের বন্ধ্যাত্ব নিয়ে যে নারী চার দেয়ালে অবরুদ্ধ সেই নারীর মুখে মুক্তির গান পৌঁছে দিয়েছিলেন রোকেয়া। বাধা-বিপত্তি, হিংসা-প্রতিহিংসা এবং ধর্মীয় কুসংস্কারে ক্ষত-বিক্ষত রোকেয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন অদম্য উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে। কোথাওবা নিগৃহীত হয়েছেন, আবার কোথাওবা হুমকি নিয়ে ঘুরেছেন শতবিধি-নিষেধের। এতোসবকিছুর পরও রোকেয়া সারা পৃথিবীর অগ্রযাত্রার স্রোতে নারী-সমাজকে সামিল করার কাজে প্রেরণা যুগিয়েছেন। এখানেও রোকেয়া একজন কর্মীর ভূমিকায়, আদর্শবাদী সংস্কারকের ভূমিকায়। এই ভূমিকাকে আরো কার্যকর করার প্রত্যাশায় তিনি লিখেছেন নারীর দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা নিয়ে। মুসলমান সমাজের অচলায়তনে বাঁধা নারীর দুর্দশার প্রতি তিনি সহমর্মি ছিলেন। পুরুষ শাসিত সমাজে অবরুদ্ধ নারীর যন্ত্রণা দেখে তিনি কাতর হয়েছেন। এই কাতরতা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বিভিন্ন রচনায়। এখানে রোকেয়া একজন তাত্ত্বিকের ভূমিকায়। বলা যায় এভাবেই মার্কসীয় *প্রাক্সিস* এবং তত্ত্ব রোকেয়ার জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে রোকেয়া একজন প্রাগম্যাটিস্টও বটে। সুতরাং বাঙালি মুসলমান নারীর শিক্ষাবিস্তারে রোকেয়ার এই ভূমিকাকে মূল্যায়ন করা যায় বহুমাত্রিক দিক থেকে। রোকেয়ার চিন্তার এই মূল্যায়নে আমরা বিকল্প আধুনিকতার ভাবধারাটি পর্যালোচনা করতে পারি।

রোকেয়ার চিন্তায় বিকল্প আধুনিকতা

রোকেয়ার চিন্তায় *বিকল্প-আধুনিকতা* (alternative modernism) এক ভিন্নমাত্রা লাভ করেছে। বিষয়টি বিশদভাবে দেখা যেতে পারে। দিলীপ পরমেশ্বর গাওকার[১৮] ক্ষমতাহীন, প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীর রুখে দাঁড়াবার দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের প্রস্তাব করেন যা *বিকল্প আধুনিকতা* (alternative modernism) নামে পরিচিত। পশ্চিমা বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্যবাদ অনুসারে মনে করা হয় 'আধুনিকতা' হলো :

> "stability, coherence, discipline" and æa discontinuous experience of time, space and culture as transitory, fleeting and fortituous."[১৯]

---

[১৮] Dilip P Gaonkar, *Alternative Modernity*, Durham, NC : Duke UP.

[১৯] Rita Felski, 1995. *The Gender of Modernity*, Massachusetts: Harvard UP 2001.:11.

পাশ্চাত্যে আধুনিকতাবাদ হলো æabsolutist, unitary conception of truth.'[২০]। পাশ্চাত্য মনে করে আধুনিকতা এসেছে রেনেসাঁস ও আলোকপ্রাপ্তির হাত ধরে। এই দুই'ই পাশ্চাত্যকে দিয়েছে যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান ও শিল্প-কৌশল। বিজ্ঞানের ওপর ভর করে পাশ্চাত্য সক্ষম হয়েছে প্রকৃতিকে করায়ত্ত আনতে। এই সক্ষমতার হাত ধরে পাশ্চাত্যে সংঘটিত হয়েছে শিল্প-বিপ্লব। পশ্চিম এভাবেই অর্জন করেছে প্রকৃতির ওপর অবাধ আধিপত্য বিস্তার করার মানসিকতা। আধুনিকতার নাম নিয়ে পাশ্চাত্য, এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহকে উপনিবেশের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে। এভাবে আধুনিকতা পাশ্চাত্যকে দিয়েছে অগাধ সম্পদ ও ক্ষমতা। আর প্রাচ্য তথা আফ্রিকা হয়ে ওঠেছে অধিকৃত উপনিবেশ। আর এভাবে আধুনিকতা হয়ে ওঠেছে "disorder, despair and anarchy."[২১] *বিকল্প আধুনিকতা* হলো এশিয়া এবং আফ্রিকার নিষ্পেষিত মানুষের মানবিক-যুক্তিবাদ, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে রুখে দাঁড়ানোর তত্ত্ব। এ তত্ত্ব আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে, যুক্তিহীনদের পক্ষে এক সাহসী উচ্চারণ। অধিকারহীন জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদেও ওপর তাদের স্ব-স্ব অধিকার পুনরুদ্ধারের এক পাল্টা-ডিসকোর্স হলো বিকল্প আধুনিকতা।

রোকেয়ার শিক্ষা-আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন এসব কিছুর মধ্যে এ দু'টি ভাবনাই জোরালোভাবে ছিল। এরকম উপলব্ধি থেকে বলা যায় রোকেয়ার চিন্তায় *বিকল্প আধুনিকতার* (alternative modernism) উৎস ছিল।[২২] তিনি উল্লেখ করেন Í রোকেয়ার বিকল্প আধুনিকতাবাদের এই চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে *সুলতানার স্বপ্ন* উপন্যাসে। সুলতানা যে স্বপ্ন দেখে তা আধুনিকতার স্বপ্ন, সে স্বপ্ন নিজেদের আবরোধবাসিনী অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন। *সুলতানার স্বপ্ন* উপন্যাসে রোকেয়া আশাবাদী মানুষের মতো একজন নারীর জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন। সেই স্বপ্নের অন্তর্নিহিত রূপায়ন পাই রোকেয়ার ভাষায়:

> অচিরেই গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে অসংখ্য বালিকাস্কুল স্থাপিত হইল। এমনকি পল্লীগ্রামেও উচ্চশিক্ষার অমিয়-স্রোত প্রবাহিত হইল। শিক্ষার বিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতে লাগিল, এবং বাল্যবিবাহ-প্রথাও রহিত হইল। একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে কোন কন্যার বিবাহ হইতে পারিবে না৷ এই আইন হইল।[২৩]

---

[২০] Rita Felski, 1995.

[২১] Rita Felski, 1995, pp. 11-12.

[২২] Sonita Sarker, "Larger Than Bengal: Feminism in Rokeya Sakhawat Hossains Sultana's Dream and Global Modernities", *Archiv orientalni*, Oriental Institute, Academy of Sciences, 2000, Vol.68.

[২৩] আবদুর রউফ, ও অন্যান্য, রোকেয়া রচনাসংগ্রহ, *সুলতানার স্বপ্ন*, ২০০৬, পৃ. ১৪৫।

সামগ্রিক বিবেচনার বাইরেও রোকেয়া যখন পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর পক্ষে কলম ধরেন, তাদের জন্য কথা বলেন তখন তাঁর এই কর্ম-তৎপরতা সাব-অলটার্ণ পাঠ-গবেষণার বিষয়টিকেই সামনে নিয়ে আসে। সাব-অল্টার্ণ কারা ? মার্কসীয় ধারণায় 'প্রলেতারিয়েত', নাকি 'অন্যপক্ষ/সত্তা' (আদার্স), কিংবা নিম্নবর্গ অথবা আত্যাচারিত জনগোষ্ঠী? সাব-অলটার্ণ সম্পর্কিত পাঠ-অধ্যায়নে 'সাব-অলটার্ণ' সম্পর্কে মোটদাগের কথা হলো : "subaltern cannot speak"। একই বক্তব্য বিস্তৃত পরিসরে এসেছে গায়ত্রী চক্রবর্ত্তী স্পিভাকের প্রবন্ধ "Can the Subaltern Speak?" [২৪] অবহেলিত প্রান্তিক মানুষ যারা সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বঞ্চিত — তারা তাদের অধিকার নিয়ে, স্বাধীনতা নিয়ে কিংবা লাঞ্চনা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। ক্ষমতার ভিন্ন প্রকাশের মধ্যে তাদের ভাষা, কথা অন্য অর্থে অধিকার হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়া প্রবঞ্চিত এই জনগোষ্ঠীই 'সাব-অলটার্ণ'। সাব-অলটার্ণ পাঠে আমরা হারিয়ে যাওয়া মানুষের রুখে দাঁড়ানো, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ঝলসে উঠার কথকতা পাই। পাই অবহেলিত প্রান্তিক মানুষের এগিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি। একশ বছর পূর্বে রোকেয়া কাজ করেছিলেন সেই প্রতিশ্রুতি নিয়েই । শিক্ষা থেকে, সামাজিক অধিকার থেকে, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার থেকে নারীকে বঞ্চিত করে তাকেও নিম্নবর্গেই অর্ন্তভুক্ত করা হচ্ছে। আর নিম্নবর্গের মানুষকে বর্গে নিয়ে আসার আন্দোলনকে জোরালো করার তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক কাজটি করেছিলেন রোকেয়া।

যেভাবেই বলি না কেন রোকেয়ার সাহিত্যে বিদ্যমান বিকল্প আধুনিকতা তথা সাব-অলটার্ণ পাঠ গবেষণা মূলত প্রান্তিক মানুষকে কেন্দ্রে নিয়ে আসার স্বপ্ন আছে। এই কেন্দ্রে নিয়ে আসার তাত্ত্বিকতায় আমরা আরো দু'টি বৈশিষ্ট্য চূড়ান্ত আকারে পাই : একটি হলো ক্ষমতার বিন্যাসকে ব্যাপক-বিস্তৃত করা, অন্যটি হলো কাউন্টার-হেজেমনির (প্রতি-আধিপত্য) অনুশীলন।[২৫] তিনি যখন নারীকেও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অংশীদার হতে বলেন তখন মূলত ক্ষমতার বিন্যাসকে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছাতে চান। আবার নারীকে শিক্ষিত করে তোলার কারণ হলো তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধি সৃষ্টি করা যার ওপর ভিত্তি করে সে বুঝতে পারবে সমাজে বিরাজমান হেজেমনিকে। এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে একজন নারী সক্ষম হবে প্রতি-আধিপত্য সৃষ্টি করতে। এরকম বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন বিকল্প আধুনিকতাবাদের।

---

[24] Gayatri Spivak, æCan the Subaltern Speak?" *Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader*. Eds. Williams, Patrick and Laura Chrisman. New York: Harvester Wheatsheaf, 1993.: 66- 111.

[২৫] Antonio Gramsci, *Selections from the Prison Books*, Lawrence and Wishart. 1982.

গ্রামসি হেজেমনি ধারণা দ্বারা বুঝাচ্ছেন এমন এক সামাজিক শ্রেণিকে যারা অন্য শ্রেণির উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এরকম আধিপত্যবাদী শ্রেণির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলাই প্রতি-হেজেমনি।

বিষয়টি বুঝা যাক শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইউরোপ যে উন্নয়ন ও শিল্পের স্বত্বাধিকারী হয়েছিল তাতে অ-শিল্পসমৃদ্ধ দেশের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মালিকানা স্বত্বের কাছে অ-শিল্পসমৃদ্ধ দেশসমূহ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে, ক্ষমতার বলয়ে অধিকৃত হতে থাকে ক্ষমতাহীনরা। সতের, আঠার এবং উনিশ শতকের বাস্তবতায় ভারতবর্ষ তথা আফ্রিকার দেশসমূহ যেভাবে এই অধিকৃতির আওতায় আসে। এই অধিগ্রহণকেই আমরা উপনিবেশ বলছি। সমকালীন বাস্তবতায় এই অধিগ্রহণ পরিচালিত হচ্ছে 'বিশ্বায়নের' নামে। এই বিশ্বায়ন কখনো পুঁজিসঞ্চিকরণের (capitalistic accumulation) নামে, আবার কখনোবা কর্পোরেট সংস্কৃতি নির্মাণের মধ্য দিয়ে 'হিডেন কলোনি' বিস্তার করে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে, বিকল্প আধুনিকতাবাদের লক্ষ্য হলো অনুন্নত রাষ্টসমূহের উন্নত রাষ্টসমূহের মতো বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কলাকৌশলের দিক থেকে উন্নত হওয়া। ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতাবানদের পর্যায়ে উপনীত হওয়া। এর এভাবেই ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করাও বিকল্প আধুনিকতার একটি অনন্য লক্ষ্য। রোকেয়া *সুলতানার স্বপ্ন* রচনায় সেই স্বপ্ন বুনেছেন তাতে এই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার কথা ছিল। ভারসাম্যের মধ্য দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বের অবসানও তিনি করতে চেয়েছেন। তিনি উন্নয়নকে একটি দ্বি-চক্রযান শকটের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শকটের একটি চক্র যেমন ছোট হলো গোটা শকটটি চলতে পারে না, তেমনি কোনো জাতিসত্তার উন্নয়নের জন্য তার একটি বড় অংশ নারীকে অনুন্নত রেখে খুব বেশি দূরে আগানো যায় না। অনুন্নত দেশসমূহ যেমন শিল্প ও প্রযুক্তিতে উন্নত হবার মধ্য দিয়ে উন্নত-বিশ্বের অনুকম্পা গ্রহণ করতে হবে না, একইভাবে নারীও শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়ে পুরুষের অনুকম্পা প্রত্যাশা করতে হবে না। *সুলতানার স্বপ্ন* ও অন্যান্য রচনার বক্তব্যের ভেতর দিয়ে বিকল্প আধুনিকতাবাদের এই প্রবাহটিকেই রোকেয়া প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন অনেক আগে।

উপসংহার

রোকেয়া সাহিত্যিক হিসেবেই পরিচিত। প্রাতিষ্ঠানিক দর্শন কিংবা দার্শনিক তত্ত্ব নির্মাণ করেন নি তিনি। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন রচনায় চিন্তার যে প্রতিফলন পাই তার অনুধ্যানিক মূল্য দার্শনিক জ্ঞান-বিবেচনার বাইরে নয়। উপর্যুক্ত আলোচনায় সেই বিষয়টিই আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর দর্শনকে সুনির্দিষ্ট কোনো মতবাদে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না তা ঠিক, কিন্তু গত কয়েক শতকের মধ্যে যে দার্শনিকচিন্তাসমূহ সমাজ, মানুষের মন ও মননকে পরিবর্তনে ভূমি রেখেছে রোকেয়ার চিন্তা তা থেকে বিচ্যুত নয়। তাঁর দার্শনিক মননে যেসব প্রশ্নের সদুত্তরের চেষ্টা ছিলো তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো Í নারী কীভাবে স্বাধীনতা অর্জন করবে? এ প্রশ্নটির যুক্তিযুক্ত উত্তর আমরা লক্ষ করি তাঁর ভাবনায়। তিনি মনে করেছেন নারীর কাজের পরিধিকে আরো বহুমাত্রিক করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনেই তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলা উচিত। স্বাধীনতা, অধিকার ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রসমূহে অনুপ্রবেশের যোগ্য করে তোলা উচিত। পারিশ্রমিকহীন গৃহাস্থলি কাজের

পাশাপাশি ঘরের বাইরেও তাদেরকে কাজ করতে পারার উপযোগী করে তোলা প্রয়োজন। এতে করে নারী অর্জন করবে বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা তাকে যেমন অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করবে, তেমনি বোধ-বিবেচনা তথা সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাকে করে তুলবে স্বাধীন ও ব্যক্তিত্ববান। নারীকে বুঝতে হবে শোষণ-নিপীড়নের সামাজিক চরিত্র আছে। মানুষ মানুষকে শোষণ করে অর্থনৈতিক নীতি-নিয়মের মধ্য দিয়ে। তাই নারীকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলনেও ভূমিকা রাখতে হবে। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সম্ভব বাস্তবসম্মত স্বাধীনতা অর্জন করা।

নারীর ওপর আরোপিত দমন-পীড়নকে কীভাবে সীমিত করা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ করাই ছিল রোকেয়ার দার্শনিক অনুধ্যান ও নারীবাদের লক্ষ্য। সচেতনতা বৃদ্ধি পায় সেরকম কর্মকাণ্ড এবং বৃহত্তর পরিসরে শিক্ষা-বিস্তারে ভূমিকা রাখা হলো সামাজিক পরিবর্তনের প্রাথমিক পদক্ষেপ। সচেতনতা এবং শিক্ষাবিস্তার ব্যতীত নারীর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়। রোকেয়া এই বোধ উপলব্ধিকে প্রায়োগিক রূপ দিতে গিয়ে যেসব যুক্তিকে উপস্থাপন করেছেন তা বিভিন্ন ধারার দার্শনিক উপাদানের সংমিলন বৈ কিছু নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে বিশ্ব-সমাজ ব্যবস্থা যখন নতুন নতুন তত্ত্ব ও মতাদর্শের অভিঘাতে চঞ্চল হয়ে ওঠেছিল। রোকেয়ার সমসাময়িক বাংলা তখনও ঔপনিবেশিক শক্তি ও ধর্মীয় গোঁড়ামির যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। আবার সামন্ত-পরিবারে জন্ম নেবার ফলে উপর্যুক্ত দু'টি বাস্তবতারই মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি প্রত্যক্ষভাবে। ধর্মীয় যুক্তিহীনতা এবং সামন্তবাদী শোষণ-নিপীড়নের নিগড়ে আবদ্ধ এ নারীর চৌহদ্দিতে নেই আলোর ছিটেফোঁটা। রোকেয়া সেই আলোকবর্তিকা নিয়ে ঘুরেছিলেন ঘরে ঘরে। ঐতিহাসিক পটপরিক্রমায় এখানেই রোকেয়া উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক জীবন, সামাজিক জীবন, বৈষয়িক জীবন — এসবের মধ্য দিয়ে মুসলমান নারীদের নিমজ্জন, দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছেন রোকেয়া। রোকেয়া কাজ করেছেন এই দুর্দশাগ্রস্থ প্রান্তিক মানুষের অবস্থিতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা জন্য। এরই অংশ হিসেবে তিনি বিকল্প সমাজ নির্মাণের কথা ভেবেছন। এই বিকল্প সমাজে পুরুষ সহযোগী হবে নারীর। তাঁরা আধিপত্যের জায়গায় না থেকে, নারীকে অশিক্ষা-কুশিক্ষায় অবরোধবাসিনী না রেখে মানব উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এরকম স্বপ্ন বুননের মধ্য দিয়ে রোকেয়া বিকল্প আধুনিকতারই প্রস্তাব করেছেন বলা যায়।[২৬]

---

[২৬] আরো দেখুন ভূঁইয়া, আনোয়ারুল্লাহ, ২০০৮, সম্পাদনা, "ভূমিকার পরিবর্তে", *রোকেয়া : যুক্তিবাদ নবজাগরণ ও শিক্ষা-সমাজতত্ত্ব*, রোদেলা প্রকাশনী, বাংলাবাজার। একই লেখকের সম্পাদনায় "ভূমিকার পরিবর্তে", *রোকেয়া : চিন্তার উত্তরাধিকার*, রোদেলা প্রকাশনী, বাংলাবাজার।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

বেগম রোকেয়া : জাতীয় জীবনের দুঃসময়ের একান্ত সঙ্গী

আবেদা আফরোজা*

Abstract: Begum Rokeya is a pioneer of the movement for women's rights in the British India. In this article, the author tries to anlyse Rokeya's contribution to women's rights in the sub-continent.

ভূমিকা

আমাদের জাতীয় জীবনে জাতিগত পরিচয়ের মীমাংসা এখনও হয়নি। কখনও বাঙালি, কখনও বাংলাদেশি। বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরাধীন ব্রিটিশ-ভারতে। তখনও জাতিগত পরিচয় নিয়ে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) তাঁর *শ্রীকান্ত* (১ম খণ্ড) উপন্যাসে বাঙালি বলতে শুধু হিন্দুদেরকেই বুঝিয়েছেন, মুসলমানকে নয়। আমরা জানি, সুলতান শামস্‌উদ্দিন ইলিয়াস শাহ (রাজত্বকাল/১৩৪২-১৩৫৭) সর্বপ্রথম ১৩৫২ সালে সংশ্লিষ্ট জনপদগুলোকে একত্রিত করে একে একটি একক রাষ্ট্রে পরিণত করেন[১] এবং এর নামকরণ করেন 'বাঙ্গালাহ' আর এদেশবাসীকে 'বাঙ্গালী' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু তার বহুকাল পরও ১৯৪৭ সালে যখন ভারত বিভক্ত হয়, তখনও কোন জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে নয়, ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতেই হিন্দু-মুসলমান-কেন্দ্রিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ফর্মুলা কার্যকর হয়েছিল। আমরা দীর্ঘ সময় কাছাকাছি পাশাপাশি বাস করলেও হিন্দু-মুসলিম মিলিত ধারায় একই চেতনায় এক জাতিতে পরিণত হতে পারি নি। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা পরম্পরায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমান – এই দুই পৃথক জাতিগত পরিচয়ই আমাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বেগম রোকেয়া যে জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন, বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর অর্থে তারা মুসলমান।

আমাদের জাতীয় জীবনে জাতিগত পরিচয়ের মীমাংসা এখনও হয় নি। কখনও বাঙালি, কখনও বাংলাদেশি। বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) জন্মগ্রহণ করেছিলেন পরাধীন ব্রিটিশ-ভারতে। তখনও জাতিগত পরিচয় নিয়ে আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) তাঁর *শ্রীকান্ত* (১ম খণ্ড)

---

* ড. আবেদা আফরোজা, সহকারী অধ্যাপক, ভাষা-যোগাযোগ ও সংস্কৃতি বিভাগ গণ বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা – ১৩৪৪।

উপন্যাসে বাঙালি বলতে শুধু হিন্দুদেরকেই বুঝিয়েছেন, মুসলমানকে নয়। আমরা জানি, সুলতান শামস্উদ্দিন ইলিয়াস শাহ (রাজত্বকাল/১৩৪২-১৩৫৭) সর্বপ্রথম ১৩৫২ সালে সংশ্লিষ্ট জনপদগুলোকে একত্রিত করে একে একটি একক রাষ্ট্রে পরিণত করেন[১] এবং এর নামকরণ করেন 'বাঙ্গালাহ' আর এদেশবাসীকে 'বাঙ্গালী' নামে অভিহিত করেন। কিন্তু তার বহুকাল পরও ১৯৪৭ সালে যখন ভারত বিভক্ত হয়, তখনও কোন জাতীয় চেতনার ভিত্তিতে নয়, ধর্মীয় চেতনার ভিত্তিতেই হিন্দু-মুসলমান-কেন্দ্রিক দ্বিজাতিতত্ত্বের ফর্মুলা কার্যকর হয়েছিল। আমরা দীর্ঘ সময় কাছাকাছি পাশাপাশি বাস করলেও হিন্দু-মুসলিম মিলিত ধারায় একই চেতনায় এক জাতিতে পরিণত হতে পারি নি। প্রকৃতপক্ষে ঘটনা পরম্পরায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমান – এই দুই পৃথক জাতিগত পরিচয়ই আমাদের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বেগম রোকেয়া যে জাতির প্রতিনিধিত্ব করেছেন, বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর অর্থে তারা মুসলমান।

১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর বঙ্গবিজয়ের মাধ্যমে এদেশে মুসলমানদের ঐতিহাসিক রাজত্বের সূচনা। তারপর প্রায় পাঁচশত বছরের ঐশ্বর্যশালী ও গৌরবোজ্জ্বল শাসনকাল মুসলমানদেরকে এদেশের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত করেছে। কিন্তু ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধের পর এদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় যে পট-পরিবর্তন ঘটেছিল, রাজ্যহারা মুসলমান জাতির তখন থেকেই দুঃসময়ের সূচনা। প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া-কোম্পানি প্রবর্তিত বিবিধ আইন-কানুন ও নীতি-নিয়মের অধীনে রাজস্ব ও ভূমি-সংস্কারের ক্ষেত্রে পাঁচশালা, একশালা ও দশশালা পরিকল্পনা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৮৯৩) ও সূর্যাস্ত আইন, সৈন্য, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ থেকে মুসলমান বিতাড়ন, লাখেরাজ রায়তীসত্ব বাজেয়াপ্তকরণ (১৮২৮), ফারসির স্থলে ইংরেজিকে রাজভাষার মর্যাদা দান (১৮৩৭) এবং চাকুরি-ক্ষেত্রে নতুন নিয়োগ-বিধি (১৮৪৪)-র ফলে রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ-সুবিধা হারিয়ে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে পরিণত হয়েছিল দরিদ্র ও নিঃস্ব শ্রেণিতে। একদিকে ইংরেজদের বৈরী দৃষ্টি, অন্যদিকে দীর্ঘ রাজত্বের আত্মাভিমান, পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি অনীহা ও শিক্ষাগ্রহণে আর্থিক অক্ষমতা এবং ওয়াহাবী (১৮৩১), ফরায়েজি (১৯২০) ও সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) মতো বাস্তবতা-বর্জিত অদূরদর্শী পরিকল্পনার কারণে মুসলিম সমাজ যুগোপযোগী চিন্তা-চেতনার বিকাশে ব্যর্থ হয়েছে। তারা কেবল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত দিক থেকেই পঙ্গু হয়ে পড়ে নি, ধর্মীয় দিক থেকেও বিশুদ্ধতা হারিয়ে অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কবলে পতিত হয়।

বিপরীতভাবে হিন্দুরা প্রথম থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে চাকুরি, ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য – প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নতির দ্বারা আধুনিক রনেসঁস-এর সূত্রপাত ঘটিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মানবতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বদেশপ্রেম, যুক্তিবাদ ও মুক্তবুদ্ধির সমন্বয়ে ভারতবর্ষে যে নবজাগরণের সূচনা ঘটেছিল, তার উদ্গাতা এরাই। এই নবজাগরণের সূচনায় ভারতীয় নারীসমাজের প্রতিও রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩) - বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)-এর ন্যায় কিছু মনীষীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।

শুরুতে তারা হিন্দুসমাজের নারীকেন্দ্রিক সমস্যাগুলো দূরীভূত করার দিকে মনোযোগ দেন। ফলে পাশ হয় বেশ কিছু আইন। যেমন –

> সতীদাহ নিবারণ আইন (১৮২৯), সহবাস সম্মতি আইন (১৮৯১), বিধবাবিবাহ আইন (১৮৫৬), শিশুবিবাহ-নিবারক আইন (১৯২৯) ইত্যাদি। শুধু তাই নয়, পুরো শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয় মেয়েরা শিক্ষা, চাকুরি, রাজনীতি , সমাজসেবা, সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধীর পদক্ষেপে হলেও এগিয়ে গেছে। এই নবজাগরণের ধারায় মুসলিম সমাজ যুক্ত হতে পারে নি। মুসলমানেরা এই ধারাবাহিকতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর পিছনে ছিটকে পড়েছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে তাদের মধ্যে জাগরণ লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৫৮-১৯০৩)। তিনি নারীশিক্ষার জন্য দুটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[২] সঙ্গে হোস্টেল এবং বৃত্তিরও ব্যবস্থা ছিল।[৩]

১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত তাঁর কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়টি বর্তমানেও 'ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়' নামে চালু আছে। অতঃপর স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮), নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) প্রমুখ মনীষী মুসলিম-সমাজকে জাগ্রত করার জন্য এগিয়ে আসেন। শিক্ষার সাথে ইংরেজি শিক্ষা এবং নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে তাঁরা নানা সভা-সমিতি, বক্তৃতা-বিবৃতি ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের মাধ্যমে বোঝাতে চেষ্টা করেন। এরই ফলশ্রুতি সৈয়দ আহমদের 'আলীগড় কলেজ' প্রতিষ্ঠা, ১৮৭৩ সালে নওয়াব আবদুল লতিফের 'হিন্দু কলেজ'কে 'প্রেসিডেন্সি কলেজে' রূপান্তরের মাধ্যমে মুসলমান ছাত্রদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, এবং 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন'(১৮৬৭) ও 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' (১৮৬৩) প্রতিষ্ঠার দ্বারা অধঃপতিত মুসলিম সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে নারী-পুরুষের শিক্ষা বিস্তার ও মৌলিক সাহিত্য-চর্চার পরিবেশ গড়ে তোলা ইত্যাদি। একইভাবে ভূমিকা রাখে সৈয়দ আমীর আলীর 'ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৭) ও 'সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন'। এছাড়া 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' (১৮৭৯), 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩), 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' ইত্যাদি মুসলমান সমাজ উন্নয়নে ও নারীশিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখে।

এ ধারাতেই যুক্ত হয়েছে আরেকটি নাম–বেগম রোকেয়া। সবচেয়ে উচ্চকণ্ঠ, সবচেয়ে বলিষ্ঠ, সবচেয়ে কর্মমুখর–যেমন কথায়, তেমনি কাজে। যে-যুগে মুসলমান পুরুষেরাই ছিলেন সংস্কার-কুসংস্কারের ঘেরাটোপে আবদ্ধ, সে যুগে একজন মুসলিম মহিলার এই বৈপ্লবিক ভূমিকা আমাদেরকে শুধু বিস্মিতই করে না, তাঁর চরণধুলার তলে আমাদের মাথা নত করে দেয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলমানদের যে অংশের মধ্যে স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল, সেই জাতীয় জাগরণ সৃষ্টির একজন প্রধানতম পথিকৃৎ বেগম রোকেয়া।[৪] একজন রোকেয়া-গবেষকের ভাষায় –চারদিকে যখন

অবিশ্বাস ও সংশয়-দ্বিধা ও শঙ্কা, জাতির সে দুর্দিনে মিসেস আর.এস.হোসেন এসেছিলেন স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের দাবী ও জীবন নিয়ে – যার মধ্যে আমাদের সর্বহারা পথভ্রান্ত সমাজ এক নতুন পথের অভিনব লোকের সন্ধান পেয়েছিল।[৫]

বেগম রোকেয়ার সমসাময়িক সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করলে দেখা যায়, কী দুঃসহ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে গেছেন? তাঁর পরিবারে শিক্ষার পরিবেশ ছিল কিন্তু নারীশিক্ষার পরিবেশ ছিল না। তাই যেখানে বেগম রোকেয়ার ভায়েরা সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াশুনা করেছেন, সেখানে বেগম রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা সামান্য গৃহশিক্ষার সুযোগ পেয়েও হারান। বেগম রোকেয়া নিজেও গভীর রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে বড় ভায়ের কাছে বাংলা-ইংরেজি শিখেছিলেন। তাঁর পরিবারে পর্দা প্রথা এতো কঠোর ছিল যে, অনাত্মীয় মহিলাদের সম্মুখেও পর্দা মেনে চলতে হতো – যার অবিশ্বাস্য চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে বেগম রোকেয়ার *অবরোধবাসিনী* গ্রন্থে। এ গ্রন্থের ৪৭টি ঘটনা কোন কল্পজগৎ থেকে আসে নি, তাঁর নিজের চোখে দেখা বাস্তব ঘটনা।

বেগম রোকেয়ার পিতার ছিল ৪ জন স্ত্রী। এ থেকে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে তাঁর পিতার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়টি লক্ষণীয়। বেগম রোকেয়ার নিজের বিয়ে হয়েছিল ১৬ বছর বয়সে, যখন তাঁর স্বামীর বয়স ছিল ৩৮ বছর এবং বিপত্নীক স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একটি মেয়েও ছিল। বেগম রোকেয়ার দুটি কন্যাসন্তান জন্মেছিল, কিন্তু বছর না ঘুরতেই তারা ইহধাম ত্যাগ করে। নিজের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে রোকেয়া খুবই সংযত-বাক। তারপরও তাঁর সহজ স্বীকৃতি –

> শৈশবে বাপের আদর পাইনি, বিবাহিত জীবনে কেবল স্বামীর রোগের সেবা করেছি। প্রত্যহ Urine পরীক্ষা করেছি, পথ্য রেঁধেছি, ডাক্তারকে চিঠি লিখেছি। দু'বার মা হয়েছিলুম – তাদেরও প্রাণ ভরে কোলে নিতে পারি নি। একজন ৫ মাস বয়সে, অপরজন ৪ মাস বয়সে চলে গেছে। আর ২২ বছর যাবৎ বৈধব্যের আগুনে পুড়েছি।[৬]

তবে স্বামীর সংসারে রোকেয়ার যেটি সবচেয়ে বড় পাওয়া, তাহলো একটি উদার, উন্মুক্ত ও মুক্তচিন্তার আবহসমৃদ্ধ পরিবেশ, যার সাহায্যে তিনি জ্ঞানার্জনের অবাধ সুযোগ পেয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষিত স্বামীর ঘরে আসতো নানা ধরনের গ্রন্থ ও দেশি-বিদেশি পত্র-পত্রিকা।[৭] ফলে ঘর-পর, স্বদেশ-বিদেশ – সবই তাঁর চিন্তার জগতকে প্রসারিত করেছিল। ১৭৮৯ সালের ফরাশি বিপ্লব বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছিল সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী। এই বাণী মানুষ হিসেবে নারীদেরকেও আলোড়িত করেছিল। ১৭৯২ সালে প্রকাশিত মেরি ওলস্টোন ক্রাফট (১৭৫৯-১৭৯৯)-এর বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ A Vindication of the Rights of Women তারই প্রমাণ। মানুষের মর্যাদায় নারীকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এ গ্রন্থের লক্ষ্য। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সর্বত্রই এর প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩)-এর The Subjection of Women গ্রন্থটিও উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থেও নারী-পুরুষের সমানাধিকারকেই যুক্তির

মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বেগম রোকেয়ার জন্মের পূর্বেই এসব ঘটনা ঘটেছিল। সেই সঙ্গে পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশে তখন মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ, চাকুরি করার অধিকার, নিজের বেতন হাতে পাবার অধিকার, সম্পত্তির মালিক হবার অধিকার, মামলা করার অধিকার, প্রকাশ্যে সম্মেলনে কথা বলার অধিকার, বিবাহের সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অধিকার ইত্যাদি সীমিত আকারে হলেও শুরু হয়েছিল। তবে মেয়েদের ভোটাধিকার বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কোথাও প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

এসব খবর বেগম রোকেয়ার জানা ছিল। তাই একদিকে সমসাময়িক বৈশ্বিক পটভূমি এবং অন্যদিকে দেশীয় প্রতিবেশ – দুই-ই রোকেয়ার মানস গঠনে সহায়ক হয়েছিল। স্বামীর জীবদ্দশাতেই রোকেয়ার সাহিত্য-জীবনের সূচনা। সাহিত্যকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন সমাজ-পরিবর্তনের হাতিয়াররূপে। তাই তাঁর সাহিত্য রচনা ছিল উদ্দেশ্যমূলক। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তা হয়ে উঠেছে বক্তব্যপ্রধান। প্রত্যেক সমাজেরই অর্ধেকাংশ নারী। তাই এই নারী অংশের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজ গড়ে তোলাই ছিল বেগম রোকেয়ার জীবন-সাধনা।

মুসলমান নারীসমাজে তখনও প্রচলিত ছিল – বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, অবরোধ-প্রথা, বাদী-প্রথা, বিধবাবিবাহের অপ্রচলন, তালাক-প্রথা, পণ-প্রথা, অশিক্ষা, নানারূপ কুসংস্কার ও পুরুষের একাধিপত্য। বেগম রোকেয়া তাঁর 'স্ত্রীজাতির অবনতি' নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, সেই বিংশ শতাব্দীর শুরুতেও নারীরা ছিল 'দাসী'। এই দাসী হওয়ার কারণও তিনি নির্ণয় করেছেন। একদিকে সুযোগের অভাব, অন্যদিকে নারীদেরকে অধঃস্তন করে রাখতে পুরুষের সক্রিয় ভূমিকা। সম্ভবত এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি রচনা করেছিলেন *সুলতানাজ ড্রিম* গ্রন্থটি। রোকেয়ার স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেন যার সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন – 'A terible revenge' অর্থাৎ পুরুষের উপর নারীর ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ।[৮] কিন্তু সেকালের নারীরা সচেতনতার অভাবে বুঝতেও পারে নি যে, পুরুষেরা তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে তাদের দাসত্বকেই আরও পাকাপোক্ত করছে। তাদের মানসিক উচ্চবৃত্তিগুলো দীর্ঘদিন অকর্ষিত থাকার ফলে তা ভোতা হয়ে পড়েছিল। তারাও যে পুরুষের মতোই মানুষ, পুরুষের বুদ্ধির সঙ্গে তাদের বুদ্ধির কোন তফাৎ নেই, চেষ্টা করলে তারাও পুরুষের মতো বাইরের জগতে যুক্ত হতে পারে, কাজকর্ম করে পুরুষের মতো স্বাধীন হতে পারে – এটা চিন্তা করার মতো বোধশক্তিও অধিকাংশের মধ্যে ছিল না। এ জন্যই বেগম রোকেয়া বলেছেন – 'আমাদের মন পর্য্যন্ত দাস হইয়া গিয়াছে।'[৯]

বেগম রোকেয়ার মতে, নারীর এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য মূলত পুরুষই দায়ী। পুরুষ যেহেতু পরিবারের কর্তা, তাই তার অঙ্গুলি নির্দেশেই পরিবার চলে, চলে সমাজ। কাজেই পুরুষেরা যদি পরিবার থেকেই ছেলে এবং মেয়েকে সমান সুযোগ-সুবিধার মধ্য দিয়ে বড় করে তুলতেন, তাহলে সমাজে, শিক্ষায় এবং কর্মক্ষেত্রে নারীরাও সমান মর্যাদা ও সমান গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হতো। কিন্তু পুরুষেরা তা করে নি বলেই নারীরা পরিণত হয়েছে জড়বস্তুর মতো পুরুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে। তাই উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দূরতিক্রম্য ব্যবধান। নারী ও পুরুষের এই বৈসাদৃশ্যপূর্ণ অবস্থানকে বেগম

রোকেয়া কতোটা সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গিতে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা প্রমাণ করেছেন, তার কিছু দৃষ্টান্ত বেগম রোকেয়ার 'অর্দ্ধাঙ্গী' নামক প্রবন্ধ থেকে তুলে ধরা হলো :

সমকালীন সমাজে রাম ও সীতা যথাক্রমে আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ নারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু বেগম রোকেয়ার মতে, সংসারে তাদের প্রকৃত পরিচয় – রাম একজন বালক মাত্র আর সীতা তার হাতের পুতুল। বালক পুতুলকে নিয়ে যা-ইচ্ছে তাই করতে পারে, তাকে ভালবাসতে পারে, আদর করতে পারে, পুতুল হারিয়ে গেলে কেঁদে বুক ভাসাতে পারে, আবার রাগ হলে ছুঁড়ে ফেলেও দিতে পারে, কিন্তু পুতুল জড়বস্তু বলে সীতার সেটুকুও করার ক্ষমতা নেই। মুসলমানী আইনানুযায়ী পৈতৃক-সম্পত্তিতে কন্যা এমনিতেই পুত্রের অর্ধেক অংশের দাবিদার, তারপরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে কন্যা সেটুকুও পান না। এ নিয়মে পিতা পুত্রের জন্য চারজন শিক্ষক নিযুক্ত করলে কন্যার জন্য দু'জন নিয়োগ করার কথা, কিন্তু কার্যত তার জন্য একজনও নিয়োগ করা হয় না। পুত্রকে বি.এ পাশ করালেও কন্যাকে এন্ট্রান্স পর্যন্তও এগিয়ে দেন না। তাই এদেশে স্বামী যখন সৌরজগতে অবস্থান করেন, এবং গ্রহ-নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, তখন স্ত্রী বালিশের কভারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপেন অথবা রান্নাঘরে চাল-ডালের হিসেবের সাথে রাধুনীর রান্নার গতি নির্ণয় করেন। এমনকি বরের সাথে কনের মানসিক জগতের অমিল বা দূরত্ব এতো বেশি যে, বরের ঘরে কনে বরের কথা না ভেবে বাপের বাড়ি ফেলে আসা মেনি বিড়ালটির জন্য কাঁদে, কুঞ্জবনে বরের সাথে দাম্পত্য আলাপ বাদ দিয়ে বসে বসে টোপা কুল খায়, আর বরের-বিরহকালে মনের আনন্দে পুতুল বিয়ে দেয়। উল্লেখ্য যে, এ কথাগুলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে বেগম রোকেয়া উদ্ধৃত করেছেন।

যে-সমাজে নারী-পুরুষের অবস্থানের চিত্র এরূপ, সে-সমাজের উন্নতি যে কখনোই সম্ভব নয়, বেগম রোকেয়া পশ্চাদপদ এই নারী জাতি এবং তদপেক্ষা উন্নত পুরুষ জাতির সমন্বয়ে একটি কল্পিত চিত্র এঁকে তাকে প্রমাণ করেছেন। প্রমাণ করেছেন দ্বিচক্রযানের দু'টি চাকার সঙ্গে নারী ও পুরুষের তুলনা করে। একটি গাড়ির দু'টি চাকা সমান না হলে যেমন গাড়ি অধিকদূর অগ্রসর হতে পারে না, তেমনি সমাজ-রূপ গাড়ির নারী ও পুরুষ-রূপ দু'টিচাকাও সমান না হলে সমাজও তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে না। তাই সমাজকে পূর্ণ গতিতে অগ্রসর হতে দিতে চাইলে নারী-পুরুষ উভয়েরই অগ্রগতি দরকার।

বেগম রোকেয়া দেখিয়েছেন, ঈশ্বর বা আল্লাহ নিজেও নারী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান রাখেন নি। তাই মায়ের বুকের দুধ পুত্রের জন্য যতটুকু বরাদ্দ আছে, কন্যার জন্যও ততোটুকুই আছে। পুত্র মায়ের গর্ভে যতোদিন অবস্থান করে, কন্যাও ততোদিনই অবস্থান করে। তাহলে সমাজে এই বৈষম্য কেন?

পর্দা-প্রথাকে বেগম রোকেয়া কখনোই নারীর উন্নয়নের পথে বাধা বলে মনে করেন নি। তাঁর মতে, পর্দা মানে অবরোধ নয়, পর্দা করেও অবরোধমুক্ত হওয়া যায় এবং শিক্ষা-গ্রহণ, চাকুরি করা বা বাইরের জগতে বিচরণ সবই সম্ভব। পর্দা সভ্যতারই প্রতিফলন। প্রয়োজনে তিনি বোরকার আধুনিকায়ন কামনা করেছেন। তাঁর কথায় –

> সচরাচর বোরকার আকৃতি অত্যন্ত মোটা (coarse)হইয়া থাকে। ইহাকে কিছু সুদর্শন (fine) করিতে হইবে। জুতা, কাপড় প্রভৃতি যেমন ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ বোরকারও উন্নতি প্রার্থনীয়।[১০]

বেগম রোকেয়ার মতে, নারী-উন্নয়নের জন্য প্রথম এবং প্রধান শর্ত হলো নারী-শিক্ষা। একমাত্র শিক্ষাই পারে নারীকে তার মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে। শিক্ষাই পারে যুক্তির আলোয় নিজেকে মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন করতে; তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধা, ক্ষমতা-অক্ষমতা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, প্রতিবাদ-প্রতিশোধ-প্রতিরোধ, অধিকার-বিশ্বাস, সক্ষমতা-স্বাধীনতা – ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত করতে। অবশ্য শিক্ষার সংজ্ঞা নিয়ে বেগম রোকেয়ার একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। তাঁর মতে –

> শিক্ষা"র অর্থ কোন সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের "অন্ধ-অনুকরণ" নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। ঐ জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ। ঈশ্বর আমাদিগকে হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ, মনঃ এবং চিন্তাশক্তি দিয়াছেন। যদি আমরা অনুশীলন দ্বারা হস্তপদ সবল করি, হস্ত দ্বারা সৎকার্য্য করি, চক্ষুদ্বারা মনোযোগ সহকারে দর্শন করি, কর্ণ দ্বারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা আরও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিতে শিখি – তাহাই প্রকৃত শিক্ষা। আমরা কেবল "পাশ করা বিদ্যা"কে প্রকৃত শিক্ষা বলি না।[১১]

বেগম রোকেয়ার *পদ্মরাগ* উপন্যাসের তারিণীভবনের স্কুল শাখার যে পাঠক্রম, তাও তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। এ উপন্যাসের দীন-তারিণী চরিত্রটি আসলে বেগম রোকেয়ারই প্রতিচ্ছবি। দীন-তারিণী প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে –

> বিদ্যালয়ে গবর্ণমেন্ট হইতে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং বাধ্য হইয়া "সরকারী" পাঠ্য-পুস্তকের তালিকাভুক্ত কোন পুস্তক অধ্যয়ন করানো হয় না। দেশের সুশিক্ষিতা মহিলাদের সহিত পরামর্শ করিয়া দীন-তারিণী নিজেই পাঠ্য-পুস্তক নির্বাচন করেন। ছাত্রীদিগকে দুই পাতা পড়াইতে শিখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢালিয়া বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠিত করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, অংকশাস্ত্র – সবই শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু শিক্ষার প্রণালী ভিন্ন। মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহাদিগকে নিজের দেশ এবং দেশবাসীকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয় না। বালিকাদিগকে অতি উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী ও সুমাতা হইতে এবং দেশ ও ধর্মকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বিশেষতঃ তাহারা আত্ম-নির্ভরশীলা হয় এবং ভবিষ্যৎ-জীবনে যেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ পিতা, ভ্রাতা বা স্বামী-পুত্রের গলগ্রহ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।[১২]

যে শিক্ষা দেশ ও দেশের মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায়, সে শিক্ষাকে তিনি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন নি। কারণ, ইঙ্গবঙ্গীয় সৃষ্টি তাঁর লক্ষ্য নয়। তাঁর লক্ষ্য জ্ঞানী, দেশপ্রেমিক, ধর্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল একটি জাতি গঠন। তাই শুধু জ্ঞানের শিক্ষা নয়, সেই সঙ্গে

পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার শিক্ষাই তিনি দিতে চেয়েছেন। বেশির ভাগ পুরুষেরাই মনে করেন– স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন নেই। রান্না, সেলাই আর দু-চারটা উপন্যাস পড়তে পারলেই যথেষ্ট। কিন্তু বেগম রোকেয়া ডাক্তারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন –যেহেতু মাতার দোষ-গুণ লইয়া পুত্রগণ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়। এইজন্য দেখা যায় যে, আমাদের দেশে অনেক বালক শিক্ষকের বেত্রতাড়নায় কণ্ঠস্থ বিদ্যার জোরে এফ.এ, বি.এ পাশ হয় বটে; কিন্তু বালকের মনটা তাহার মাতার সহিত রান্নাঘরেই ঘুরিতে থাকে।[১৩]

তিনি ব্যঙ্গাত্মকভাবে এও বলেছেন – 'গোলাপ লতিকায়' কখনও 'কাঁঠাল' ফলে না।[১৪] তাছাড়া 'সুগৃহিণী' নামক প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন, সুগৃহিণী হওয়ার জন্যও উত্তমরূপে শিক্ষার প্রয়োজন। প্রথমেই নিজের বাসগৃহ তৈরি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। কয়টা ঘর,কী কী ঘর, কোন্ ঘরের আয়তন ও ডিজাইন কেমন হবে, কোন্ ঘর কী কী আসবাবপত্রে সাজানো হবে, সে সম্পর্কে রুচিজ্ঞানের সাথে ঘরের আয়তনের সামঞ্জস্য সম্পর্কে ধারণা থাকা চাই। এছাড়া বাড়ির আঙিনায় সব্জির চাষ, রান্নার ক্ষেত্রে খাদ্য-পুষ্টি, খাদ্য-গুণ, খাদ্য-বিষ, পরিমিত আহার বিষয়ে জ্ঞান রাখা; গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা ও গৃহের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞান, রোগীর পরিচর্যা, সন্তান পালন, পোশাক তৈরি ও ঋতুবিশেষে পোশাক-পরিধান সম্পর্কে ধারণা রাখা, বিপদ-আপদে তাৎক্ষণিক মোকাবেলা করার বুদ্ধি ও শক্তি অর্জন, পরিমিত ব্যয়, গৃহপরিচারিকার প্রতি মানবিক আচরণ, প্রতিবেশির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন – এসবই একজন সুগৃহিণীর গুণাবলি, যা কেবল সুশিক্ষার দ্বারাই অর্জিত হওয়া সম্ভব।

বেগম রোকেয়ার নিজের জ্ঞানের গভীরতা ছিল অপরিসীম। তিনি যে কতোটা জ্ঞানপিপাসু, অধ্যবসায়ী ও চিন্তাশীল ছিলেন, তার প্রচুর উদাহরণ তাঁর রচনায় ছড়িয়ে আছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক কল্পনার ফসল – সৌরচুল্লী, উড়োযান, কৃত্রিম উপায়ে বাষ্পীয় বেলুনের সাহায্যে বৃষ্টি ধরে রাখা এবং ইচ্ছেমতো বৃষ্টি নামানো, আজকের পৃথিবীতে যার অনেক কিছুই সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া দেশের নানা ভৌগোলিক অবস্থান এবং সৌরজগতের গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কেও তাঁর প্রচুর জ্ঞান ছিল। এসব জ্ঞানের সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও বুদ্ধি, যা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে পাঠককে অনায়াসে দাঁড় করিয়ে দেয় অকাট্য সত্যের সামনে। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষার উপর তাঁর যে দক্ষতা, তাও আমাদেরকে বিস্মিত করে। উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষার উপরও তাঁর ভাল দখল ছিল। তাঁর *সুলতানাজ ড্রিম* পুস্তকটি বিদেশের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নারীবিষয়ক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।[১৫]

বেগম রোকেয়া ছিলেন নারী-স্বাধীনতার ঘোর পক্ষপাতি। নারী-স্বাধীনতা বলতে তিনি 'পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থা'কে বুঝিয়েছেন।[১৬] আর এই স্বাধীনতার প্রধান শর্ত যে নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি, তাও তিনি ভেবেছেন। এই মুক্তির জন্য তিনি প্রয়োজনে নারীদেরকে যে-কোন পেশায় আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন। কারণ তাঁর কাছে সকল পেশাই সম্মানজনক। তাঁর কথায় –

> আবশ্যক হইলে আমরা লেডীকেরানী হইতে আরম্ভ করিয়া লেডীম্যাজিষ্ট্রেট, লেডীব্যারিষ্টার, লেডীজজ – সবই হইব। পঞ্চাশ বৎসর পরে লেডী viceroy হইয়া

> এ দেশের সমস্ত নারীকে "রাণী" করিয়া ফেলিব!! আমাদের কি হাত নাই, নাপা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পশ্রিম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে পারিব না? আমরা যদি রাজকীয় কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতে না পারি, তবে কৃষিক্ষেত্রে প্রবেশ করিব।[১৭]

বরপণ-প্রথা বাংলাদেশের মতো সমগ্র ভারত জুড়েই আছে। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ও তার কন্যার করুণ অবস্থার চিত্র সে যুগের রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬) থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) পর্যন্ত সাহিত্যে চিত্রিত করেছেন। সেক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার বক্তব্য –ভারতে বর দুর্লভ হইয়াছে বলিয়া কন্যাদায়ে কাঁদিয়া মরি কেন? কন্যাগুলিকে সুশিক্ষিতা করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দাও, নিজের অন্নবস্ত্র উপার্জন করুক।[১৮]

নারীর জন্য এই যে কৃষিক্ষেত্রের কাজ, স্বাধীন ব্যবসা, বিয়ের তোয়াক্কা না করে নিজের মতো চলতে শেখা – এসবই বেগম রোকেয়ার প্রাগ্রসর চিন্তা-ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। বেগম রোকেয়ার মানস-কন্যা *পদ্মরাগ* উপন্যাসের সিদ্দিকার মধ্যে এই চেতনারই পরিস্ফুটন লক্ষণীয়। এ চরিত্রে ফুটে উঠেছে তাঁরই একান্ত আদর্শ ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন। নারীরও যে আলাদা একটি জীবন আছে, আছে মর্যাদাবোধ, আছে স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার – সিদ্দিকা তাকেই প্রমাণ করেছে। ঘটনা পরম্পরায় সিদ্দিকা একজন স্বামী-পরিত্যক্তা। তার স্বামী পুনরায় বিয়ে করেছে, তার সন্তানাদি হয়েছে। কিন্তু সে কখনই সিদ্দিকার খোঁজ-খবর করে নি। পরবর্তীতে সিদ্দিকা তারিণীভবনে অবস্থানকালে তারা একে অপরের কাছাকাছি আসে এবং তাদের মধ্যে ঘণিষ্ঠতাও সৃষ্টি হয়। কিন্তু সিদ্দিকা যখনই জানতে পেরেছে, এই আলমাসই তার বাগদত্তা স্বামী, তখনই সে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এই প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে সে বলেছে – আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন? আমি সমাজকে দেখাইতে চাই যে, 'সুযোগ' জীবনে একবার ছাড়া দুইবার পাওয়া যায় না;– তোমরা পদাঘাত করিবে আর আমরা তোমাদের পদলেহন করিব, সেদিন আর নাই। [১৯]

পদ্মরাগ উপন্যাসের দীন তারিণী স্বয়ং বেগম রোকেয়া। স্কুল পরিচালনা, ছাত্রী সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ, স্কুলের জন্য নিজের সবকিছু উৎসর্গ করা, সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং নানা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলাই দীন তারিণীর জীবনের মূল লক্ষ্য। তার তারিণীভবন তিনটি অংশে বিভক্ত। এই তিনটি হলো – বিদ্যালয়, কর্মালয় ও আঁতুরাশ্রম। বিদ্যালয়ে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খ্রিস্টান সব ধরনের শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছে। তাদের মধ্যে কোন ধরনের বৈষম্য নেই। কর্মালয়ে কুমারী, সধবা, বিধবা সকল শ্রেণির নারীই রয়েছে। তারা যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী সূচিকর্ম করে, চরকা কাটে, হাতের তাঁতে কাপড় বোনে, পুস্তক বাঁধাই করে, নানাবিধ মিষ্টান্ন তৈরি করে। কেউ শিক্ষার্থী পদলাভের জন্য শিক্ষাগ্রহণ করে, কেউ টাইপিং শিক্ষা করে, কেউ নার্সিং শেখে। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী-পীড়িত লোকদের সাহায্যেও এ বিভাগের নারীরা খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ

বিতরণসহ রোগী-সেবা করে থাকে। আর আঁতুরাশ্রমে পথে পড়ে থাকা অসহায় ও নিঃস্ব রোগীরা আশ্রয় পায় এবং সুস্থ হওয়ার পর কেবল কুষ্ঠরোগী ও অক্ষমেরা থেকে যায়।

বেগম রোকেয়া নারীর আত্মমর্যাদাবোধেরও ছিলেন জ্বলন্ত প্রতীক। নারীর আত্মমর্যাদাবোধকে অটুট রাখতে তিনি স্বামীকে 'স্বামী' বলতেও ছিলেন অনিচ্ছুক। কারণ স্বামী অর্থ হলো প্রভু। স্বামী যদি 'প্রভু' হয়, তাহলে পত্নী হয়'দাসী'। স্ত্রী যেহেতু স্বামীর অর্ধাঙ্গী এবং স্বামী স্ত্রীর অর্ধাঙ্গ, তাই প্রভু সম্পর্কটি তাদের মাঝে মানায় না। তাঁর মতে, স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ে মিলে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ – 'পুরুষ শরীর, রমনী মন'।[২০]

বেগম রোকেয়া নারীদেহের অতিরিক্ত অলঙ্কার, সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যবৃদ্ধির প্রচেষ্টাকেও কটাক্ষ করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে এটা মেয়েদের মানসিক দুর্বলতা ভিন্ন আর কিছু নয়। কৃত্রিম উপায়ে নিজেকে তুলে ধরার মধ্যে তার হীনমন্যতাই প্রকাশ পায়। আজকের যুগে নারীর সৌন্দর্যকে যেভাবে পণ্যের মতো মূল্যায়ন করা হচ্ছে, বেগম রোকেয়া তা যেন পূর্বেই বুঝেছিলেন।

নারী-বিষয়ক আলোচনা ছাড়াও বেগম রোকেয়া বাংলা ভাষা নিয়ে ভেবেছেন। যদিও নিজের বিদ্যালয়ে একটি বাংলা শাখা খোলার চেষ্টা করলেও বিরুদ্ধ পরিবেশের কারণে তিনি তা পেরে ওঠেন নি।[২১] তিনি 'চাষার দুক্ষু' নামক প্রবন্ধে কৃষকের দুরবস্থার কথা বলেছেন এবং স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন –'কেবল কলকাতাটুকু আমাদের গোটা ভারতবর্ষ নহে।'[২২] তিনি শুধু মুসলমান সমাজের কথা ভাবেন নি, ভেবেছেন পুরো ভারতবর্ষের কথাও – যেখানে তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনাই প্রাধান্য পেয়েছে –স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিম্বা পারসী বা খ্রীষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি – আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী, তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু।[২৩]

এ পর্যন্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, বেগম রোকেয়ার সাহিত্যজীবন ও কর্মজীবনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল দুর্দশাগ্রস্ত নারী-সমাজের উন্নয়ন-প্রচেষ্টা। তাঁর সমকালীন সমাজ ছিল পুরষশাসিত সমাজ। পুরুষের একাধিপত্য ও নির্মম অবহেলার মধ্যেই ছিল নারীজীবন আবর্তিত। অশিক্ষার অভিশাপে অভিশপ্ত, বহির্জগতের সাথে সম্পর্কশূন্য, সংসার-কারাগারে বন্দী, স্বামীর আজীবন সেবাদাসী হিসেবে নারীর যে যুগ-যুগান্তরের পরিচয়, তাকে মুছে ফেলে নতুন পরিচয় নির্মাণই ছিল বেগম রোকেয়ার আজীবন-সাধনা। তাঁর এ সাধনা যে সার্থকতার পথে এগিয়ে গেছে, আজকের বাংলাদেশের নারী-সমাজ তারই উদাহরণ। লেডি-কেরানি, লেডি-জজ তো আছেই, বাংলাদেশে এখন এমন কোন উচ্চতর বা নিম্নতর পেশা নেই, যার সাথে নারীরা যুক্ত নেই। এমনকি রাষ্ট্র-পরিচালনার সর্বোচ্চ পর্যায়েও রয়েছে নারী। আজ এই উদাহরণ প্রত্যেক ঘরে ঘরে তৈরি হওয়া দরকার। কারণ একটি জাতীয় উন্নয়নের

জন্য পুরুষের পাশাপাশি সমাজের অর্ধেকাংশ নারীর অংশগ্রহণও অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়ার নিজস্ব ধারণাটি প্রণিধানযোগ্য :

> মেয়েরা সমাজেরই অর্ধ অঙ্গ। মেয়েরা পড়ে থাকলে সমাজের উন্নতির আশা বৃথা। কোন ব্যক্তির এক-পা বেঁধে রাখলে সে খুঁড়িয়ে কতদূর চলতে পারে ? পুরুষের স্বার্থ এবং মেয়েদের স্বার্থ ভিন্ন নহে – একই। তাই সর্বত্রই নারীকে পুরুষের পাশাপাশি চলার মতো সমকক্ষতা অর্জন করতে হবে। পুরুষরা হয়তো বা উন্নতি-রাজ্যে পৌছুচ্ছেন, কিন্তু সেখানে পৌছে যখন দেখছেন, তাদের সঙ্গিনী নেই, তখন ফিরে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। জগতের যে সমস্ত পুরুষ সঙ্গিনীসহ অগ্রসর হচ্ছেন, তারা উন্নতির চরম সীমায় পৌছুতে যাচ্ছেন। তাই নারীর উচিৎ, পুরুষের পাশাপাশি তাদের সহচরী, সহকর্মিনী ও সহধর্মিনী হয়ে তাদেরকে সহায়তা করা।[২৪](সংক্ষেপিত)

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, "বাংলার জাগরণে মুসলিম সমাজের অর্ধাংশের নেতৃত্ব দিয়েছেন রোকেয়া।.. বাস্তবিকপক্ষে তিনি মুসলিম বাংলার অন্যতম স্রষ্টা।"[২৫] তাঁর প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতাতেই বাংলার নারীরা আজ জেগেছে। কিন্তু সে জাগরণী মন্ত্র এখনও সমাজের সর্বত্র পৌছে নি। নারীসমাজের বৃহত্তম অংশই এখনও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে অন্ধকার গহ্বরে। সেখান থেকে তাদেরকে আলোর পথে আনতে হলে বেগম রোকেয়ার নির্দেশিত পথই আজও অনুসরণীয় – আর এখানেই জাতীয় স্বার্থে বেগম রোকেয়া বিষয়ক আলোচনার সার্থকতা।

তথ্যসূত্র

১. এ. কে. এম. শাহনাওয়াজ । *বাংলার সংস্কৃতি বাংলার সভ্যতা*, ২য় সং। ঢাকা : দিব্য প্রকাশ, ২০০৭, পৃ.৪০।

২. রওশন আরা বেগম। *নবাব ফয়জুন্নেসা ও পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজ* (অপ্রকাশিত এম.ফিল গবেষণাপত্র)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, ১৯৮৪, পৃ.৪৩।

৩. মালেকা বেগম। *বাংলার নারী আন্দোলন*। ঢাকা : দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯, পৃ.৪৬।

৪. কাজী আবদুল ওদুদ । *বাংলার জাগরণ* । কলকাতা, ১৩৬৩বাং, পৃ.১৯৩।

৫. মুজীবর রহমান। 'মৌলিক বঙ্গ-প্রতিভা', *মাসিক মোহাম্মদী*, ৬বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৯বাং, পৃ. ২৬৭। উদ্ধৃত, মুহম্মদ শামসুল আলম। *রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন : জীবন ও সাহিত্যকর্ম*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৬৯।

৬. মোশফেকা মাহমুদ । *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫, পৃ. ১৫-১৬। উদ্ধৃত, মুহম্মদ শামসুল আলম।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন । জীবন ও সাহিত্য কর্ম । ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ.২৮৯।

৭. মুহম্মদ শামসুল আলম । 'রোকেয়ার সাহিত্য সাধনা : পটভূমি ও মূল্যায়ন', আনোয়ারুল্লাহ সম্পাদিত *রোকেয়া : চিন্তার উত্তরাধিকার*। ঢাকা : রোদেলা প্রকাশনী, ২০০৮, পৃ. ৪০৩।

৮. বেগম মুশতারী শফী । 'বেগম রোকেয়ার লেখনীর শানিত কষাঘাতে জাগ্রত হোক বিবেক', *রোকেয়া : চিন্তার উত্তরাধিকার* । পৃ.৯৪।

৯. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন । 'স্ত্রীজাতির অবনতি', *রোকেয়া রচনাবলী* । পৃ.২৯।

১০. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন । 'বোরকা', মাওলা ব্রাদার্স পরিবেশিত *রোকেয়া রচনাবলী*, ২য় মুদ্রণ। ঢাকা : উত্তরণ, ২০০৮, পৃ. ৬২।

১১. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন । 'স্ত্রীজাতির অবনতি', *রোকেয়া রচনাবলী*। পৃ.৩৬।

১২. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন । *পদ্মরাগ*। *রোকেয়া রচনাবলী*। পৃ.২০৫।

১৩. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন । 'অর্দ্ধাঙ্গী', *রোকেয়া রচনাবলী*। পৃ.৪৬।

১৪. *তদেব*।

১৫. মোরশেদ শফিউল হাসান । 'রোকেয়া ও তাঁর জাগৃতি-সাধনা', প্রাগুক্ত, *রোকেয়া : চিন্তার উত্তরাধিকার*। পৃ.১৫।

১৬. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন । 'স্ত্রীজাতির অবনতি', *রোকেয়া রচনাবলী*। পৃ.৩৮।

১৭. *তদেব*।

১৮. *তদেব*।

১৯. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন । *পদ্মরাগ*। *রোকেয়া রচনাবলী*। পৃ.২০৫।

২০. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন । সুলতানার স্বপ্ন । *রোকেয়া রচনাবলী*। পৃ.১৫৭।

২১. মোরশেদ শফিউ হাসান। 'রোকেয়া ও তাঁর জাগৃতি-সাধনা', *রোকেয়া রচনাবলী*। পৃ.১০।

২২. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। 'চাষার দুক্ষু', *রোকেয়া বচনাবলী*। পৃ. ৩৬৯।

২৩. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। 'সুগৃহিণী', *রোকেয়া বচনাবলী*। পৃ. ৫৬।

২৪. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন। *মতিচূর*। 'স্ত্রীজাতির অবনতি', আবদুল কাদির সম্পা. *রোকেয়া* রচনাবলী। ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ.৩১।

২৫. *প্রাগুক্ত, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৬৯।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

বাংলাদেশে বস্তির সামাজিক প্রেক্ষাপট ও কিশোর অপরাধের ধরন : রাজশাহী মহানগরীতে পরিচালিত একটি সমীক্ষা

মোঃ শহীদুল ইসলাম*

Abstract: The major objectives of this research are to explain the relationship between socio-economic perspectives and juvenile delinquency, the social environment of the slums and deviation of the slums juvenile and to discover the types of delinquent behavior. Findings of the present research are based on primary and secondary data collected from selected slum areas of Rajshahi city. It has been found that very poor people live in the slum areas. Poverty keeps the adult members out of home in search of their livelihood most of the times; the children and juveniles are left uncared for. These uncared children and juveniles interact with spoiled children and juveniles. Besides, the parents can not fulfill their basic needs. At this backdrop they involve themselves in income generating activities. At the same time slums are also secure places for the criminals and juvenile also interacts with them. Sometimes the criminals use the juveniles for their interest paying some money. In the absence of proper guidance the children and juvenile get involved in various delinquent activities. In the present research an attempt has also been made to suggest remedies for the elimination of delinquent acts of the slum children.

ভূমিকা

জন্মের পর হতে শিশু কিশোরদের বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি শিখতে হয় যার মাধ্যমে তারা সামাজিক পরিবেশে বসবাসরত অন্যান্যদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে মিলেমিশে থাকতে পারে। শিশু কিশোরদের এই সমস্ত আচার-আচরণ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ প্রভৃতি শেখার জন্য প্রয়োজন সঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ। বাবা-মা, ভাই-বোন, সঙ্গী-সাথী তথা সমাজে বসবাসরত সকল সদস্যদের মধ্যে যদি সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সম্পর্কের উপস্থিতি থাকে তাহলে শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। আর যদি সমাজে বিশৃঙ্খলা, সৌহার্দহীন এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করে তাহলে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। তারা তখন এমন কর্মকান্ডের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে বৃহত্তর সমাজে যা অপরাধমূলক হিসেবে

* সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গণ্য হয়। শিশুর সামাজিকীকরণ শুরু হয় পরিবার থেকে। পরিবেশের প্রতি শিশুর প্রত্যক্ষণ, মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি পরিবার কর্তৃক প্রভাবিত হয়। পারিবারিক পরিমন্ডলে কোন শিশু-কিশোর যদি সর্বদায় ঝগড়া-বিবাদ, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং অপরাধমূলক ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ পর্যবেক্ষন করে তাহলে তারা সহজেই কিশোর অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। শিশু-কিশোররা অনুকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন আচার-আচরন শিখে থাকে। সে কারনে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তথা পরিবারের সদস্য, পাড়াপ্রতিবেশী, খেলার সাথী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের আচরণ অনুকরণের মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়ে থাকে। যদি পারিপার্শ্বিক পরিবেশে বসবাসরত অন্যান্যরা বিচ্যুত সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হয় তাহলে শিশু-কিশোররা সে ধরণের আচরণে অভ্যস্ত হয়ে পড়তে পারে।

বর্তমান গবেষণা বস্তি এলাকার সামাজিক প্রেক্ষাপটে কিশোর অপরাধ সম্পর্কিত। উল্লেখযোগ্য যে, কিশোর বলতে কাদের বোঝায় এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। The Bengle Children Act 1922 অনুযায়ী ১৪-১৬ বছর পর্যন্ত বয়সী অপরাধীরা কিশোর অপরাধী।[১] Orphanages and Windows Home Act 1944[২], The Convention of The Right of The Child 1989[৩], The Minimum Wages Ordiance 196[৪] অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে বা ১৮ বছর পর্যন্ত কিশোরদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় কিশোরদের বয়সসীমা ১৮ বছরের নীচে ধরে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। আর কিশোর বয়সে যেসব কাজ করলে সমাজ ও কিশোর জীবন বিপদজনক হয়ে পড়ে সেটাই কিশোর অপরাধ। আবার বলা হয়, সমাজ কর্তৃক অসমর্থিত অথচ কিশোর কর্তৃক সংঘটিত সব কাজই হচ্ছে কিশোর অপরাধ। Cavan এর ভাষায়, "Delinquency is misbehavior. Officially juvenile delinquency consist of misbehavior by children and adolescents that leads to refered to the juvenile court."[৫] অন্যদিকে বস্তি হলো শহরের নিম্নশ্রেণীর জন্য অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা বাসস্থান যেখানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, আলো ও পানীয়জলের স্বল্পতা, ঘনবসতি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। সম্প্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘ মানব বসতি কর্মসূচী (ইউএন হ্যাবিট্যাট)-র এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বর্তমান বিশ্বে প্রায় ১০০ কোটি লোক বস্তিতে বাস করে এবং ২০২০ সাল নাগাদ বিশ্বে বস্তিবাসীর সংখ্যা হবে ১৪০ কোটি।[৬] বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তীকালে নগরীগুলোতে ব্যাপকহারে বস্তির বিস্তার ঘটেছে। ঢাকা নগরীতে ১৯৭১-

---

[১] The Bengle Children Act, 1922, Act No. II of 1922.

[২] Orphanages and Windows Homes Act 1944, Act No. III of 1944.

[৩] The Minimum Wages Ordiance 1961, Ordiance No. XXXIX of 1961.

[৪] The Convention on The Right of The Child 1989, Activities of UNICEF.

[৫] Ruth Shonle Cavan, 1969, *Juvenile Delinquency: Development Treatment, Control*, Lippincott Company, New York, P. 4.

[৬] *দৈনিক নতুন প্রভাত*, ১৯ জুন, ২০০৬।

১৯৯৬ সময়ের মধ্যে মোট বস্তির ৯০ ভাগ গড়ে উঠেছে।[৭] রাজশাহী নগরীতে ২০টি ওয়ার্ডে প্রায় শতাধিক বস্তির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।[৮] বাংলাদেশে নগরায়নের ধারায় বস্তির এই বিস্তারকে বারাকাত Slumization বা Ruralization of Urban Life হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের নগরীয় লোকসংখ্যার ৫০%-ই হবে বস্তিবাসী।[৯]

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, নগরীর বস্তি এলাকায় নিু শ্রেণীর লোকজন বাস করে যাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা বেশি পরিমানে লক্ষ্য করা যায়। J.W. Coleman এবং Cressey এর ভাষায়, "The largest percentage of the criminals and delinqents come from the lower classes."[১০] William C. Kvaraceus and Walter B. Miller বলেছেন, "Large number of studies that have indicated that delinquents are disproportionately represented in the lower classes."[১১] আর এই নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সাধারণত বস্তিতে বাস করে। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আইনকানুন, রীতিনীতি, মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব রয়েছে। কিন্তু বস্তি এলাকার দিকে দৃষ্টি দিলে তার ব্যতিক্রম চিত্র আমাদের চোখে পড়ে। যেহেতু বস্তি এলাকায় দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন বাস করে যারা তাদের জীবনে অন্ন, বস্ত্রসহ মৌল চাহিদাগুলোর নূন্যতমও পূরণ করতে পারেনা। তাই জীবনের তাগিদে যে কোন পন্থায় অর্থ উপার্জন তাদের কাছে মূখ্য বিষয় হয়ে দাড়ায়-তা অপরাধমূলক হোক আর নাই হোক। বস্তি এলাকার দরিদ্র পরিবারের শিশুদের প্রতিনিয়ত পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, বিশৃংখলা, নৈরাজ্যকর অবস্থার অবলোকন, অসৎ সঙ্গী-সাথীদের সাথে মেলামেশা, পিতা-মাতার অবজ্ঞা, অসচেতনতা, অজ্ঞতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সামাজিকীকরণ সংঘটিত হয় যার ফলে শিশু কিশোররা অপরাধ প্রবণ হয়ে পড়ে। বলা হয়, মানব ইতিহাসের উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সর্বোতমূখী সমৃদ্ধির প্রতিটি নব-নব পর্যায়ে গমন করছে, তা মানুষের জীবনবোধ, প্রয়োজনবোধ, জীবনচর্চা, শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা, ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধের পরিমিতি, সামষ্টিক কাঠামোকে পরিবর্তিত যেমন করছে, তার সাথে প্রতিটি মানুষকে পরিবর্তিত মানুষ রূপে

---

[৭] CUS, 1996, "Slum and Squatters in Dhaka: A Survey", *Center for Urban Studies*, University of Dhaka, Bangladesh.

[৮] Support for Basic Service in Urban Areas Project- 2004, Rajshahi City Corporation, Rajshahi.

[৯] আবুল বারাকাত, ২০০৩, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চালচিত্র ঃ কোথায় যেতে হবে কোথায় যাচ্ছি", ০২ জানুয়ারী, ২০০৩ তারিখে এফ.বি.সি.সি.আই. ও বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

[১০] James William Coleman and Donald R. Cressey, 1980, *"Crime and Delinquency"*, Harper & Row Publishers, New York, P. 378.

[১১] William C. Kvaraceus and Walter B. Miller, 1969, *"Norm Violating Behavior and Lower Class Culture"*, in eds. Ruth Shonle Caven, J.B. Lippincott Company, New York.

নতুন পরিবেশে অবতীর্ণ করাচ্ছে।[১২] কিন্তু এই পরিবর্তনের ছোঁয়া বস্তিবাসী নিম্নশ্রেণীর মানুষের উপর পড়েনা বলে মনে করা যেতে পারে। বেশীর ভাগ বস্তি এলাকা অত্যন্ত জনাকীর্ণ, প্রায় সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত এবং খুন, ধর্ষণ, মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদির কেন্দ্রস্থল। এসব সমস্যা শিশু কিশোরদের সামাজিকীকরণে বিরাট নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। তারা এসব ঘটনা দেখে এবং অন্যের প্রভাবে নিজেরাও এসব কর্মে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আশায় মাদক ব্যবসায়ীদের খপ্পরে পড়ে মাদকদ্রব্য চোরাচালানে সহায়তা করে এবং মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। এছাড়াও বাসস্থান ও পর্যাপ্ত বিনোদন অপ্রতুলতার কারণে কিশোররা দলবেধে রাস্তায় উশৃঙ্খলভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং মেয়েদের উত্যক্ত করে।[১৩] বস্তির এরূপ পরিবেশ অবলোকন করে Rahman বলেছেন, "In most of the slums deviant activities are nothing but a part of their way of life."[১৪]

বস্তি এলাকার একটি উল্লেখযোগ্য পরিমান শিশু-কিশোর শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত। এসমস্ত শিশু-কিশোররা শ্রম প্রদান করে যে অর্থ পায় তা বাবা-মা'কে দেবার পরও একটা অংশ নিজের কাছে রেখে দেয়। নগদ অর্থ হাতে পাওয়ায় বাবা-মা একদিকে যেমন তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করে দেয় অন্যদিকে নিজের সঞ্চিত অর্থ তারা সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়। নগদ অর্থ হাতে আসায় তারা নিজের ইচ্ছামত যেকোন পন্থায় অর্থ ব্যয় করতে শুরু করে। এভাবে অর্থ ব্যয় করতে গিয়ে তারা জুয়া খেলা, মদ্যপান, অশ্লীল ছবি দেখা, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা পাঠ ইত্যাদি অভ্যাস আয়ত্ব করে। এভাবে ক্রমে ক্রমে তারা অন্যান্য অসামাজিক কর্মেও লিপ্ত হয়ে পড়ে।[১৫] এছাড়া তারা মিথ্যা বলা, স্কুল পালানো, পকেটমার, চুরি, ছিনতাই, প্রেক্ষাগৃহে বা খেলার মাঠে স্বেচ্ছাচারিতা, পিতামাতার অবাধ্যতা, অস্বাভাবিক যৌন আচরণ, বেআইনি অস্ত্র রাখা, বোমাবাজি, মারামারি, জোর করে চাঁদা আদায়, খুন, রাহাজানি প্রভৃতি অপরাধসমূহও করে থাকে।

বর্তমানে নগরগুলোতে বস্তির পরিবৃদ্ধি পেয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে এবং এই সমস্ত বস্তিসমূহে কিশোর অপরাধের পরিবৃদ্ধিও আশংকাজনক। বর্তমান গবেষণা এলাকা রাজশাহী মহানগরী যেখানে সমগ্র নগরী জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে, কখনো কখনো রাস্তার পাশে রৈখিক আকারে বস্তিসমূহ গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত বস্তিসমূহের শিশু কিশোরদের অনেকে অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িত, যে সমস্ত কর্মকান্ড সংঘটনের প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন ধরণের। সে কারণে এখানকার বস্তি অঞ্চলে কিশোর অপরাধ সংঘটনের সামাজিক প্রেক্ষাপট উৎঘাটন ও সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গবেষণার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে

---

[১২] রনজিত কুমার দে, ২০০২, "একুশ শতকের শিক্ষা ও বাংলাদেশ", *শিক্ষাবার্তা*, ২২তম সংখ্যা।

[১৩] মোঃ আনোয়ার হাসেন, ২০০২, 'বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ঃ একটি পর্যালোচনা', সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, ৭ম সংখ্যা, পৃ. ২৪।

[১৪] Md. Abdur Rahman, 1998, *"Decline of Norms and Values and their impact on Davient Behavior in the slum of Rajshahi City: An Anthropological Approach"*, (Ph.D. Thesis) IBS, Rajshahi University, Bangladesh.

[১৫] আনোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

মনে করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বর্তমান গবেষণাটি একটি সময়োপযোগী প্রয়াস হিসাবে বিবেচনা করা যায়।

গবেষণার লক্ষ্যসমূহ

১. বাংলাদেশে বস্তি ও কিশোর অপরাধের সম্পর্ক উদঘাটন করা;
২. রাজশাহী মহানগরীর বস্তিতে বিরাজমান সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে আলোকপাত করা;
৩. রাজশাহীতে বস্তির সার্বিক সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে কিশোর অপরাধের সম্পর্ক খুজে দেখা; এবং
৪. রাজশাহীর বস্তিবাসী কিশোরদের বিচ্যুতি এবং অপরাধমূলক আচরণের ধরণ উৎঘাটন করা।

গবেষণার যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের নগরীয় লোকসংখ্যা অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে এবং বর্তমানে তা প্রায় ৩ কোটিতে এসে দাড়িয়েছে।[১৬] পাশ্চাত্যে স্বাভাবিক শিল্পায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে নগরীর লোকবৃদ্ধি ও নাগরিক সুবিধাদির সম্প্রসারণ ঘটলেও বাংলাদেশে এই নগরীর লোকবৃদ্ধি স্বাভাবিক নগরায়ন প্রক্রিয়া প্রসূত নয়। ফলে নগরীয় লোকসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে আনুষঙ্গিক নাগরিক সুবিধাদির সম্প্রসারণ হয়নি। তাই বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নগরায়ন ব্যাপক নগরীয় দারিদ্র্য এবং তার অনুসঙ্গী বস্তির বিস্তার ঘটাচ্ছে।[১৭] আমাদের বর্তমান গবেষণা এলাকা রাজশাহী মহানগরী যেখানে শতাধিক বস্তির অবস্থান রয়েছে এবং সমস্ত বস্তিবাসি লোকজন দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। পারিবারিক দারিদ্রতার কারণে শিশু-কিশোরদের নূন্যতম প্রয়োজন পূরণে অপারগতা, পারিবারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রভৃতি কারণে শিশু-কিশোরদের মনে হতাশা, প্রতিশোধ পরায়নতা, বৈধ বা অবৈধ পথে কোন কিছু পাবার প্রবণতার সৃষ্টি হয় যা তাদের অপরাধমূলক আচরণ সংঘটনে সহায়তা করে। অনেক চিহ্নিত অপরাধী বস্তিকে যেমন নিরাপদ আশ্রয় হিসাবে ব্যবহার করে তেমনি বস্তির শিশু-কিশোররা এই সমস্ত অপরাধীদের সংস্পর্শে আসে এবং অপরাধমূলক পরিবেশে তাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। বর্তমান গবেষণার মাধ্যমে বস্তির সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং ঐ সমস্ত প্রেক্ষাপটে সংঘটিত কিশোর অপরাধ সম্পর্কে সঠিক তথ্য উৎঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিশোর অপরাধ সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থ, গবেষণা প্রবন্ধ, বিভিন্ন প্রকাশনা রয়েছে। এগুলোর

---

[১৬] নজরুল ইসলাম, ২০০৩, "শহরে পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিস্কাষন ব্যবস্থা", *দৈনিক প্রথম আলো*, ৬ অক্টোবর, পৃ. ১১।

[১৭] ইন্দ্রজিত কুন্ডু, ১৪১০, "বাংলাদেশে নগরায়ন ঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা ও গতি প্রকৃতি", *আই.বি.এস. জার্নাল*, ১১তম সংখ্যা, পৃ. ২২৩।

কিছু রয়েছে পশ্চিমা বিশ্বের প্রেক্ষাপটে যেমন- Martin H. Neumeyer[১৮] এর Juvenile delinquency in Modern Society, Ruth Shonle Cavan[১৯] এর Juvenile Delinquency-Development, Treatment, Control, Don C. Gibbons[২০] এর Delinquent Behavior, Sheldon Glueck and Eleaner Glueck[২১] এর Family Environment and Delinquency, Brenda S. Griffin এবং Charls T. Giffin[২২] এর Juvenile Delinquency in Perspective ইত্যাদি। আবার কিছু রয়েছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, যেমন- Md. Abdur Rahman[২৩] এর Decline of Norms and Values and their impact on Deviant Behavior in the slum of Rajshahi City : An Anthropological Approach, Abul Kalam Md. Akhtarul Kabir[২৪] এর Juvenile Delinquency in Bangladesh : Law and Practice. মোঃ আনোয়ার হোসেন[২৫] এর বাংলাদেশের কিশোর অপরাধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ঃ একটি পর্যালোচনা। Sheikh Hafizur Rahman Karzon[২৬] এর Juvenile Delinquency, An imquiry into the causes ইত্যাদি। কিশোর অপরাধ সম্পর্কীত এই সমস্ত গবেষণা কর্ম থাকলেও বস্তির সামাজিক প্রেক্ষাপটে সংঘটিত অপরাধ, বিশেষ করে রাজশাহী মহানগরীর বস্তির সামাজিক প্রেক্ষাপট ও ঐ সমস্ত প্রেক্ষাপটে সংঘটিত অপরাধ সম্পর্কীত কোন গবেষণা নেই বললেই চলে। একটি সামাজিক সমস্যা হিসাবে কিশোর অপরাধের কারন উদ্‌ঘাটনপূর্বক প্রতিরোধের ব্যবস্থা বর্তমান সময়ের দাবি। আর এর জন্য প্রয়োজন সঠিক গবেষণা। আমাদের বর্তমান গবেষণাটি এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

গবেষণা পদ্ধতি ঃ

---

[১৮] Martin H. Neumayer 1949, *'Juvenile Delinquency in Modern Society'*, D Van Nostrend Company, Inc, New York.

[১৯] Ruth Shonle Cavan 1982, *'Juvenile Delinquency, Development, Treatment, Control'*, JB, Lippincott Company, New York.

[২০] Don C Gibbons 1970, *'Delinquent Behavior'*, Printice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.

[২১] Sheldon Glueck and Eleanor Glueck, 1962, *'Family Environment and Delinquency'*, Routledge, London.

[২২] Brenda S. Griffin and Charles T. Griffin 1976, *'Juvenile delinquency in Perspective'*, Harper and Row, New York.

[২৩] Md. Abdur Rahman 1998, *'Deline of Norms and Values and their impact on Devient Behavior in the slum of Rajshahi City : An Anthropological Approach'* (Ph.D. thesis), IBS Journal, Rajshahi University, Bangladesh.

[২৪] Abul Kalam Md. Akhtarul Kabir 1099, *'Juvenile delinquency in Bangladesh: Law and Practice'* (Ph.D. thesis) Law Department, University of Rajshahi, Bangladesh.

[২৫] মোঃ আনোয়ার হোসেন ২০০২, বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা ঃ একটি পর্যালোচনা, সামাজিক বিজ্ঞান জার্নাল, সপ্তম সংখ্যা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[২৬] Sheikh Hafizur Rahman Karzon 2003, 'Juvenile delinquency : An inquiry into the causes, Daily Star, 10th August.

বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রধান পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক জরিপ এবং সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার হয়েছে। বস্তি এলাকার সামাজিক প্রেক্ষাপট ও কিশোর অপরাধের ধরণ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যানুসন্ধানের জন্য সরাসরি শিশু-কিশোর ও তাদের অভিভাবকদের নিকট হতে মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরাসরি সাক্ষাৎকার এবং একটি কাঠামোগত প্রশ্নমালা এ গবেষণায় ব্যবহৃত হয়েছে। নমুনা একক নির্বাচনের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব প্রতিনিধিত্বশীল করার চেষ্টা করা হয়েছে। æSupport for Basic Service in Urban Areas Project-2004"[২৭] হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী রাজশাহী মহানগরীতে ৩০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২০টি ওয়ার্ডে বস্তির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এগুলো হলো- ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯ এবং ৩০নং ওয়ার্ড। এ সমস্ত ওয়ার্ডসমূহকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে ২, ৩, ৪, ৬ ও ৭নং ওয়ার্ড, দ্বিতীয় ভাগে ৯, ১১, ১২, ১৬ ও ১৭নং ওয়ার্ড, তৃতীয়ভাগে ১৮, ১৯, ২১, ২৩ ও ২৪নং ওয়ার্ড এবং চতুর্থ ভাগে ২৫, ২৬, ২৮, ২৯ ও ৩০নং ওয়ার্ডের অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। এরপর প্রতিটি ভাগ হতে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ১টি ওয়ার্ড নির্বাচন করে নির্বাচিত ওয়ার্ডের ১টি করে বস্তি গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। অর্থাৎ মোট ৪টি ওয়ার্ডের ৪টি বস্তির উপর বর্তমান গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। বস্তিগুলো হলো ৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্রীরামপুর বস্তি, ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের ভাড়ালিপাড়া বস্তি, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাজলা-রামচন্দ্রপুর বস্তি এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বুধপাড়া বস্তি। এই সমস্ত বস্তিসমূহে সরল দৈবচয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু কিশোরদের ১৭২ জন এবং অভিভাবকদের ৫৫ জনকে একক হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে।

রাজশাহী মহানগরীতে বস্তির সামাজিক প্রেক্ষাপট ও কিশোর অপরাধ

বস্তির সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে কিশোর অপরাধের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। কারণ বস্তির প্রায় সকল লোকজন দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে যার ফলে তারা তাদের জীবনের নূন্যতম চাহিদাগুলো পুরন করতে পারেনা। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সংস্থান করতে গিয়ে পরিবারে বাবা-মা বা অভিভাবকদের গৃহের বাইরে অবস্থান করতে হয় যার ফলে শিশু কিশোরদের সঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করতে পারেনা। নিু আয়মূলক পেশার সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলে সংসার ঠিকমত চলেনা। স্বাভাবিকভাবেই নিত্যদিনের অপ্রাপ্তির ভাগ এসে বর্তায় শিশু কিশোরদের উপরও। যখন এরূপ অবস্থা চলতে থাকে তখন শিশু কিশোররা নিজেদের আয় করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ফলশ্রুতিতে কখনো নিজেদের আগ্রহে কখনো পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সহায়তায় বিভিন্ন কাজে যোগদান করে। বস্তিতে বসবাসকারী লোকজন নিুশ্রেণীর সংস্কৃতির ধারক ও

---

[২৭] Support for Basic Service in Urban Areas Project- 2004, Rajshahi City Corporation, Rajshahi.

বাহক যার প্রত্যক্ষ প্রভাবে শিশু কিশোরদের পরিবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। সুতরাং শিশু কিশোরদের উপর পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাব, নিত্যদিনের অপ্রাপ্তি থেকে সৃষ্ট হতাশা, বস্তিতে অপরাধীদের বিচরণ, অসৎ সঙ্গী-সাথীদের সাথে চলাফেরা প্রভৃতি কারণে বস্তির শিশু কিশোররা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

বর্তমান গবেষণার অন্তর্ভূক্ত রাজশাহী মহানগরীর বস্তি এলাকার পারিবারিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রতিটি পরিবারই দারিদ্র্যবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করে। এখানকার শতকরা ৫৬.৯৮ ভাগ পরিবারের মোট মাসিক আয় ৩০০০.০০ টাকার নীচে (সারণী- ১)। এই দরিদ্রবস্থার কারণে শিশু কিশোরদের অভিভাবকরা তাদের মৌল চাহিদাগুলো পুরণ করতে পারেনা বিধায় তাদের মধ্যে না পাওয়ার হতাশা কাজ করে যার ফলশ্রুতিতে তার মানসপটে এক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এছাড়া শিশু কিশোররা যখন দেখে তারই পার্শ্ববর্তী উচ্চবিত্ত বা মধ্যবিত্ত পরিবারের একজন শিশু প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হচ্ছে তখন দরিদ্র পরিবারের এই সমস্ত শিশু কিশোরদের মনে এই না পাওয়ার হতাশা আরো বেশি প্রকট হয়ে দেখা দেয়। শিশু কিশোরদের প্রয়োজন পুরনে অভিভাবকদের অপারগতার কারণে নিজেরাই সেই প্রয়োজন পুরনের চেষ্টায় রত হয় অবৈধ কোন উপার্জনমূলক কাজে সম্পৃক্ত হয়ে কিংবা বাড়ি হতে টাকা-পয়সা বা অন্য কোন দ্রব্য চুরির মাধ্যমে।

সারণি ১ : শিশু কিশোরদের পরিবারের ধরণ ও সর্বমোট মাসিক আয় ভিত্তিক বিন্যাস

পরিবারের ধরণ	পরিবারের ধরণ				সর্বমোট	
সর্বমোট আয় (মাসিক)	একক		যৌথ			
	গণসংখ্যা	(%)	গণসংখ্যা	(%)	গণসংখ্যা	(%)
০০০-১০০০	৭	৪.০৭	১	০.৫৮	৮	৪.৬৫
১০০০-২০০০	৩৬	২০.৯৩	৫	২.৯১	৪১	২৩.৮৪
২০০০-৩০০০	৪২	২৪.৪২	৭	৪.০৭	৪৯	২৮.৪৯
৩০০০-৪০০০	২৬	১৫.১২	৫	২.৯১	৩১	১৮.০৩
৪০০০-৫০০০	১২	৬.৯৭	৫	২.৯১	১৭	৯.৮৮
৫০০০-৬০০০	৬	৩.৪৯	৪	২.৩৩	১০	৫.৮২
৬০০০-৭০০০	৬	৩.৪৯	২	১.১৬	৮	৪.৬৫
৭০০০-৮০০০	০০	.০০	২	১.১৬	২	১.১৬
৮০০০-৯০০০	০০	.০০	৩	১.৭৪	৩	১.৭৪
৯০০০ +	০০	.০০	৩	১.৭৪	৩	১.৭৪
মোট	১৩৫	৭৮.৪৯	৩৭	২১.৫১	১৭২	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

প্রতিটি বস্তির পার্শ্ববর্তী কিংবা সামান্য দুরে হলেও অভিজাত শ্রেণীর বসবাস রয়েছে। কিন্তু বস্তির খুব কম সংখ্যক মেয়েরা সেগুলোতে কাজ করে। যারা কাজ করে তারা একজনই

একাধিক বাসায় কাজ করে। পুরুষরা যারা আয়ের সাথে জড়িত তাদের পেশা অত্যন্ত নিম্মানের। সে কারণে তাদের আয় দিয়ে তারা কোন রকমে খেয়ে পরে দিনাতিপাত করতে পারে। গবেষণা এলাকার ৫৫ জন অভিভাবকের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, এখানকার ৭৪.৫৪% আয়কর্তা দিনমজুর, রিক্সা/ভ্যান চালক ও ছোটখাট ব্যবসার সাথে জড়িত (সারণী- ২)। যারা রিক্সা/ভ্যান চালায় তাদের অধিকাংশেরই রিক্সা/ভ্যান নিজের নয়। গ্যারেজ হতে দৈনিক একটি নির্দিষ্ট পরিমান টাকা (২০-৩০ টাকার মধ্যে) দিনশেষে গ্যারেজ মালিককে জমা দিতে হয়। দিনমজুর যারা তারা সে প্রতিদিন কাজ পায় তা-ও বলা যায়না। যেদিন তারা কাজ পায়না সেদিন তাদের পূর্বে জমানো টাকা খরচ করে কিংবা অর্ধাহারে কাটাতে হয়। এখানে ৬টি জেলে পরিবারের সদস্য রয়েছে যারা সম্পূর্ণরূপে তা পেশা হিসাবে ভাবতে পারেনা। কারন বছরের সব সময়ই নদীতে মাছ হয়না বিধায় এই সময় তারা দিনমজুর, রিক্সা চালনা কিংবা অন্য কোন কাজ করে জীবন অতিবাহিত করে। কাজের তাগিদে এখানকার অভিভাবদের গৃহের বাইরে অবস্থান করার কারণে সন্তানদের ঠিকমত খোজ খবরও তারা নিতে পারেনা।

সারণি ২: শিশু কিশোর অভিভাবকদের পেশার বিন্যাস

পেশা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
ব্যবসা	১৪	২৫.৪৫
দিনমজুর	১৭	৩০.৯১
রিক্সা/ভ্যান চালক	১০	১৮.১৮
গৃহিণী	৪	৭.২৭
চাকুরী	১	১.৮২
জেলে	৬	১.৮২
অবসর	১	১০.৯১
অন্যান্য	২	৩.৬৪
মোট	৫৫	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

গবেষণার অন্তর্ভূক্ত শিশু কিশোরদের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এখানকার প্রায় ৭৮% শিশু কিশোর পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য বিভিন্ন ধরনের নেশাদ্রব্য গ্রহণ করে থাকে (সারণী- ৩)। এ সমস্ত নেশা দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে বিড়ি, সিগারেট, তাড়ি, গাঁজা, মদ, হেরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। এরমধ্যে বিড়ি, সিগারেট খাওয়ার পরিমান সবচেয়ে বেশি। পরিবারের সদস্যদের নেশাদ্রব্য গ্রহণের এই আচরণ অনুকরণ এবং সঙ্গী-সাথীদের সাথে মেলামেশা কিংবা কৌতুহলের বশবর্তী হয়ে এখানকার প্রায় ৪৪% শিশু কিশোর নেশাদ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে (সারণী- ৪)। ২ জন শিশু কিশোরের সন্ধান পাওয়া গেছে যারা নেশা হিসাবে হিরোইন সেবন করেছে। গবেষণা এলাকায় ৯টি পরিবারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যারা মাদকদ্রব্যের ব্যবসার সাথে জড়িত এবং ৬টি পরিবার শিশু কিশোরদের প্রত্যক্ষভাবে মাদকদ্রব্য ব্যবসার কাজে ব্যবহার করে। যে সমস্ত পরিবার

মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত তাদের গৃহে নেশাকারীদের আড্ডা নিয়মিত সেখানে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা মাঝে মাঝে অংশগ্রহণ করে। যে সমস্ত শিশু কিশোর প্রত্যক্ষভাবে মাদকদ্রব্য ব্যবসার কাজে সহযোগিতা করে তারা ঐসমস্ত চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের সান্নিধ্যে আসে এবং তাদের নিকট হতে কার্যক্রমের বর্ণনা শুনে সে সমস্ত কাজে আগ্রহী হয়ে উঠে। যেহেতু শিশু কিশোররা অনুকরণপ্রিয় সে কারণে অপরাধীদের কার্যক্রমও তারা অনুকরণ করবে।

সারণি ৩{ শিশু কিশোর পরিবারের সদস্যদের নেশাগ্রস্থতা

নেশা করে কি-না	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৩৪	৭৭.৯১
না	৩৮	২২.০৯
মোট	১৭২	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

সারণি ৪: শিশু কিশোররা নেশা করে কি-না তার বিন্যাস

নেশা করে কি-না	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৫	৪৩.৬০
না	৯৭	৫৬.৪০
মোট	১৭২	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

এখানকার সামাজিক পরিবেশে উল্লেখ করার মত একটি অপরাধমূলক পরিস্থিতি হলো এলাকায় নিয়মিত জুয়ার আড্ডা বসা। উত্তরদাতা শিশু কিশোরদের মধ্যে প্রায় ৫৭% বলেছে তাদের এলাকায় নিয়মিত জুয়ার আড্ডা বসে। ২২ জন জানিনা উত্তর দেবার মাধ্যমে বিষয়টি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে (সারণী- ৫)। বস্তি এলাকায় নির্দিষ্ট কতগুলো বাড়ি রয়েছে যেগুলোতে নিয়মিত সেই আড্ডাগুলো বসে। এছাড়া বিভিন্ন সময় এলাকার বিভিন্ন স্থানে অনিয়মিত এই আড্ডাগুলো বসে। নিয়মিত, অনিয়মিত এই আড্ডায় নিয়মিত বা মাঝে মাঝে গমন করে ৪২ জন (৩২.০৬%) শিশু কিশোর (সারণী- ৬)।

সারণি ৫ : বস্তি এলাকায় জুয়ার আড্ডা বসে কি-না তার বিবরণ

বিবরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৯৮	৫৬.৯৮
না	৫২	৩০.২৩
জানিনা	২২	১২.৭৯
মোট	১৭২	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

সারণি ৬ : জুয়ার আড্ডায় শিশু কিশোরদের গমন সম্পর্কীত বিন্যাস

আড্ডায় গমণের পরিমান	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মাঝে মাঝে যায়	৩০	২২.৯০

প্রায়ই যায়	১২	৯.১৬
যায়না	৮৯	৬৭.৯৪
মোট	১৩১	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

যে সমস্ত শিশু কিশোররা আড্ডায় অংশগ্রহণ করে তারা নিজস্ব বস্তি ছাড়াও অন্যান্য স্থানে জুয়ার আড্ডায় অংশগ্রহণ করে। এই সমস্ত আড্ডায় প্রধানত কিশোর ও মধ্যবয়সীরা বেশি পরিমানে অংশগ্রহণ করে। জুয়ার আড্ডার মত এলাকায় মাদক সেবনেরও নির্দিষ্ট জায়গা লক্ষ্যণীয়। এই সমস্ত জায়গাকে মাদকসেবীরা নিরাপদ বলে মনে করে। কারন এই সমস্ত জায়গায় খুব কম সময়ই পুলিশ প্রশাসন হস্তক্ষেপ করে। যদিও মাঝে মাঝে পুলিশের হস্তক্ষেপে জুয়াড়ী বা মাদকসেবীদের ধরে আনা হয় তবে তার পরিমান খুব কম এবং যাদের ধরে আনা হয় তাদের খুব অল্প সময়ের মধ্যে ছেড়ে দেয়া হয়। কারন হিসাবে পুলিশের উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। গবেষণা অন্তর্ভূক্ত শিশু কিশোরদের মধ্যে ১২৩ জন (৭১.৫১%) মাদক সেবনের নির্দিষ্ট জায়গা আছে বলে উল্লেখ করেছে (সারণী-৭)। এই নির্দিষ্ট জায়গাগুলো হলো কোন নির্দিষ্ট বাড়ি, নদী বা রেল লাইনের ধার ইত্যাদি। সাধারণতঃ বাড়িগুলোর আড্ডা নিয়মিত এবং অনিয়মিত আড্ডাগুলো বসে রেল লাইন বা নদীর ধারে। মাদকের এই নিয়মিত বা অনিয়মিত আড্ডায় গবেষণা অন্তর্ভূক্ত শিশু কিশোরদের ২৮ জন অংশ গ্রহণ করে (সারণী- ৮)।

সারণি ৭ : বস্তিতে মাদক সেবনের নির্দিষ্ট জায়গা সম্পর্কীত বিন্যাস

মাদক সেবনের নির্দিষ্ট জায়গা আছে কি-না	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১২৩	৭১.৫১
না	৪১	২৩.৮৪
জানিনা	৮	৪.৬৫
মোট	১৭২	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

সারণি ৮ : শিশু কিশোরদের মাদক সেবনের আড্ডায় গমণ সম্পর্কীত বিবরণ

বিবরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২৮	২১.৩৭
না	১০৩	৭৮.৬৩
মোট	১৩১	১০০.০০

বিঃদ্রঃ (১৭২-১৩১) = ৪১ জন ১০ বছরের নিচে শিশু রয়েছে যারা সারণিবহির্ভূত।

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

বিভিন্ন ধরনের আড্ডায় অংশগ্রহণকারী শিশু কিশোররা বখাটে টাইপের এবং তাদের মধ্যে ১০ জন (১৬.৬৭%) পতিতাদের সাথে কোন না কোন সময়ে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে (সারণী- ৯)। তারা অধিকাংশ সময়ই এক বা একাধিক বন্ধুদের সাথে পতিতাদের নিকট যায় এবং সম্পর্ক গড়ে তোলে। তারা যে সমস্ত পতিতাদের সাথে মেশে তার বিনিময়ে

তাদের টাকা দিতে হয়। শিশু কিশোররা যে সমস্ত পতিতাদের সাথে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে ঐ সমস্ত পতিতারা সবসময় যে বস্তির একটি গৃহে অবস্থান করে তা নয়। বরং তারা অনেকে বস্তির স্থায়ী বাসিন্দা নয়। এরা অল্প সময়ের জন্য কোন একটি গৃহে অবস্থান করে এবং সুযোগ বুঝে স্থান পরিবর্তন করে। এদেরকে ভাসমান পতিতা বলেও আখ্যায়িত করা যায়। বস্তিতে স্থায়ী পতিতাও রয়েছে। গবেষণা অন্তর্ভূক্ত ১৭২ জন শিশু কিশোরের মধ্যে ৬০ জন বলেছে তাদের বস্তিতে স্থায়ী বা অস্থায়ী পতিতাদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় (সারণি ১০)।

সারণি শিশু কিশোররা পতিতাদের নিকট যায় কি-না তার বিবরণ

বিবরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১০	১৬.৬৭
না	৫০	৮৩.৩৩
মোট	৬০	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

সারণি ১০ : বস্তিতে পতিতার অবস্থান সম্পর্কিত বিন্যাস

পতিতা আছে কি-না	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৬০	৩৪.৮৮
না	১০০	৫৮.১৪
জানিনা	১২	৬.৯৮
মোট	১৭২	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

মাদক, জুয়ার আড্ডা বা পতিতাদের নিকট গমণসহ অন্যান্য যে সমস্ত অপরাধমূলক কার্যাবলী শিশু কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত হয় সেগুলোর অধিকাংশই তারা দলের মাধ্যমে করে থাকে। সংগঠিত অপরাধচক্রের শিশু কিশোরদের কৌশলে কিংবা টাকার লোভ দেখিয়ে তাদের কার্যগুলো সম্পাদন করে নেয়ার সুযোগ থাকে যার কারণে তারা সে সুযোগ গ্রহণও করে। এখানকার শিশু কিশোররা সঙ্গী-সাথীদের অপরাধমূলক কার্যবালীর সাথে সম্পৃক্ত থাকার কথা জিজ্ঞাসা করায় তাদের অনেকেই (৫৩.৪৯%) সে কথা উল্লেখ করেছে (সারণি ১১)। কিছু অংশ বিষয়টি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। যারা বিষয়টি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে তাদের বয়স ১৫-১৮ বছর বয়সের মধ্যে এবং কাজগুলো তারা জেনেশুনেই করে বিধায় তারা তা গোপন করার চেষ্টা করেছে। উত্তরদাতা এই সমস্ত শিশু কিশোরদের মধ্যে যে ৯২ জন তাদের সঙ্গী-সাথী অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত বলে উল্লেখ করেছে তাদের মধ্যে ঐসমস্ত সঙ্গী-সাথীদের সাথে সময় কাটানোর ক্ষেত্রে তারতম্য আছে। দেখা যায় ৪৩ জন (৪৬.৭৩%) শিশু কিশোর ১-২ ঘন্টা সময় সঙ্গী-সাথীদের দেয়। এই সমস্ত শিশু কিশোরদের অধিকাংশই পড়াশুনা করে কিংবা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত থাকায় সঙ্গীদের তেমন সময় দিতে পারেনা। তবে ২২ জন (২৩.৯২%) শিশু কিশোর রয়েছে যারা ৫+ ঘন্টা সময় সঙ্গী সাথীদের সাথে ঘুরে বেড়ায় (সারণি ১২)।

সারণি ১১ : শিশু কিশোর সঙ্গী-সাথীদের অপরাধের সাথে সম্পৃক্ততার বিন্যাস

অপরাধমূলক কাজে সম্পৃক্ত কি-না	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৯২	৫৩.৪৯
না	৬৭	৩৮.৯৫
জানিনা	১৩	৭.৫৬
মোট	১৭২	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

সারণি ১২ : শিশু কিশোরদের সঙ্গী-সাথীদের সাথে সময় কাটানোর বিন্যাস

কাটানো সময় (২৪ ঘন্টায়)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
১-২ ঘন্টা	৪৩	৪৬.৭৩
৩-৪ ঘন্টা	২৭	২৯.৩৫
৫-৬ ঘন্টা	১১	১১.৯৬
৭+	১১	১১.৯৬
মোট	৯২	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

সঙ্গী সাথীদের সাথে যারা দীর্ঘ সময় ঘোরাফেরা করে তাদের অনেকে অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে অবস্থান করে বাবা-মার কথা উপেক্ষা করে। অনেকে বাবা-মাকে না বলে বাড়ির বাইরেও রাত্রি যাপন করে। বস্তিতে বসবাসরত এই সমস্ত শিশু কিশোরদের মধ্যে কেউ কেউ চোরাকারবারের সাথে জড়িত। অভাবের তাড়নায় হোক আর চোরাকারবারী বৃহৎ কোন সিন্ডিকেটের সহযোগিতার কারণেই হোক তারা বস্তিতে এই ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। রাজশাহী মহানগরীতে পদ্মার ধারের বস্তিসমূহের লোকজন চোরাকারবারের সাথে বেশি মাত্রায় জড়িত। গবেষণা অন্তর্ভূক্ত বস্তিসমূহের শতকরা ৪২.৪৪ ভাগ শিশু কিশোর বস্তিতে চোরাকারবারীদের অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছে (সারণী- ১৩)। চোরাইমালের মধ্যে রয়েছে কাপড়, চিনি, লবণ, বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য যেমন- ফেনসিডিল, তাড়ি, গাজা ইত্যাদি। এই সমস্ত মালামাল সীমান্তের ওপার (ভারত) হতে সাধারণতঃ বড়রা পারাপার করে থাকে। তবে শিশু কিশোররা তা বহনে সহায়তা করে। যারা এই সমস্ত চোরাই মালের ব্যবসা করে তারা অনেক সময়ই পুলিশ বা বিডিআর এর নিকট ধরা পড়ে। বেশি সময় তারা আটকা থাকেনা, সহযোগিরা তাদের ছাড়িয়ে আনে। এক্ষেত্রে প্রশাসনের ঘুষ গ্রহণের কথা উত্তরদাতাগণ উল্লেখ করেছে। গবেষণা এলাকার ১৬ জন (৯.৩০%) শিশু কিশোর রয়েছে যারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পুলিশের নিকট ধরা

পড়েছে (সারণী- ১৪)। এই সমস্ত কারণের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন স্থানে মারামারি করা, নেশাদ্রব্য গ্রহণ, চোরাইমাল বহনে সহায়তা করা ইত্যাদি।

সারণি ১৩ : বস্তিতে চোরাকারবারীদের অবস্থানের বিবরণ

বিবরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	৭৩	৪২.৪৪
না	৭৭	৪৪.৭৭
জানিনা	২২	১২.৭৯
মোট	১৭২	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

সারণি ১৪ : শিশু কিশোররা পুলিশের নিকট ধরা পড়েছে কি-না তার বিবরণ

বিবরণ	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৬	৯.৩০
না	১৫৬	৯০.৭০
মোট	১৭২	১০০.০০

উৎস ঃ মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য, ২০১০

সুতরাং বর্তমান গবেষণায় দেখা যায়, প্রাপ্ত বয়স্ক সদস্য যারা তারা দিনমজুর, রিক্সা-ভ্যানচালক, ছোটখাট ব্যবসা প্রভৃতি নিম্নআয়মূলক পেশার সাথে জড়িত। ফলশ্রুতিতে পারিবারিক দরিদ্র্যতার কারণে শিশু কিশোরদের মৌল চাহিদাসহ নিত্য দিনের যে প্রয়োজন তা পূরন করা সম্ভব হয়না। এই অপারগতা প্রত্যক্ষণ করে শিশু কিশোররা নিজেরাই আয় করার চেষ্টায় রত হয় এবং উপার্জনের বৈধ পথ সবার সামনে খোলা না থাকায় এবং অনেক বেশী অর্থ উপার্জনের আশায় চুরি, ছিনতাই, পকেটমার প্রভৃতি কর্মকান্ডের সাথে জড়িয়ে পড়ে। বস্তির গৃহগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে তৈরী ও সংকীর্ণ। গৃহের অভ্যন্তরস্থ ও বস্তি এলাকায় চলাচলের জন্য যে পথ সেগুলোও অত্যন্ত নিম্নমানের ও সংকীর্ণ যার প্রত্যক্ষ নেতিবাচক প্রভাব পড়ে শিশু কিশোরদের মানসিকতার উপরে। পেশাগত কারণে এখানকার পিতা-মাতা বা অভিভাবকরা গৃহের বাইরে অবস্থান করে বিধায় শিশু কিশোরদের উপর সঠিকভাবে নজর দিতে পারেনা। ক্রমেই তাদের উপর পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ অবস্থায় শিশু কিশোররা অন্যান্য অপরাধী সঙ্গী-সাথীদের সাথে মিশে ঝাগড়া-বিবাদ, মারামারি, দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ানো, মেয়েদের উত্যক্ত করা, সিগারেট খাওয়া, বিভিন্ন নেশাদ্রব্য গ্রহণ করা প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য যে, শিশু কিশোরদের মধ্যে যারা সঙ্গী-সাথীদের সাথে খুব বেশি সময় কাটায় তারা কাজ কিংবা লেখাপড়া কোনটিই করেনা এবং এরা বখাটে প্রকৃতির ও উশৃঙ্খলভাবে ঘুরে বেড়ানোই এদের কাজ। গবেষণা এলাকার যে সমস্ত পরিবার মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত

তারা শিশু কিশোরদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে কাজে ব্যবহার করে যার পরিনাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কারন চিহ্নিত অপরাধীদের কাছে অপরাধমূলক কর্মকান্ডের বর্ণনা শুনে সে সমস্ত কর্মকান্ডে নিজেদের উৎসাহী করে তোলে। এক্ষেত্রে তাদের অনুকরণপ্রিয়তা ও দুঃসাহসিকতা শিশু কিশোরদের ঐসমস্ত অপরাধমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে তোলে। গৃহ পরিবেশের অতি সংকীর্ণতার কারণে শিশু কিশোরদের অনেকে নিজের গৃহে রাত্রিযাপন করতে পারেনা। তারা গৃহের বাইরে অন্যের গৃহে, দোকানঘরে রাত্রিযাপন করে যার ফলে তাদের সামনে চোরাকারবারী, চুরিকরা, ছিনতাই করা, পতিতালয়ে গমনের মত কাজ করার পথ উন্মুক্ত থাকে ফলে খুব সহজে তারা সে সমস্ত কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে।

উপসংহার

"বাংলাদেশে বস্তির সামাজিক প্রেক্ষাপট ও কিশোর অপরাধের ধরণ ঃ রাজশাহী মহানগরীতে পরিচালিত একটি সমীক্ষা" শিরোনামে পরিচালিত গবেষণায় বাংলাদেশে বস্তি ও কিশোর অপরাধের সম্পর্ক, রাজশাহী মহানগরীতে বস্তির ব্যপ্তি ও প্রেক্ষিত, বস্তিতে বিরাজমান সামাজিক পরিবেশ, বস্তির সার্বিক সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে কিশোর অপরাধের সম্পর্ক এবং বস্তিবাসী কিশোরদের বিচ্যুতি ও অপরাধমূলক আচরণের ধরণ উদঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, বস্তিতে বসবাসকারী লোকজন প্রতিনিয়ত অভাব-অনটনের মধ্যদিয়ে জীবনযাপন করে। রাজশাহী মহানগরীতে বস্তির প্রায় প্রতিটি পরিবার দরিদ্রসীমার নীচে বসবাস করে। পরিবারের যে আয় সে অনুযায়ী পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি। পরিবারে যারা আয় করে তাদের পেশা দিনমজুর, রিক্সা-ভ্যান চালক, ছোটখাট ব্যবসা প্রভৃতি নিু আয়মূলক। অভিভাবকরা তাদের পেশাগত কারণে সন্তানদের সঠিক তত্ত্বাবধান করতে পারেনা যার ফলে তারা যথেচ্ছা সঙ্গী-সাথীদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। তারা বখাটে সঙ্গী-সাথীদের সাথে মেশে, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নেশাগ্রস্থতা দেখে, পরিবারের সদস্যদের নেশাদ্রব্যের ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার কারণে কিংবা কৌতুহল বশবর্তী হয়ে বিড়ি, সিগারেট, গাজা, তাড়ি, ফেনসিডিল ইত্যাদি নেশাদ্রব্যে অভ্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে ২১ ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। এগুলো হলো ঃ (১) বাড়ি হতে টাকা-পয়সা ও অন্যান্য জিনিসপত্র চুরি করা, (২) অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে অবস্থান করা, (৩) গৃহের বাইরে রাত্রি কাটানো, (৪) অতিরিক্ত সিডি ও টেলিভিশন দেখা, (৫) অতিরিক্ত সিনেমা দেখা, (৬) নেশাদ্রব্য (হেরোইন, ফেনসিডিল) গ্রহণ করা, (৭) ধূমপান (বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা) করা, (৮) পতিতাদের সাথে মেশা, (৯) চোরাকারবারে সহায়তা করা, (১০) আইন-কানুনকে পরোয়া না করা, (১১) জুয়া খেলা, (১২) বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে বের হয়ে অন্যত্র ঘুরে বেড়ানো, (১৩) যথেচ্ছা সঙ্গী-সাথীদের সাথে ঘুরে বেড়ানো, (১৪) দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ানো, (১৫) মারামারি করা, (১৬) রাস্তায় মেয়েদের উত্যক্ত করা, (১৭) ছিনতাই করা, (১৮) অন্যের গাছের ফল চুরি করা, (১৯) নিয়মিত রাজনৈতিক মিছিল-মিটিং-এ অংশগ্রহণ করা, (২০) অবৈধ অস্ত্র কাছে রাখা, (২১) মিছিলে ককটেল নিক্ষেপ করা।

বর্তমান গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে কিছু নীতি-নির্ধারণী বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন-রাজশাহী মহানগরীতে বস্তির গৃহ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন, এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরা যাতে অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে না পড়ে সে ব্যবস্থা এবং বস্তিতে চিহ্নিত অপরাধীদের বসবাস রোধ ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটানো যেতে পারে, বস্তিবাসী লোকজনের উপার্জনের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন যা তাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণসহ জীবনমান বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে, এখানকার শিশু কিশোর ও অভিভাবকদের সঠিক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন যা তাদের অপরাধমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে এবং একই সাথে শিশু কিশোরদের চিত্তবিনোদনের জন্য সঠিক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা প্রয়োজন যা তাদের উশৃঙ্খল ও দলবদ্ধভাবে ঘুরে বেড়ানো রোধ করবে।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

মাজারকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকাচার

ইকবাল হুসাইন*

Abstract: Most of the ancient Mazars (Mausoleum) have been built after death of the Pir-Sufis, (saints) or religious preachers at the early stage of Islam in Bengal. The graves of these Sufis have been converted into Mazars by their followers. This was the beginning of Mazar-culture in Bangladesh. Then Mazars have been made through different ways including fraudulence. Actually there is an uncountable number of Mazars in Bangladesh. There are many belieifs, practices, customs and superstitions about Mazar. In this paper, the author tries to show how Mazar-culture has developed in Bangladesh.

ভূমিকা

বাংলাদেশ লোকসংস্কৃতির এক উর্বর ক্ষেত্র। নানা ধরনের লোকবিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার, লোকউৎসব বাংলার লোকসংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলার মাজার সংস্কৃতি মূলত লোকসংস্কৃতিরই একটি অনন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারা বা দিক। মাজার সংস্কৃতিকে ঘিরেও বিভিন্ন লোকবিশ্বাস-সংস্কার, লোকাচার, লোকচিকিৎসা, লোকউৎসব, গান ইত্যাদি উপাদানের চর্চা ও বিকাশ হচ্ছে। এগুলো এদেশের সংস্কৃতিকে কেবল ঐতিহ্যমণ্ডিত করেনি, ঐশ্বর্যমণ্ডিতও করেছে। যুগ যুগ ধরে লালিত এসব বিশ্বাস, প্রথা, মূল্যবোধ, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, সামাজিক সম্পর্ক বাংলার লোকসংস্কৃতিকে অনন্য সাধারণ করে তুলেছে। জাতীয় চেতনা এবং ঐতিহ্যের সাথে এর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। মাজার সংস্কৃতির সাথে লোকায়ত সমাজের বাস্তব জীবনবোধের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। মানুষ তার জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে বাস্তবতার মুখোমুখি হয় বেশির ভাগ সময় তা কঠিন এবং নির্মম। এর থেকে মুক্তি বা পরিত্রাণের জন্য মানুষ সবসময় একটি সহায়ক মাধ্যম খোঁজে। একটি বিকল্পকে আশ্রয় করে মানুষ বাঁচতে চায়, এগিয়ে যেতে চায় সামনের দিকে। মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা লোকসংস্কৃতি বিশ্লেষণ করলে এ চিত্রই প্রতীয়মান হয়।

---

* ড. ইকবাল হুসাইন, সহকারী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান), ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

প্রাচীনকাল থেকেই মাজারকে কেন্দ্র করে নানা সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-বিশ্বাস ইত্যাদি প্রচলিত আছে। উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ) এর মাজার। সেখানেও নানা আচার-প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত মাজারসংস্কৃতি সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়েছে বিচিত্রসব বিশ্বাস, সংস্কার ও লোকাচারকে ঘিরে। বাংলাদেশে মাজারসংস্কৃতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হিসেবে সুফিদের আগমন ও ইসলাম প্রচার এবং তাদের অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভক্তরা বিশ্বাস করেন, সুফি কিংবা পীর-ওলীদের মাধ্যমেই মুক্তি এবং স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব। তারা আরো বিশ্বাস করেন, সুফি কিংবা পীর-ওলীদের মৃত্যু নেই। ইহলোক ত্যাগের (মৃত্যুর) পরেও তারা ভক্তের ডাক শুনতে পান, ডাকে সাড়া দেন এবং মুক্তির পথ দেখান। এ কারণেই সুফি কিংবা পীর-ওলীদের মৃত্যুর পরে তাদের মাজারে ভক্ত-অনুরাগী এমনকি অনেক সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন ও ভক্তি প্রদর্শন করেন। সুফি, পীর-ওলী বা সাঁইয়ের প্রতি নানা বিশ্বাস, ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং এগুলো নিবেদনের জন্য বিভিন্ন আচার-আচরণের সমন্বয়েই মাজারকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকাচার তৈরি হয়।

আমাদের জানা মতে, বাংলাদেশের মাজারগুলোর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে লোকবিশ্বাস, লোকাচার নিয়ে খুববেশি গবেষণা পরিচালিত হয়নি। ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের 'বঙ্গে সুফি প্রভাব' (১৯৩৫), মওলানা রুহুল আমীনের এর 'বঙ্গ ও আসামের পীর আওলিয়া কাহিনী' (১৩৪২ বাং), সুরাইয়া বেগম ও হাসিনা আহমেদের 'মাজার সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ' (১৯৯০), গিরীন্দ্রনাথ দাসের 'বাংলা পীর সাহিত্যের কথা' (১৯৯৮), চৌধুরী শামসুর রহমানের 'সুফিদর্শন' (২০০২) সহ বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধে সুফিদর্শনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, পীর-ওলীদের জীবন ও কর্ম, তরিকা, ইসলাম প্রচার, সাধনা, কারামত কিংবা একটি নির্দিষ্ট মাজারের বিশেষকিছু বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে মাজারকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও লোকাচার বিষয়ে গবেষণামূলক বিশ্লেষণী আলোচনা করা হয়েছে। এখানে উপস্থাপিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে ক্ষেত্রসমীক্ষা (Field survey) পদ্ধতির আলোকে। ক্ষেত্র সমীক্ষার আওতায় এখানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ (Direct participation & Observation), সাক্ষাৎকার (Interview) পদ্ধতি/কৌশলেরও প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশের কয়েকটি প্রখ্যাত মাজার যেমন চট্টগ্রামের বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এবং শাহ আমানত (রঃ), ঢাকার শাহ আলী (রঃ) এবং শরফুদ্দীন চিশতী (রঃ), সিলেটের হযরত শাহ জালাল (রঃ) এবং শাহ পরাণ (রঃ), রাজশাহীর শাহ মখদুম (রঃ), বাগেরহাটের খান জাহান আলী (রঃ) এর মাজারসহ বিভিন্ন অঞ্চলের বেশকিছু ছোট, অখ্যাত এমনকি নতুন মাজার থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তথ্যের জন্য মাজারের মোতওয়াল্লি, খাদেম, বাউল-ফকির, আগত ভক্ত-দর্শনার্থী অর্থাৎ মাজারসংশ্লিষ্ট সব শ্রেণির মানুষের সাথেই কথা বলা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০০৩ থেকে জুলাই ২০০৬ এর মধ্যে ওরসসহ বিভিন্ন সময়ে টানা

কয়েকদিন মাজারে অবস্থান করে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও নিজস্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যও বর্তমান প্রবন্ধকে সমৃদ্ধ করেছে।

মাজারকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

সাধারণত লোকবিশ্বাস বলতে মানুষের মাঝে প্রচলিত বিশ্বাসকে বোঝানো হয়। এ বিশ্বাসের মূলে সব সময় বৈজ্ঞানিক যুক্তি বা কার্যকারণ সম্পর্ক না ও থাকতে পারে। লোকসংস্কারের সাথে লোকবিশ্বাসের ব্যাপক সাদৃশ্য ও সম্পৃক্ততা রয়েছে। তবে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার এক নয়। লোকবিশ্বাস সংহত সমাজের বহুসংখ্যক মানুষের মনে স্থান করে নেয়। লোকবিশ্বাস যুগ যুগ ধরে মানুষের মধ্যে প্রচলিত থাকতে পারে, আবার সাম্প্রতিক কালেরও হতে পারে। আল্লাহ বা ঈশ্বর আছেন, এটি একটি বিশ্বাস। একজন ধার্মিকের জন্য এ বিশ্বাস যথার্থ হলেও যথেষ্ট নয়। নিজের আচার-আচরণ এবং নানাবিধ ক্রিয়ায় এ বিশ্বাসের প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। একটি বিশ্বাস প্রতিদিনের আচরণে সংস্কাররূপে চরিত্রে সুপ্রোথিত হয়। বিশ্বাস প্রাথমিকভাবে একটি মানসিক প্রক্রিয়ামাত্র। 'লোক' এর সৃষ্টি লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রথম দিকে লোক বলতে বোঝাত গ্রামীণ কৃষিসমাজ আর লোকসংস্কৃতি ছিল মৌখিক শিল্প অর্থাৎ মৌখিক সাহিত্যমাত্র[১]। কিন্তু লোক এর সংজ্ঞা পালটেছে। লোকসংস্কৃতি কেবল গ্রামীণ নয়, শহরে-নগরেও এর উৎপত্তি হতে পারে। এ সংস্কৃতি স্থাবর নয়, জঙ্গম। প্রতিনিয়ত এর এর নিত্যনতুন রূপ তৈরি এবং পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এ কথা আজ সর্বজন স্বীকৃত যে, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির শেকড় লোকসংস্কৃতিতে প্রোথিত। শহর-নগরের শিক্ষিত মানুষের মধ্যেও লোকসংস্কৃতি বিস্তার লাভ করতে পারে। মার্ক্সীয় দার্শনিকদের মতে শ্রমিকরা 'লোক' এবং তাদেরও লোকসংস্কৃতি আছে। লোকসংস্কৃতির সীমা কেবল গ্রাম নয়; শহর-নগরে, কলে-কারখানায়ও এ সংস্কৃতি তৈরি হয়[২]।

লোকবিশ্বাসের প্রতিশব্দ হিসেবে ইংরেজিতে 'Folkbelief' শব্দটি চালু আছে। কিন্তু বিশ্বাস শব্দটিকে এখানে সংস্কার অর্থেও প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে মনে রাখতে হবে লোকবিশ্বাস মূলত লোকসংস্কারের একটি স্তরমাত্র[৩]। লোকবিশ্বাস সম্পর্কে Carveth Read তাঁর Man and his superstitions গ্রন্থে বলেছেন,

> Folk belief is the attitude of mind in which perceptions are regarded as real judgment as true or matters fact actions and events as about to have certain results. It is a series and respectful attitude; for matter of fact compels us to adjust our behaviour to it, whether we have power to alter it or not[4].

আবদুল হাফিজ এর মতে একটি বিশ্বাস একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মনে যতক্ষণ অবস্থান করে ততক্ষণ তা লোকবিশ্বাসই বটে। কিন্তু যে মুহূর্তে তা সামাজিক স্বীকৃতি পায়, যূথবদ্ধ মানুষের কার্যকলাপে যথার্থ স্ফূর্তি লাভ করে তখন তা পরিণত হয় লোকসংস্কারে[৫]। এ সংজ্ঞার সাথে দ্বিমত পোষণ করে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী বলেছেন,

সংহত সমাজের মানুষের মনে স্থান না করে নিতে পারলে বিশ্বাস কখনো লোকবিশ্বাস হতে পারে না। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সাথে লোকবিশ্বাসের মূল পার্থক্য এখানেই[৬]। সংহত এক জনসমষ্টি যে বিশেষ বিশেষ আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলোর সঙ্গে শুভাশুভ বোধ জড়িত তাই হল লোকবিশ্বাস। লোকবিশ্বাসের সাথে ঐতিহ্যের সম্পর্ক খুবই কম, নেই বললেই চলে। লোকবিশ্বাস খুব সাম্প্রতিক কালেরও হতে পারে[৭]। লোকবিশ্বাস ব্যক্তির নয়, একটি দল, গোত্র, সম্প্রদায়, উপজাতি বা সমাজের বিশ্বাস। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকবিশ্বাসের কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। তবুও শিক্ষিত মানুষের মনে লোকবিশ্বাস সম্পূর্ণ অনুপস্থিত– এ কথা বলা যাবে না।

পৃথিবীর সবদেশের সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমাজের মানুষই লোকসংস্কারে বিশ্বাসী[৮]। আবদুল হাফিজ আরো মনে করেন, লোকসংস্কার প্রধানত নিরক্ষর সমাজে (Non-literate society) ও অল্পাধিক পরিমাণে সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে (Civilised and literate) প্রচলিত সমস্ত বাহ্যিক কর্মকাণ্ড, যথা অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচরণাদি এবং মানসিক ক্রিয়াদি যথা ধারণা, বিশ্বাস প্রবণতা ও সহজাত প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে এমন সব উপাদানের নাম যার মধ্যে যুক্তি (Reason) অপেক্ষা অযুক্তির (Un-reason) প্রাধান্যই বেশি[৯]। লোকবিশ্বাস যদি লোকসমাজের জীবনাচরণে কার্যকরীভাবে প্রকাশ পায়, যদি তা ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানে রূপায়িত হয় তাহলে তা পরিণত হয় লোকসংস্কারে। লোকসংস্কার হলো সেই সব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় বা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি কেবল বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে। লোকসংস্কারের সাথে ঐতিহ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তার মূল থাকে অনেক গভীরে। পুরুষানুক্রমে যা বিশ্বস্তভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে[১০]। লোকবিশ্বাস অনুসৃত না হলেও সমাজে তেমন কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু লোকসংস্কার অনুসৃত তথা পালিত না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়[১১]।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার মাজারসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বস্তুত বিশ্বাস ও সংস্কারের ভিত্তিতেই মাজারকেন্দ্রিক নানা লোকাচার তৈরি ও চর্চিত হয়। লোকাচার ও লোকবিশ্বাস পরস্পরের পরিপূরক ও পৃষ্ঠপোষক। এমনকি লোকচিকিৎসা বা লোকউৎসবের সাথেও লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের নিবিড় সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা রয়েছে। মাজার তথা পীর-ওলী সম্পর্কে নানা লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। অসীম রায়ের মতে,

> The belief in the capacity of Pirs to heal, to help and to perform other miraculous feats extended over almost the whole range of human need and imagination. The graves of saints were visited by the farmer who had lost his cow, by the women who desired a child or sought a cure for her sick one and so on. Popular belief invented Pir with both individual and shared capabilities and

powers. These beliefs may be broadly grouped under two categories. One set of beliefs shows that a Pir was regarded as not subject to the laws of physical nature that applied to everyone else, and the other reveals that he was even thought to possess command over the forces of nature[১২].

এখানে মাজারকেন্দ্রিক যেসব লোকবিশ্বাস ও সংস্কার পরিলক্ষিত হয় সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

০১. বাবার দয়ায় মুক্তি মেলে

মাজার বা দরগাহ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় সবাই বিশ্বাস করেন, মাধ্যম বা উসিলা ছাড়া কোনো কিছু সম্ভব নয়। 'দুনিয়ায় আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি ও পরিচালনা করেছেন তার মূলে কোন না কোন মাধ্যম ক্রিয়াশীল ছিল, আছে এবং থাকবে। তাই আমরা যারা পাপীতাপী মানুষ আমাদের মুক্তির মাধ্যম হচ্ছেন পীর বা দয়াল বাবা। তাকে যদি সন্তুষ্ট করতে পারি তবে তিনি দয়া করে আল্লাহর কাছ থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন'[১৩]। একটি মাজারের একজন খাদেম বলেন, মুহাম্মদ (সঃ) এর পর থেকে নবী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। বস্তুতপক্ষে এখন আল্লাহর এসব ওলীরাই নবী। তবে কেউ সর্বজনীন নন। যার যে কজন অনুসারী/মুরিদ আছে তিনি সেই ক'জনের নবী। ভক্ত-মুরিদদের মুক্তির ব্যবস্থা তিনিই করবেন। তাই তাকেই (পীরকে) খুশি করতে হবে; তার দিকনির্দেশনা মেনে চলতে হবে। পীর-ওলীরা মুক্তির মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারেন। এ মুক্তি পার্থিব হতে পারে (রোগ-ব্যাধি, দারিদ্র্য, সমস্যা, অশান্তি) আবার পারলৌকিকও হতে পারে[১৪]। তবে মাজার সংশ্লিষ্টদের অধিকাংশই পীর-ওলীকে মুক্তিদাতা মনে করলেও নবী-রাসুল বলে মনে করেন না।

০২. পীর/দয়াল বাবা/খাজা বাবার মৃত্যু নেই

মাজারের অধিকাংশ ভক্ত-খাদেমগণ মনে করেন পীর/দয়াল বাবা/ খাজা বাবার মৃত্যু নেই। তাদের আত্মা সাধারণ মানুষের আত্মার মত নয়। সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করে তাদের আত্মা অমরত্ব লাভ করে। তাই ভক্ত যদি ভক্তিভরে খাজাকে ডাকে, কোন নালিশ জানায় তবে তিনি অবশ্যই তা শুনতে পান এবং সাড়া দেন। এ বিশ্বাস থেকেই মূলত মাজারগুলো প্রায়শ লোকে লোকারণ্য থাকে। কেউ খাজার কাছে দুনিয়ার পেরেশান থেকে মুক্তি চান, কেউ মুক্তি চান পরকালের। দয়াল বাবাকে ভক্তির মাধ্যমে অনেকে আত্মিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট হন। ঢাকার মিরপুরে শাহ্ আলীর মাজারে কয়েকজন ভক্ত জানান, তারা মূলত আত্মিক উন্নতির জন্য এখানে এসে পড়ে থাকেন। শাহ্ আলী তাদেরকে দেখতে পান, তাদের সবকথা শুনতে পান- এ বিশ্বাস নিয়েই তারা মাজারে অবস্থান করেন[১৫]।

০৩. মাজার পবিত্র স্থান

সাধারণভাবে সমাজের প্রায় সব মানুষই মাজারকে পবিত্র স্থান বলে মনে করেন। কিন্তু মাজারের মোতওয়াল্লি, খাদেম, ভক্ত-মুরিদান প্রমুখের বিশ্বাস সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি সুদৃঢ়। তারা মাজারকে অতি পবিত্র বলে বিশ্বাস করেন। এমনকি তাদের পবিত্রতার বিশ্বাস মাজারকে মসজিদ থেকেও অগ্রগামী করে তোলে। ভারতে মঈনুদ্দিন চিশতি, চট্টগ্রামে শাহ্ আমানতের মাজারসহ অনেক মাজারে ওজু না করে এবং টুপি মাথায় না দিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। মাজারের প্রতি পবিত্রতার ধারণা থেকেই মহিলাদেরকে সরাসরি মাজার কক্ষে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। তারা বিশ্বাস করে মাজারে অপবিত্র অবস্থায় বা জুতাসহ (পায়ে তো নয়ই, হাতে কিংবা ব্যাগের মধ্যেও নয়) টুপিহীনভাবে প্রবেশ করা বেয়াদবি[১৬]। প্রচলিত বিশ্বাস হচ্ছে, মাজারে অপবিত্রভাবে প্রবেশ করলে প্রবেশকারীর ক্ষতি হবে। এমনকি যেসব মাজারে নারী-পুরুষ একত্রে গান-বাদ্য, জিকির-আস্কার কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করে তারাও মূল মাজারে নয়; একটু নিরাপদ দূরত্বে এর আয়োজন করে। সুতরাং প্রচলিত বিশ্বাস মতে মাজার পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত। এ বিশ্বাস থেকেই মানুষ মাজারে ছুটে যায়।

০৪. মাজারের প্রসিদ্ধ প্রাণীর প্রতি বিশ্বাস

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি মাজারে প্রসিদ্ধ কিছু প্রাণী সবাইকে আকৃষ্ট করে। যেমন বাগেরহাটে খান জাহান আলীর (রঃ) মাজারে কুমির (কালা পাহাড়, ধলা পাহাড়), চট্টগ্রামে বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এর মাজারে কচ্ছপ (গজারি-মাদারি), সিলেটে শাহ জালাল (রঃ) এর মাজারে গজার মাছ, কবুতর ইত্যাদি। এগুলো সম্পর্কে নানা লোকবিশ্বাস প্রচলিত। অনেকেই মনে করেন উল্লেখিত প্রাণিগুলো সংশ্লিষ্ট পীরের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে। তাই এগুলোর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রদর্শন করলে পীরও খুশি হন। ফলে প্রতিটি মাজারেই দেখা যায় গজার মাছ, কুমির বা কচ্ছপ যদি কারো খাবার না খায় তবে তার মন খারাপ হয়ে যায়। তারা মনে করেন, উদ্দেশ্য বা মনের আশা পূরণ হবে না। বায়েজীদ বোস্তামীর মাজারের পুকুরে অনেকে সিঁড়িতে বসে পরম যত্নে কচ্ছপের গায়ের ময়লা পরিষ্কার করে দেন। এদের অনেকেই মনে করেন, 'এগুলো সত্যিকারের কচ্ছপ নয়, বায়েজীদ বোস্তামী দুষ্ট জীনদেরকে কচ্ছপ বানিয়ে রেখেছেন'[১৭]। কুমির এবং গজার মাছ বা কবুতর সম্পর্কেও নানা লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। যেমন জালালী কবুতর সম্পর্কে মনে করা হয়, হযরত শাহ জালালের (রহঃ) স্মৃতিবিজড়িত। তাই এর নাম 'জালালী কবুতর'। কথিত আছে, শাহ জালাল (রহ) দিল্লীর দরবেশ নিজামউদ্দিন (রহ) কর্তৃক উপহার প্রদত্ত কিছু কবুতর পুষতেন। শাহ জালালের ভাগ্নে শাহ পরাণ (রঃ) মামার অগোচরে প্রতিদিন ১ টি করে কবুতর খেতে শুরু করেন। এক পর্যায়ে কবুতরের সংখ্যা বেশ কম মনে হতে লাগল। শাহ জালাল বিষয়টি বুঝতে পেরে শাহ পরাণকে কৈফিয়ৎ তলব করেন। শাহ পরাণ যেসব কবুতর খাওয়া হয়েছে সেগুলোর পালকগুলি উড়িয়ে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো কবুতর হয়ে যায়[১৮]। ওই কবুতরের বংশধরেরা জালালী কবুতর নামে এখনো সিলেটের মাজার ও

দেশের নানা স্থানে বিচরণ করছে। সিলেটের শাহ জালালের মাজারের কূপ নিয়েও লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। অনেকেই মনে করেন মক্কা শরীফের জম জম কূপের সাথে ঐ কূপটির আন্তঃসংযোগ রয়েছে। তাইএ কূপের পানির ঔষধী গুণও রয়েছে। জমজম কূপের সাথে সংযোগ সম্পর্কে মাজারের ভারপ্রাপ্ত মোতওয়াল্লি জনাব কুটি মিয়া বলেন, ল্যাবরেটরিতে পানির গুণাগুণ পরীক্ষা করে এবং কুয়ায় ডুবুরি নামিয়ে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন জমজম কূপের সাথে শাহ জালালের মাজারে অবস্থিত কূপের সংযোগ রয়েছে[১৯]। এ কূপে সোনালি রঙের একটি মাছ আছে। প্রচলিত লোকবিশ্বাস হচ্ছে, যারা ভাগ্যবান/ভাগ্যবতী এবং যাদের মনের আশা পূরণ হতে চলেছে, কেবল তারাই এ মাছের দর্শন পায়। নতুবা এক যুগ ধরে চেষ্টা করেও এ মাছের দর্শন লাভ অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়[২০]।

০৫. 'আশা গাছে' মনের বাসনা পূর্ণ হয়

চট্টগ্রামে বায়েজীদ বোস্ত্বামী (রঃ) এবং সিলেটে শাহ পরাণ (রঃ) এর মাজারে আশা গাছ রয়েছে। আশা নামের কাঠ গোলাপ বা বটগাছে সুতা বাঁধলে (বিশেষ লাল সুতা) মনের আশা পূর্ণ হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এ লক্ষ্যে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ গাছে সুতা বাঁধেন। সুতার বন্ধনে গাছগুলো অদ্ভুত-দর্শন হয়ে উঠেছে।

প্রখ্যাত ফোকলোরিস্ট অসীম রায় গাছে সুতা বাঁধা, চুমু খাওয়া বা সেজদা করাকে গাছ-পূজা বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন,

> Tree-worship was a widely prevalent practice in Bengal in the form of worship of Bana-durga. Tree-worship in the Pir form was known in other parts of Bengal. এখানে আরো বলা হয়েছে, The offering to Pir usually consisted of lumps of clay, pieces of red rags tied to the branches of the tree and some times clay horses [২১].

গাছে সুতা বাঁধছেন কী উদ্দেশ্যে জানতে চাইলে এক ভক্ত বললেন, 'উদ্দেশ্য বললে তা পূরণ হয় না'। আগে কখনো সুতা বেঁধে ফল পেয়েছেন কিনা জানতে চাইলে তিনি জোর দিয়ে বলেন, অবশ্যই ফল পেয়েছি[২২]। তার দৃঢ় বিশ্বাস আশা গাছে সুতা বেঁধেই তার বোন সন্তান লাভ করেছেন। শাহ পরাণের মাজারে আশা গাছের পাতা খেলে মহিলারা সন্তান ধারণ করতে পারেন বলে বিশ্বাস প্রচলিত আছে। এক দম্পতি জানালেন, দীর্ঘদিন চেষ্টা করেও তারা সন্তানের মা-বাবা হতে পারেননি। অবশেষে মাজারে আসেন এবং আশা গাছের পাতা খান। এক বছরের মধ্যেই তাদের ঘর আলো করে এক কন্যা সন্তান জন্ম নেয়। তাদের বিশ্বাস, আশা গাছের পাতাই তাদেরকে সন্তানের মুখ দেখিয়েছে[২৩]। আশা গাছ নিয়েও লোককাহিনী বা লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। মনে করা হয় শাহ পরাণ (রঃ) যে লাঠি ব্যবহার করতেন তা থেকেই এ গাছের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। এ হিসেবে আশা গাছের বয়স প্রায় সাড়ে ছয়শত বছর। প্রচণ্ড ঝড়ে গাছটি দু-একবার ভেঙ্গে গেলেও আবার ভাঙ্গা অংশের পাশ দিয়ে নতুন গাছ বেড়ে উঠেছে। তাই মনে করা হয়, শাহ পরাণের অলৌকিক স্মৃতিবিজড়িত এ গাছের মৃত্যু নেই। সিলেটের শাহ সুন্দর (রঃ) এর

মাজারে কাঁটাতারের বেড়ায় পলিথিন বাঁধার প্রচলন আছে। এটিও গাছে সুতা বাঁধার মত বিশ্বাস থেকে বিশেষ ফল লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

০৬. কেবল শরীয়তী চর্চায় মুক্তি নেই: যারা মাজারকেন্দ্রিক ধর্মচর্চা করেন তাদের বিশ্বাস হচ্ছে, কেবল শরীয়তী বিধিবিধান চর্চায় মুক্তি মিলবে না। নামাজ-রোজাই একমাত্র ইবাদত নয়; মুক্তির জন্য হাকিকত, তরিকত, এবং মারিফাতের চর্চাও আবশ্যক এবং অনিবার্য। এ জন্যে ধ্যান, সাধনা, পীর-ভক্তি ইত্যাদি ইবাদত অপরিহার্য। মাজার-ভক্তগণ এর চর্চা করলে শরীয়তপন্থিরা একে অনৈসলামিক বলে আখ্যা দেন। কিন্তু মাজার ভক্তরা মনে করেন, কোনো বিধানই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই শরীয়তী চর্চার সাথে অন্যান্য বিধানের চর্চা করে সাফল্য অর্জন করতে হয়।

০৭. অলৌকিকতায় বিশ্বাস

মাজারের ভক্ত-খাদেম, মোতওয়াল্লি-মুরিদান প্রায় সবাই মাজার এবং সংশ্লিষ্ট পীরের অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন। ভক্ত-মুরিদানগণ এ বিষয়ে কথা বলতেও বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। প্রায় প্রতিটি মাজার ও মাজারে শায়িত পীর সম্পর্কে অলৌকিক ঘটনার কথা ও কাহিনী শোনা যায়। মাজারসংশ্লিষ্ট প্রায় প্রত্যেকেই এটি বিশ্বাস করেন। People thought that they (Sufi) were endowed with super-human power[২৪]. শাহ আমানত (রঃ) শত মাইল দূর থেকে মুহূর্তকালের মধ্যে এক ব্যক্তির দলিল আনার ব্যবস্থা করেছিলেন, শাহ জালাল (রঃ) জায়নামাজে সুরমা নদী পার হয়েছিলেন, শাহ পরাণ (রঃ) বহুদিন পূর্বে ভক্ষণকৃত কবুতরের হাড়-পশম দিয়ে আবার জীবন্ত কবুতর সৃষ্টি করে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিলেন, খান জাহান আলী নদীর উজান-পানিতে পাথর ভাসিয়ে এনে ষাট গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেছেন, শাহ আলী (রঃ) মোরাকাবায় বসে ফানাফিল্লার মাধ্যমে প্রায় অস্তিত্বহীন হয়ে গিয়েছিলেন, শাহ মখদুম (রঃ) কুমিরপৃষ্ঠে চড়ে রাজশাহীতে এসেছিলেন- অলৌকিক ইস্যুতে এমন হাজারো লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। কেবল প্রখ্যাত বড় বড় পীর-ওলীদের ক্ষেত্রে নয়, অখ্যাত বা ছোট পীর এবং তাদের মাজারকে ঘিরেও নানা অলৌকিকতার কথা শোনা যায়। যেমন গোপালগঞ্জের মকসুদপুর থানাধীন ডাঙ্গাদুর্গাপুরে শায়িত ওয়াজেদ মুন্সি (পাগলা মুন্সি/ মুন্সিসাব) গাছ থেকে লাউ ছিঁড়ে মাটিতে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে উপস্থিত শিশু-কিশোরদের খাইয়েছেন। অত্যন্ত মিষ্টি ও সুস্বাদু এ কাঁচা লাউ যারা খেয়েছে তারা সচরাচর অসুস্থ হয় না[২৫]। আবার টঙ্গীর বনমালা গ্রামে হযরত মধুর মা'র মাজারের একটি ঘটনায় শোনা যায়, আমেরিকা প্রবাসী এক বাঙালী মহিলা পুত্র সন্তানের আশায় তৃতীয়বার গর্ভধারণ করেন। অষ্টম মাসে আলট্রাসনোগ্রাফিতে দেখেন তিনি আবার কন্যা সন্তানের মা হতে চলেছেন। তখন তিনি বলেন, 'মধুর মা তুমি যদি সত্যি হও আমার গর্ভের সন্তান যেন ছেলে হয়'। যথাসময়ে তিনি প্রসব করলেন এবং দেখা গেল তিনি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। এ পুত্র নিয়ে তিনি মাজারে এসেছিলেন এবং কিছু সহযোগিতাও করে গেছেন[২৬]। মাজারে এসে সন্তান লাভ, অসুখ থেকে মুক্তি লাভ, মাজারের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণে শাস্তি লাভ ইত্যাদি অলৌকিক বিশ্বাসও মাজার সংস্কৃতিতে প্রচলিত আছে। মাজার

তথা পীর-দরবেশ সম্পর্কে আরো অনেক লোকবিশ্বাস রয়েছে। অসীম রায় পীর-দরবেশ সম্পর্কে নানা লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের উল্লেখ করেছেন। তার মতে,

> Hajir pir was taken to got back lost cattle. Thanka-pir was believed to posses the power of regaining lost property... Nora pir's favor was solicited in order to fulfill a desire or a wish. People took vows in the name of the pir, tied a knot called Nora on a wisp of grass or hay, and placed it under a banyan tree.[27]

পীর বা মাজার সংস্কৃতিতে কোনো কোনো পীর/মাজারের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়। যেমন, চট্টগ্রামের শাহ আমানতের মাজার থেকে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে সফল হওয়া যায় বলে অনেক ভক্ত বিশ্বাস করেন। অনেকে পানি বিষয়ক যেকোনো বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পীর-বদর বা খোয়াজ খিজির এর শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। অসীম রায় বলেছেন, The wide popularity of Pir-Badar and Khwaja-Khizir as the guardian-spirits of water[২৮]. মানিক পীরকে জিন্দাপীর বলে মনে করা হয়। ভক্তরা মনে করেন, ঈসা বা যিশু (আঃ) এর মত মানিক/জিন্দা পীরও ইন্তেকাল করেননি। তিনি এখনো জীবিত আছেন এবং ভক্তের ডাকে ঠিকই সাড়া দেন।

মাজারকেন্দ্রিক লোকাচার

মাজার সংশ্লিষ্ট নানা লোকবিশ্বাসকে ঘিরে বিভিন্ন লোকাচার পরিলক্ষিত হয়। সাধারণভাবে লোক বা মানুষের আচারকে লোকাচার বলে অভিহিত করা হয়। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সামনার (William Sumner) সর্বপ্রথম এ প্রত্যয়টির সমাজতাত্ত্বিক ব্যবহার করেন। তিনি ১৯০৬ সালে লোকাচার বা Folk Ways নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে সমাজের স্বাভাবিক গতিধারায় লোকাচার সৃষ্টি হয়। মানুষ অসচেতনভাবেই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে লোকাচার সৃষ্টি করে। নতুন অবস্থার সাথে লোকাচার খাপ খাইয়ে নেয়। সর্বকালে, সর্বসমাজে মানুষের সামাজিক জীবন লোকাচার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজে প্রচলিত সাধারণ প্রথা, শিষ্টাচার, আদব-কায়দা তথা মানুষের ব্যবহারবিধি এর অর্ন্তভুক্ত। সমাজভেদে লোকাচার বিভিন্নরূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

B. Bhushan বলেছেন, Folk ways is the everyday activities within a small-scale society which have become established and are socially sanctioned.[২৯] অর্থাৎ লোকাচার সবসময়ই সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিষয়। সমাজের অনুমোদন ছাড়া কোন প্রথা বা রীতি লোকাচারে পরিণত হতে পারেনা। ম্যাকাইভারের (MacIver) মতে, সমাজে ব্যবহার ও আচরণের স্বীকৃত এবং গৃহীত পন্থা-প্রক্রিয়াই হচ্ছে লোকাচার। মানুষ সামাজিক প্রথা বা রেওয়াজ মেনে চলে। অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের নিয়ম রীতি অনুযায়ী আচরণ করে থাকে। এর সাথে আচার-প্রথা,

মূল্যবোধ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি সম্পৃক্ত থাকে। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ বলেছেন, 'কোন বিশ্বাস যখন প্রতীকের সাহায্যে জীবনাচরণে কার্যকরী ক্রিয়া বা অনুষ্ঠানে রূপায়িত করা হয়, তখন তা পরিণত হয় লোকাচারে[৩০]। জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু, দেব-দেবীর শিষ্টাচার, সামাজিক আইন, কৃষি, শিকার, ভ্রমণ, প্রাকৃতিক ঘটনা ইত্যাদি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লোকাচার লক্ষ করা যায়। এর মূলে মানব চেতনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও পরিলক্ষিত হয়। এর সাথে লোকসংস্কারের সম্পৃক্ততা রয়েছে। লোকসংস্কার তথা লোকাচারের মাধ্যমেই একটি জাতির মানসিক সত্তা (Ethos) আবিষ্কার করা যায়।

মাজারসংস্কৃতিতে ব্যক্তিগত লোকাচার, পারিবারিক লোকাচার এবং সামাজিক লোকাচার সবগুলোই পরিলক্ষিত হয়। মাজারসংস্কৃতিতে যারা আস্থা রাখেন তারা মাজারকেন্দ্রিক নানা লোকাচারে অভ্যস্ত। সমাজের অন্য সবাই সে লোকাচারের প্রতি অনুরক্ত না ও হতে পারেন। এমনকি অনেক সময় ভক্তদের মাজারকেন্দ্রিক লোকাচার ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। তবে মাজারের ভক্তবৃন্দ তাদের প্রতিটি লোকাচারের নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন। এখানে মাজারকেন্দ্রিক বিভিন্ন লোকাচার উল্লেখ করা হলো:

১. পবিত্রতার সাথে মাজারে প্রবেশ

মাজারের প্রতি যাদের ভক্তি-বিশ্বাস রয়েছে তারা মাজারকে পবিত্র স্থান বলে মনে করেন। অনেকে মাজারকে মসজিদের মতই সম্মান করে থাকেন। এ জন্য মাজারের প্রবেশের পূর্বশর্ত হচ্ছে পবিত্রতা অর্জন করা। ওজু করে টুপি মাথায় দিয়ে নম্রতার সাথে মাজারে প্রবেশ করতে হয়। জুতা স্যান্ডেল বহন করে (ব্যাগের অভ্যন্তরে হলেও) মাজারে প্রবেশ নিষিদ্ধই বলা যায়। চট্টগ্রামের শাহ আমানত খান (রহঃ) এর মাজারে এ ব্যাপারে কড়াকড়ি একটু বেশি[৩১]। মূল মাজারের প্রবেশ পথে দুইজন খাদেম সদা সতর্কভাবে অবস্থান করে টুপি পরিধান এবং জুতা-স্যান্ডেল বহন না করার বিষয়টি নিশ্চিত করেন। পবিত্রতার কথা বলেই মাজারের মহিলাদের সরাসরি প্রবেশ করতে না দেওয়ার রেওয়াজ চালু করা হয়েছে। মাজারে নানা জাত, ধর্ম ও বর্ণের মানুষ যাতায়াত করে। বায়েজীদ বোস্তামী (রহ) এর মাজারের একজন খাদেমের ব্যাখ্যা হচ্ছে- 'মহিলাদের ঋতুকালীন অবস্থাকে সবাই সমানভাবে মেনে না-ও চলতে পারে। তাই এ ধরনের অপবিত্রতার দূষণ থেকে রক্ষার জন্য মাজারাগুলোতে মহিলা দর্শণার্থীদের জন্য পৃথক জিয়ারতখানার ব্যবস্থা করা হয়েছে'[৩২]। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিয়ারতখানা থেকে জানালার শিকের মধ্য দিয়ে মূল মাজারটি দেখা যায়, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। তবে ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়। পর্যাপ্ত নজরানা দিয়ে কিংবা খাদেমকে অত্যধিক অনুরোধ করে মহিলা ভক্তবৃন্দ মূল মাজারে প্রবেশ করেন, চুমু খান এমন দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে[৩৩]। ছোট মাজারগুলোতে পৃথক ব্যবস্থা খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু মূল মাজারে মহিলাদের প্রবেশ অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত। তবে ফকির-বাউল বা চিশতিয়া তরিকার মাজারগুলোতে বাহ্যিক পবিত্রতার বাড়াবাড়ি কম। এখানে মনের পবিত্রতাকেই প্রধান বিবেচ্য বিষয় বলে মনে করা হয়।

২. মাজারে পৃষ্ঠপ্রদর্শন না করা

মাজারকেন্দ্রিক লোকাচারের অন্যতম হচ্ছে মাজারের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করা। এজন্যে মাজার ভক্তগণ মাজারের দিকে মুখ রেখে (অনেকে হাত জোড় করে) পিছু হেঁটে মাজার থেকে বের হন। মাজারের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন বেয়াদবি, পীরের প্রতি অসম্মান। তাই মাজারের মোতওয়াল্লি, খাদেম, ভক্ত এবং সাধারণ জিয়ারতি কেউই মাজারে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন না।

৩. মাজারে চুমু খাওয়া/সেজদা করা

মাজার জিয়ারত শেষে অনেকেই মাজারের গিলাফ, বেদী বা মূল মাজারে চুমু খান। মূলত অতিভক্তি ও আবেগ থেকেই এ লোকাচারের জন্ম হয়েছে। চুমু খাওয়ার দৃশ্য দেখে অনেকেই মনে করেন সেজদা করা হচ্ছে। তবে মাজারে সেজদা যে কেউ করেন না তা নয়। প্রতিটি মাজারে নিষিদ্ধ/হারাম লেখা থাকলেও কেউ কেউ মাজারে সেজদা করেন। এক শ্রেণীর ভক্তদের মাজারের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আবেগ অত্যন্ত বেশি। ভক্তিতে শ্রদ্ধাবনত হয়েই অনেকে মাজারে সেজদা করেন। মাঠ গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের সময় এরূপ একাধিক ব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে[৩৪]। অনেক মাজারের খাদেম জানিয়েছেন, নিষেধ করা সত্ত্বেও কেউ কেউ অতি আবেগে মাজারে সেজদা করেন। তবে এ ব্যাপারে ভিন্নমতও আছে। বিশেষ করে ভাণ্ডারি, বাউল-ফকির দর্শনে বিশ্বাসীরা মনে করেন, কেবল মাটিতে কপাল ঠেকালেই সেজদা হয় না। সেজদার পূর্বশর্ত হচ্ছে মনের ভিতর থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা। মাইজভাণ্ডারি তরিকার এক খলিফা বলেন, সেজদা দুই প্রকার; ক. ভক্তি, সম্মান ও শ্রদ্ধায় মাথা অবনত করা এবং খ. মুক্তির লক্ষ্যে সর্বশক্তিমানের কাছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আত্মসমর্পণ করা। নিজের অন্তর থেকে আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে মস্তকাবনত করাই প্রকৃত সেজদা। কেবল শ্রদ্ধা-ভক্তিতে মাজারে বা মুর্শিদের পায়ে মাথা ঠেকানো কখনও সেজদা হতে পারে না।[৩৫]

৪. দর্শনী বা নিয়াজ-নজর দান

মাজারে দর্শনী বা নিয়াজ-নজর দান একটি প্রতিষ্ঠিত লোকাচার। মাজারে যেসব দর্শনার্থী আসেন তাদের অধিকাংশই কম বেশি দর্শনী প্রদান করে থাকেন। মাজারে গিয়ে দান বাক্সে, মূল মাজারের গিলাফের উপর, খাদেমের হাতে দর্শনীর টাকা দেয়া হয়। কুমির, কচ্ছপ, গজার মাছ, কবুতর মাজারের এসব প্রাণীর খাবার এবং মানত বাবদও নগদ অর্থসহ মুরগী, গরু, খাসী, ধান, ফলমূল ইত্যাদি প্রদান করা হয়। আয়ের উৎস হিসেবে এগুলোও নিয়াজ-নজর বা দর্শনীর অন্তর্ভুক্ত। বেশিরভাগ মাজারে দর্শনী আদায়ের জন্য খাদেমদের তৎপরতা থাকে। কোথাও কোথাও এ তৎপরতা বিরক্তি ও

বিড়ম্বনা সৃষ্টি করে। মহিলারা এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্যবস্তু (Target) হিসেবে বিবেচিত হন। দর্শনী তথা অর্থ-আদায়ের কৌশল হিসেবে দানবাক্স-বাণিজ্যের প্রচলন লক্ষ করা যায়। এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কেবল রাজধানীতেই বিভিন্ন মাজার ও পীরের নামে ৫ হাজার দানবাক্স রয়েছে। কাঁচা বাজার, চালের আড়ত, পীরের মাজার, মসজিদ-মাদ্রাসার প্রবেশপথ প্রভৃতি স্থানে ঝুলানো দানবাক্সগুলোতে প্রতিদিনের আয় আড়াই লাখ টাকা[৩৬]। ঢাকা শহরে যেসব মাজার বা পীরের নামে দানবাক্স বেশি দেখা যায় তার মধ্যে ইয়ার উদ্দিন (রঃ), চন্দ্রপাড়া (রঃ), শাহ বাবা ফরিদপুরী (রঃ), শর্ষিনা পীর (রঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাজার বা পীরের কিছু ভক্ত এটি চালু করলেও পরবর্তী সময়ে প্রতারক বা অভাবী মানুষ দানবাক্স বাণিজ্যের মাধ্যমে উপার্জনে তৎপর হয়ে ওঠে।

৫. ভক্তবৃন্দের করজোড়ে সালাম বিনিময়

মাজারের ভক্তবৃন্দ সালাম ও কুশল বিনিময়ের সময় জোড়হাত আংশিক বা মুখ পর্যন্ত তুলে বিনয় প্রকাশ করেন। মাজার চত্বরে বা বাইরে যেখানেই হোক পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ হলে এ বিশেষ প্রক্রিয়ায় তারা সালাম বিনিময় করেন যা সাধারণ মানুষের থেকে একটু আলাদা। ভাণ্ডারি, তরিকাপন্থী এবং ফকির-বাউলদের মধ্যে এ রীতিতে সালাম বিনিময়ের প্রচলন বেশি। অনেকের মতে করজোড়ে সালাম বিনিময়ের সাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের করজোড়ে নমস্কার প্রদানের সাদৃশ্য রয়েছে। এ রেওয়াজ ভারতে অবস্থিত খাজা মাইনুদ্দিন চিশতি (রহঃ)– এর মাজার থেকে সম্প্রসারিত হতে পারে।[৩৭]

৬. পীর/দয়াল বাবা/খাজা বাবার নাম উচ্চারণের বিশেষ রীতি

ভক্তবৃন্দ সংশিষ্ট পীর/দয়ালবাবা/খাজা বাবার নাম উচ্চারণের সময় বিনয় প্রকাশের জন্য নিজ হাত জোড় করে মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করেন। এভাবে হাত উত্তোলন কেউ একবার কেউ দু'বার করে থাকেন। কিন্তু মাজার ভক্তগণ বাবার নাম উচ্চারণের সময় হাত উত্তোলন করেননি এমনটি চোখে পড়েনি। যেকোন সময় যেকোন স্থানে এ লোকাচারের বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়।

৭. পীর/বাবার প্রতি অতি ভক্তি

মাজারে যাদের যাতায়াত তাদের বেশিরভাগই তরিকাপন্থী। সবাই মাজারে শায়িত ব্যক্তিকে যেমন শ্রদ্ধা করেন, তেমনি মাজারের বর্তমান পীর/মোতওয়াল্লি খাদেম বা তরিকার পীরকেও খুব বেশি ভক্তি করেন। পীর/বাবার জুতা বহন করতে পারলেও অনেকে নিজেকে ধন্য মনে করেন। মহিলা ভক্তবৃন্দ হুজুর/বাবার গা টিপে দিচ্ছেন-এমন ভক্তির নজিরও রয়েছে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট মাজারের ওরসের সময় আরামদায়ক বিছানায় গা এলিয়ে দেয়া স্বাস্থ্যবান এক পীরকে (বয়স আনুমানিক ৫০-৫৫ বছর) এক মহিলা ভক্ত (বয়স আনুমানিক ৩০-৩২ বছর) শত শত মানুষের সামনে গা টিপে দিচ্ছিলেন। ভক্তির আতিশয্যে পীর/বাবাকে নজরানা, উপহার-উপঢৌকন

দেয়া, তার আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে মেনে চলা অর্থাৎ যেকোনভাবে তাকে খুশি করার ঐকান্তিক চেষ্টা ভক্তদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

৮. আশা গাছে সুতা বাঁধা

মাজারকেন্দ্রিক লোকাচারের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আশাগাছে সুতা বাঁধা। চট্টগ্রামে বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এর দরগায় টিলার উপর যে গাছটিতে সুতা বাঁধা হয় সেটি মূলত কাঠ গোলাপ গাছ। সুতা বাঁধার লোকাচার সব মাজারে নেই। বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এবং শাহ পরাণ (রঃ) এর মাজারে এর চর্চা বেশি। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা নিয়ত নিয়ে এ সুতা বাঁধা হয়। প্রায়শ সুতার রং হয় লাল। সুতা বন্ধনকারীদের মধ্যে মহিলা এবং যুবক শ্রেণীর ছেলে-মেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে গাছ থেকে সুতাটি খুলে ফেলতে হয়। কিন্তু যিনি সুতা খুলবেন তিনি কোন্ সুতাটি বেঁধেছিলেন তা কোনভাবেই চিহ্নিত করা সম্ভব নয়।

৯. পশু-পাখিকে খাওয়ানো/সম্মান করা

বাংলাদেশের মাজার সংস্কৃতির সাথে পশু-পাখি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। বাগেরহাটে খান জাহান আলী (রঃ) এর মাজার সংলগ্ন দীঘিতে কুমির, চট্টগ্রামের বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এর মাজারে কচ্ছপ, সিলেটে শাহ জালাল (রঃ) এর মাজারে কবুতর ও গজার মাছ, সিলেটের চাষনী পীরের মাজারে বানর, শাহ সুন্দর (রহঃ) এর মাজারে কাক ইত্যাদি মাজার ভক্তবৃন্দের পরিচিত এবং প্রিয় প্রাণী। ভক্তবৃন্দ মাজারে গেলেই এদেরকে খেতে দেন। কচ্ছপ ও গজার মাছের জন্য খাবারের পরিমাণ এত বেশি হয়ে যায় যে তারা এসব খেয়ে শেষ করতে পারে না এবং পানি দূষিত হয়। তবে বাগেরহাটে কুমিরের খাবার (মুরগী, ছাগল ইত্যাদি) প্রায়শ কুমিরকে দেয়া হয় না। জালালী কবুতরের জন্য প্রদত্ত ফসলাদি মাজার কর্তৃপক্ষের অন্যতম আয়ের উৎস। রাজশাহীর শাহ মখদুম (রঃ) এর মাজারে কোন পাখি বা প্রাণী দেখা যায় না। তবে মাজার কমপ্লেক্সের ভিতরেই একটি কুমিরের কবর আছে। বলা হয়ে থাকে, এ কুমিরের পিঠে আরোহণ করেই তিনি রাজশাহীতে এসেছিলেন। ভক্তদের অনেকেই মাজার জিয়ারত শেষে কুমিরের কবরেও কিছুক্ষণ অবস্থান করেন। অনেকে আগরবাতি মোমবাতি জ্বালিয়ে দেন, কেউ কেউ চুমুও খান।

১০. মানত করা

মাজার সংস্কৃতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লোকাচার হচ্ছে মানত। দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত মানুষ বিভিন্ন কারণে/প্রয়োজনে মানত করে। রোগমুক্তি, সন্তান লাভ, গৃহশান্তি, পরীক্ষায় পাশ, চাকরি প্রাপ্তি, ব্যবসায়ে উন্নতিসহ হাজারো নিয়তে মানুষ মাজারে মানত করে থাকে। মানত উপকরণের মধ্যে টাকা-পয়সা ছাড়াও হাঁস-মুরগী, ছাগল, গরু, ক্ষেতের ফসল, ফল, তরকারি, গোলাপজল, আগরবাতি, মোমবাতি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। অসীম রায় বলেছেন, A applicant observed a fast, took

a bath and prepared *sinni/Shirni* to offer it to the pir[৩৮]. এছাড়া মাজার জিয়ারত, মাজারে এসে গোসল এবং নামাজ আদায়, মাজারে চুমু খাওয়া, মাজারের দাঁড়িয়ে তওবা করা ইত্যাদি মানতও হয়ে থাকে। ভক্তবৃন্দের মানতের টাকা বা উপকরণ দরগাহ/মাজারের উপার্জনকে সমৃদ্ধ করে। গোলাপজলের আধিক্যে মাজার কর্তৃপক্ষকে তা নিষ্কাশনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছে (শাহ জালাল, শাহ আমানত, শাহ আলী প্রমুখের মাজারে)।

১১. মোমবাতি প্রজ্জ্বলন

মাজার সংস্কৃতির এক অপরিহার্য লোকাচার মোমবাতি প্রজ্জ্বলন। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি মাজারে এ আচারটি বিদ্যমান। অনেকগুলো বৈদ্যুতিক বাতির চোখ ধাঁধানো আলোর সমারোহ থাকা সত্ত্বেও মাজারে মোমবাতি জ্বলবেই। আগত ভক্তবৃন্দ ডজন ডজন মোমবাতি মাজারে দান করেন। অনেকে নিজে জ্বালিয়ে দেন। অন্যান্য দিনের তুলনায় বৃহস্পতিবারে রাত্রে অনেক বেশি মোমবাতি পোড়ানো হয়। মাজারকেই যারা ধ্যান-জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করেন তারা সাধারণত বৃহস্পতিবারে মাজারে অবস্থান করে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত মোমবাতি জ্বালান। ওরসের সময় একরাতে কয়েক মণ মোমবাতি জ্বালানো হয়[৩৯]। যেসব মাজারে সঙ্গীত পরিবেশন, রাত্রি যাপন ইত্যাদি ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কঠোর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে (যেমন হাইকোর্ট মাজার) সেখানে মোমবাতিও একটু কম ব্যবহৃত হয়। তবে শাহ আমানতের মাজারে সঙ্গীত না হলেও বৃহস্পতিবারে ভক্তগণ জিকির-আসকার, দোয়া-মোনাজাত করেন। সেখানে সারারাতই অসংখ্য মোমবাতি জ্বলে। সমগ্র মাজার চত্বর মোমবাতির আলোয় উদ্ভাসিত হয়। ভক্ত আশেকানদের অনেকেই মোমবাতি জ্বালানোর জন্য কাঠের টুকরা, ছোট খাটিয়া বা মোমদানী সাথে করে মাজারে নিয়ে আসেন, আবার নিয়ে যান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই সাথে দুই থেকে দশটি পর্যন্ত মোমবাতি জ্বালানো হয়। মাজারে মোমবাতির তুলনায় আগরবাতি কম ব্যবহৃত হয়[৪০]। তবে মিরপুর মাজারে কেবল আগরবাতি পোড়ানোর জন্য মাজার ভবনের সামনে বিশেষ ব্যবস্থা আছে, যেখানে একই সাথে শতাধিক আগরবাতি পোড়ানো যায়। এখানে আগরবাতি পোড়ানোর ছাই খাদেমগণ সংরক্ষণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আগত ভক্তদের মাঝে তা বিতরণ করেন।

১২. গান গাওয়া

ইসলাম ধর্মের শরীয়তী আদর্শে গানকে কেবল নিরুৎসাহিত নয়, নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসুলুলাহ (সাঃ) বলেছেন, কান লাগিয়ে গানবাদ্য শোনা গোনাহ, এর আসরে বসা ফাসেকি এবং তাতে আন্তরিক ভাব-স্বাদ উপভোগ করা কুফরি[৪১]। কিন্তু অনেক মাজারেই বিশেষ করে ভান্ডারি ও চিশতিয়া তরিকার অনুসারীরা গানকে যিকির বা ইবাদত বলে গণ্য করেন। এখানে বাউল, দেহতত্ত্ব, মারফতি, মুর্শিদী, ভক্তিমূলক, গুরু সাধন-ভজন ইত্যাদি গান গাওয়া অন্যতম লোকাচারে পরিণত হয়েছে। তবে কাদেরিয়া

তরিকার মাজারগুলোতে গান হয় না বললেই চলে। বাংলাদেশে লালন শাহ, মাইজভাণ্ডার, বায়েজিদ বোস্তামী, মিরপুর, শাহ জালাল, শাহ পরাণ, খান জাহান আলী প্রমুখের মাজারে গান গাওয়া হয়। ছোট বা অখ্যাত মাজারগুলোতেও নিয়মিত আসর জমে। তবে কিছু আলেমের প্রচারণা, বোমা হামলা, আইন শৃঙ্খলার অবনতির আশংকায় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কারণে মাজারে গানের চর্চা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

১৩. বিশেষ ধরনের জিকির

যারা মাজারে যান না বা বিশেষ কোন তরিকার অনুসারী নন, তাদের সাথে মাজার-ভক্তদের যিকিরে পার্থক্য রয়েছে। মাজার ভক্তবৃন্দ প্রায়শ কোন না কোন তরিকার অনুসারী। তাই তাদের যিকিরও হয় তরিকার নির্দেশনা মোতাবেক। অধিকাংশ মাজার-প্রেমীর যিকির হয় উচ্চৈঃস্বরে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুলিয়ে। এ যিকিরে অনেক সময় নারী-পুরুষ একই সাথে অংশগ্রহণ করেন। ফরিদপুরের আটরশি, চন্দ্রপাড়ার যিকির এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাজারভক্ত বা কোনো তরিকার অনুসারীদের অনেকে যিকির করতে করতে অনেক সময় ভাবাবেগে বেসামাল হয়ে পড়েন।

১৪. ধুমপান এবং গাঁজা-সিদ্দি সেবন

মাজারে যারা দিন রাত অবস্থান করেন তাদের অনেকেই ধুমপায়ী এবং গাঁজা-সিদ্ধিসেবী। আবার মাজারের প্রতি সামান্যতম ভক্তি নেই– এমন অনেক নেশাখোরও নিরাপদ মনে করে মাজারে গিয়ে নেশা করে। ভণ্ড-সাধক, বাউল-ফকিররাও গাঁজা-সিদ্ধি সেবনসহ কিছু আপত্তিকর কাজে লিপ্ত থাকেন। এটি মাজারকে সমাজের সামনে বিরূপ সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছে। যারা মাজারের সমালোচনা বা বিরোধিতা করেন তারা এ বিষয়টিকে আরো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে উপস্থাপন করেন। বস্তুত মাজারে আগত ফকির-বাউল-সন্ন্যাসী প্রকৃতির ভক্তরাই ধুমপান বা গাঁজা সেবন করেন, সকলে নন। তবে এঁদের অনেকেরই দাবি, সাধনার অংশ হিসেবেই তারা গাঁজা-সিদ্দি সেবন করেন এবং এজন্য কখনো তারা নেশাগ্রস্থ বা বেসামাল হয়ে পড়েন না[৪২]। বৃহস্পতিবার রাতসহ অন্যান্য দিনে এখনো অনেক মাজারে ধুমপান, গাজা সেবন, প্রচলিত আছে। ওরসের সময় গাঁজা সেবনের উৎসব পরিলক্ষিত হয়। গাঁজা সেবন যে সমাজের মানুষ ভাল চোখে দেখেন না তা মাজার কর্তৃপক্ষও জানেন। তাই হাইকোর্ট মাজারসহ অনেক মাজারে এ বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাজারকে পরিচ্ছন্ন এবং নেশামুক্ত রাখতে অধিকাংশ কমিটি তৎপর থাকেন। কিন্তু দু-একটি অখ্যাত ও বিতর্কিত মাজারের খাদেমরাই গাঁজা ব্যবসার সাথে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৫. মাজারে নারী বিষয়ক লোকাচার

মাজারে নারীর অবস্থানের দ্বৈতরূপ পরিলক্ষিত হয়। প্রায় সব মাজারে নারী সরাসরি মূল মাজার কক্ষে প্রবেশ বা মাজার স্পর্শ করতে পারেন না। দূর থেকে দেখে জিয়ারত, প্রার্থনা সম্পন্ন করেন। প্রতিষ্ঠিত বড় মাজারগুলোতে নারীর জন্য পৃথক ইবাদত বা জিয়ারতখানা আছে। ছোট মাজারগুলোতে তা নেই। এখানে দূরে

দাঁড়িয়েই জিয়ারত করতে হয়। পর্দা বা ধর্মীয় পবিত্রতা/অপবিত্রতার দোহাই দিয়ে এখানে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। আবার অনেক মাজারে গান, যিকির, আসরবন্দনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান, সহবস্থানে আসীন। এখানে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সমান অধিকারে যে যার কাজ করে যাচ্ছেন। যদিও মাজার পরিচালনা বা খাদেম-মোতওয়ালি হিসেবে কোনো মহিলাকে ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়নি।

১৬. বিশেষ আসন ব্যবহার

যারা তরিকাপন্থী বা মাজার সংশ্লিষ্ট কারো কাছে দীক্ষা নিয়েছেন, তারা প্রায়শ ছোট চারপায়া জল-চৌকি বা ক্যাশ বাক্সের মত আসন ব্যবহার করেন। নানা রঙের কাগজ, জরি-কাপড়, মালা, আজমীর শরীফ, মক্কা-মদিনা বা পীরবাবা বা তার মাজারের ছবি দিয়ে এ আসন সুসজ্জিত থাকে। আসনের উপর মোমবাতি জ্বালানোর প্রচলনও দেখা যায়। ভক্তবৃন্দ মাজারে বিশেষ করে ওরসে আসার সময় এটি সাথে করে নিয়ে আসেন। আবার যাওয়ার সময় এটি নিয়ে যান। এ আসনকে পবিত্র (এমনকি কখনো কখনো প্রভাবশালী) মনে করা হয়। বাড়িতেও এ আসনকে সম্মান জানানো হয়। এ আসনকে ঘিরে নিয়মিত (প্রায়শ সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে) যিকির, আলোচনা, সাধনা বা ভক্তিমূলক গানের আসর বসানো হয়। অধিকাংশ ভক্ত যে ঘর/কক্ষে আসনটি স্থাপন করেন (নিজ বাড়িতে অনেকটা স্থায়িভাবে) সে ঘর/কক্ষটিকে পবিত্র মনে করা হয়। সেখানে জুতা/স্যান্ডেল পায়ে প্রবেশ নিষেধ[৪৩]।

বর্তমান গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময় মাজার এবং মাজার ভক্তদের বাড়িতে অবস্থান করে উল্লেখিত লোকাচারগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে। মাজারকে ঘিরে আরো অসংখ্য লোকাচার রয়েছে। যেমন মিরপুরের শাহ আলীর মাজারে পরিচালিত একটি গবেষণায় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের (লোকাচার) উল্লেখ করা হয়েছে[৪৪]। যেমন:

ক. **প্রাতিষ্ঠানিক লোকাচার:** এটি কেবল মাজার কমিটি পালন করে। যেমন ওরস, শবেবরাত ও মুসলমানদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস পালন।

খ. **গোষ্ঠীভিত্তিক লোকাচার:** মাজারের ভক্ত-আশেকান, পাগল-বাউল ও মাস্তানরা (আল্লাহর পাগল) এ লোকাচার পালন করেন। এর উদাহারণ হিসেবেও ওরসের কথা বলা হয়েছে। যেমন সানাল ফকিরের ওরস, যা কেবল ভক্ত-পাগল-বাউল মাস্তানরা আয়োজন/পালন করেন।

গ. **ব্যক্তিক লোকাচার:** মাজারে আগত ভক্ত-জিয়ারতি বা দর্শনার্থীরা নিজে নিজে বা এককভাবে যেসব আচার অনুষ্ঠান করেন তা ই ব্যক্তিক লোকাচার। যেমন, মূল মাজারকে ঘিরে খাদেমদের কবর, মানত গাছ (গুলাচি ফুল গাছ), সিন্নি গাছ বা খির খেজুর গাছ, মাজারের বর্তমান বা পুরনো খাদেম , মাজার প্রাঙ্গনের মাস্তান, বাউল-ফকির প্রভৃতি বিষয়ে ভক্তদের নানা রকম ভক্তি ও আচার অনুষ্ঠান রয়েছে। মাজারে আরো যেসব লোকাচার পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে[৪৫]:

০১. কবরকে সেজদা করা

০২. মাজারে আগরবাতি-মোমবাতি জ্বালানো,
০৩. মাজারে (মূল কবর ও জিয়ারতিদের গায়ে) গোলাপ জল ছিটানো,
০৪. কবরের দেয়াল ও মেঝেতে মাথা ঝুকিয়ে চুমু খাওয়া
০৫. দেয়ালে হাত ছুঁইয়ে নিজের বা সন্তানের সারা শরীর ও মাথায় বুলিয়ে দেয়া,
০৬. আগরবাতি পোড়ানো ছাই শরীরে মাখা এমনকি খাওয়া
০৭. জুতা খুলে খালি পায়ে মাজারে প্রবেশ
০৮. মহিলারা ওজু করে ঘোমটা টেনে পর্দা ও পবিত্রতার সাথে মাজারে প্রবেশ করেন
০৯. সিঁড়িতে সালাম করতে করতে মাজারে/খানকায়/ জিয়ারত খানায় গমন বা প্রবেশ
১০. মোনাজাত করা
১১. মাজারে নামাজ পড়া
১২. ১৫-২০ মিনিট কুরআন শরীফ পড়া
১৩. মাজারে নুকুলদানা (একধরনের মিষ্টি) দেয়া এবং রোগ-ব্যধি সেরে যাবার আশায় তাবারক হিসেবে এগুলো খাওয়া
১৪. কাগজের তৈরি মালা টানানো
১৫. কবরে তাজা ফুল বা ফুলের তোড়া প্রদান করা
১৬. কবরের কাছে মিলাদ দেয়া
১৭. মুরগী, হাঁস, ছাগল, গরু, কবুতর ইত্যাদি মাজারে উৎসর্গ বা দান করা
১৮. ব্যক্তিগত উদ্যোগে গরু, ছাগল জবাই করে খিচুড়ি বা বিরিয়ানী রান্না করে ফকির-বাউলদের খাওয়ানো
১৯. মাজারে সিন্নি দেয়া (নকুলদানা, বাতাসা, আগরবাতি, মোমবাতি, গোলাপজল ইত্যাদি)
২০. মাজারের দানবাক্সে টাকা-পয়সা এমনকি সোনা-রূপা দান করা
২১. মাজারের মূল কবর ঢেকে দেয়ার জন্য গিলাফ, চাদর, চান্দিনা, জায়নামাজ, পাপোষ, কার্পেট, তসবিহ, দেয়াল ঘড়ি, কুরআন শরীফ, ধর্মীয় পুস্তকাদি ইত্যাদি দান করা হয়
২২. মাজারে নিরবে বা প্রকাশ্যে ক্রন্দন
২৩. ছেলেদের মুসলমানি, আকিকা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য বাদ্য-বাজনাসহ (ছেলেসহ) মাজারে আসা
২৪. মাজারের খুব কাছে না গিয়েও দূর থেকে সালাম বা জিয়ারত করা
২৫. মাজারের মেঝে ছুঁয়ে তায়াম্মুম করা
২৬. ছোট্ট শিশুকে মাজারের সামনে মেঝেতে শুইয়ে দেয়া (এটি খুব কম দেখা যায়)
২৭. পরিষ্কার বা নতুন কাপড় পরে মাজারে আসার প্রচেষ্টা
২৮. অনেক সময় মানত উপলক্ষে দল বেঁধে পরিবার-বন্ধু-বান্ধবসহ উৎসবমুখর পরিবেশে মাজারে আসা
২৯. কবরকে শরীরের পিছন দিক দেখানো নিয়ম নয়। কবরের দিকে মুখ রেখে পিছন হেঁটে মাজার থেকে বের হওয়া
৩০. জানালায় মানত করে সুতা বাঁধা এবং
৩১. একক বা দলগত সঙ্গীত পরিবেশন এবং জিকির করা।

উল্লেখিত প্রায় প্রতিটি আচার-অনুষ্ঠান বিভিন্ন মাজারে এখনও প্রচলিত আছে। তবে এসব আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মাজারের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ, ভক্ত-দর্শনার্থী প্রচলিত

শরীয়াভিত্তিক বিধিবিধান বা আচার-অনুষ্ঠানও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন। গবেষক তথ্য সংগ্রহের সময় মোট ২৯৫ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। এদের মধ্যে ২৬ জন ছিলেন অমুসলিম। নামাজের অভ্যাস বা চর্চা এবং নামাজ পড়ার ধরন সম্পর্কে নিম্নের সারণি ও চিত্রে ২৬৯ জন উত্তরদাতার তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সারণি-০১ : উত্তরদাতাদের নামাজ পড়ার ধরন

ক্রম#	নামাজ পড়ার ধরন	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
০১	নিয়মিত	১২৮	৪৭.৫৮
০২	প্রতিদিন ১/২ ওয়াক্ত	২৯	১০.৭৮
০৩	অনিয়মিত	৪০	১৪.৮৭
০৪	কেবল জুমার নামাজ	২৬	৯.৬৭
০৫	ঈদ/জানাজার নামাজ	১৩	৪.৮৩
০৬	নামাজ পড়া হয় না	৩৩	১২.২৭
মোট		২৬৯	১০০

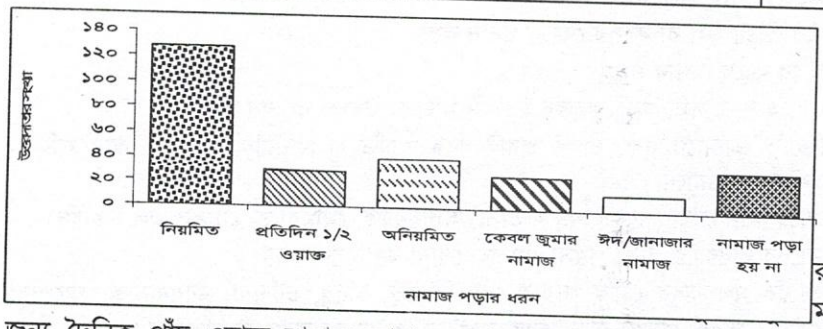

র মধ্যে মানদের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা ফরজ বা অবশ্যকর্তব্য। এ ব্যাপারে পারিবারিক এবং সামাজিক পর্যায়ে কড়াকড়িও লক্ষ্যণীয়। তবুও বাংলাদেশের মুসলিম জনসংখ্যার একটি বড় অংশই নিয়মিত নামাজ আদায় করে না। সে বিবেচনায় মাজার সংশ্লিষ্ট মানুষের মধ্যে নিয়মিত নামাজ আদায়কারীর সংখ্যা কম বলা যাবে না। সারণিতে সর্বোচ্চ ১২৮জন (৪৭.৫৮%) উত্তরদাতা নিয়মিত নামাজ আদায় করেন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪০জন (১৪.৮৭%) উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা অনিয়মিত নামাজ আদায় করেন। ৩৩ জন (১২.২৭%) উত্তরদাতা সরাসরি বলেছেন নানা কারণে তাদের পক্ষে নামাজ পড়া সম্ভব হয় না। এ ছাড়া উত্তরদাতাদের মধ্যে ২৯ জন (১০.৭৮%) প্রতিদিন ১/২ ওয়াক্ত, ২৬ জন (৯.৬৭%) কেবল জুমার নামাজ এবং ১৩জন (১২.২৭%) কেবল ঈদ/জানাজার নামাজ আদায় করেন। জুমা, ঈদ বা জানাজার নামাজে ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছা/আদর্শের প্রতিফলন ঘটানোর কোনও সুযোগ নেই। কেননা এ নামাজগুলো ইমামের পিছনে জামায়াতে আদায় করা হয়। তাই দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত (নিয়মিত/অনিয়মিত) নামাজ আদায়কারীরা (১৯৭জন) কী বিধান অনুসরণ করে নামাজ পড়েন সে সম্পর্কিত তথ্য সারণি- ০২ এ উপস্থাপন করা হল:

সারণি- ০২ : উত্তরদাতাদের নামাজ পড়ার বিধান

ক্রম#	নামাজ পড়ার বিধান	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা
০১	সম্পূর্ণ শরীয়া বিধান	১৫৫	৭৮.৬৮
০২	শরীয়া ও তরিকার সমন্বয়	২৬	১৩.২০
০৩	কেবল তরিকা অনুযায়ী	১৪	৭.১১
০৪	অন্যান্য	০২	১.০১
মোট		১৯৭	১০০

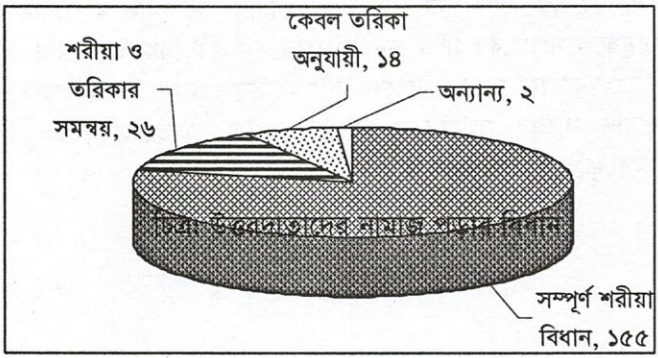

চিত্র: উত্তরদাতাদের নামাজ পড়ার বিধান

মাজার সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ উত্তরদাতাই সম্পূর্ণ শরীয়া বিধান মোতাবেক নামাজ আদায় করেন। সারণিতে এদের সংখ্যা সর্বোচ্চ ১৫৫ জন (৭৮.৬৮%)। ২৬ জন উত্তরদাতা শরীয়া ও তরিকার সমন্বিত বিধান মোতাবেক নামাজ পড়েন। এবং মাত্র ১৪ জন (৭.১১%) উত্তরদাতা কেবল নির্দিষ্ট তরিকার বিধান অনুযায়ী নামাজ আদায় করেন। শেষোক্ত দু'টি বিধান মূলত পীর-ওলী কিংবা দয়াল বাবা নির্দেশনা মতে পরিচালিত হয়। তিনি ভক্ত-মুরিদদেরকে যেভাবে নির্দেশ দেন তারা সেভাবেই নামাজ পড়েন।

লোকধর্মের অনুসারী, বাউল-ফকির কিংবা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর নামাজ বা প্রার্থনায়ও শরীয়তি বিধান পরিপূর্ণরূপে অনুসৃত না হওয়ার নজীর আছে। আবার শরীয়তি বিধানে নামাজ আদায় করেও কোনো কোনো তরিকার অনুসারীগণ নিজস্ব রীতির চর্চাও করেন। যেমন ফরিদপুরের চন্দ্রপাড়া'র ভক্তরা নামাজের মধ্যে নানা রকম উৎকট শব্দ বা চিৎকার করেন[৪৬] (ধর ধর, হেই আল্লা...)। এভাবে নামাজ পড়াকে শরীয়া এবং তরিকার সমন্বিত বিধানের নামাজ বলা যেতে পারে। তবে নামাজ পড়া কোনো লোকাচার নয়। শরিয়তের বিধান মোতাবেক একজন মুসলমানের জন্য দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু শরিয়তী বিধানের বাইরে কেবল তরিকা বা কোনো পীরের নির্দেশনা মোতাবেক নামাজে পৃথক কোনো আচার-প্রথা পালিত হলে তাকে লোকাচার বলা যেতে

পারে। যেমন রুকু ছাড়া সেজদা করে নামাজ (প্রার্থনা) করা এখানে কেবলামুখী হওয়াও বাধ্যতামূলক নয়।

উপসংহার

মাজারসংস্কৃতি আমাদের লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, বর্তমান সময়ের এক অনিবার্য বাস্তবতা। শত বিরোধিতা সত্বেও মাজারসংস্কৃতির জনপ্রিয়তা কমানো যায়নি। ষোল কোটি মানুষের এ দেশের একটি বড় অংশ মাজার তথা মাজারে শায়িত ওলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এসব মাজার, মাজারে শায়িত পীর-ওলী, সুফি-দরবেশ বা দয়ালবাবা এবং মাজার ও খানকা পরিচালনাকারী মোতওয়াল্লি, খাদেম এমনকি বাউল-ফকিরকে ঘিরে তৈরি হয়েছে নানা লোকবিশ্বাস, সংস্কার ও লোকাচার। সুফিবাদ বা পীরবাদ সম্পর্কে নানা বিশ্বাস মানুষকে মাজারের প্রতি অনুরক্ত করেছে। এই বিশ্বাস থেকেই জন্ম হয়েছে মাজারকেন্দ্রিক লোকাচারের। মাজারকে ঘিরে জন্ম নেয়া লোকবিশ্বাস, সংস্কার, লোকাচার ইত্যাদি মাজার সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। মাজারসংস্কৃতি হয়ে উঠেছে আমাদের লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তথ্য নির্দেশ

---

[১] সৌমেন সেন, *লোকসংস্কৃতি: তত্ত্বজিজ্ঞাসা*, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ), কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত, ২০০৩, পৃ. ২।

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

[৩] আবদুল হাফিজ, *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫,পৃ. ৬১।

[4] Carveth Read, Man and his Superstitions, 1925, P. 6 (Online search: Man & the Supernatural, 1925, Kessinger Publishing, Apr 1, 2003 - Social Science, http://books.google.com.bd/books?id=zf18LlXBSXQC&q=Folk+belief+is+the+attitude+of+mind#v=onepage&q=Folk%20belief%20is%20the%20attitude%20of%20mind&f=false)

[৫] প্রাগুক্ত।

[৬] ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *লোকবিশ্বাস ও লোক সংস্কার*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৫।

[৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

[৮] আবদুল হাফিজ, *লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫,পৃ. ২।

[৯] প্রাগুক্ত।

[১০] ড. বরুণ কুমার চক্রবর্তী, *লোকবিশ্বাস ও লোক সংস্কার*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৬।

[১১] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।
[১২] Asim Roy, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Academic Publishers, Dhaka, 1983, P. 224-25.
[১৩] খোরশেদ আলম, বয়স- ৫২, শিক্ষা- এসএসসি, মোতওয়াল্লি, বায়েজিদ বোস্তামীর দরগাহ, চট্টগ্রাম।
[১৪] কাচ্চু মিস্ত্রি, বয়স- ৭২, শিক্ষা- নবম শ্রেণি, প্রবীণ খাদেম, তুরকান শাহ (রহঃ) এর মাজার, রাজশাহী।
[১৫] ইদ্রিস আলী, বয়স- ৪৬, শিক্ষা- স্নাতকোত্তর, পেশা- শিক্ষকতা, মিরপুর-১; আসাদুল্লাহ, বয়স- ৫৩, শিক্ষা- পঞ্চম শ্রেণি, পেশা- প্রাইভেট-কার চালক (অবঃ), মোহাম্মদপুর, ঢাকা; প্রমুখ।
[১৬] গবেষক তথ্যসংগ্রহের সময় প্রত্যক্ষ করেছেন।
[১৭] মোঃ শওকত, বয়স- ৩৫, শিক্ষা- এইচএসসি, পেশা- প্রবাসী, নাজিরহাট, চট্টগ্রাম।
[১৮] সৈয়দ মুর্তাজা আলী, *হযরত শাহ্ জালাল ও সিলেটের ইতিহাস*, উৎস প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৯।
[১৯] রওশনজাহিদ, "মাজার বহুত গরম আছে: একটি বিশ্বাস-সংস্কারের বয়ান", *শ্রহট্টের শ্রীমুখ*, ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৩, পৃ. ৭২।
[২০] প্রাগুক্ত।
[২১] Asim Roy, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Academic Publishers, Dhaka, 1983, P. 209.
[২২] শারমিন, বয়স- ৩২, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, গৃহিনী, অক্সিজেন, চট্টগ্রাম।
[২৩] জোবায়দা ইয়াসমিন, বয়স- ২৮, স্নাতক, পেশা- গৃহিনী; স্বামী- লিয়াকত আলী, বয়স- ৩৬, শিক্ষা- স্নাতক, পেশা- চাকরি, সিলেট সদর।
[24] Abdul Karim, Social History of the Muslim in Bengal, Jatia Grantha Prakashan, Dhaka, 2001, P. 163.
[২৫] রোকেয়া বেগম, বয়স-৬২, শিক্ষা- স্বাক্ষর, পেশা- গৃহিনী, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ।
[২৬] রবিউল ইসলাম, বয়স- ৩৫, পেশা- ব্যবসায়, খাদেম, মধুর মা'র মাজার, বনমালা, টঙ্গী, গাজীপুর।
[২৭] Asim Roy, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Academic Publishers, Dhaka, 1983.
[২৮] Ibid, P. 233.
[২৯] B. Bhushan, *Dictionary of Sociology*, Anmol publications. Pvt. Ltd. Delhi, 1989, P. 101.
[৩০] স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, *ধর্ম কুসংস্কার ও লোকাচার*, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৪৭।
[৩১] গবেষক তথ্য সংগ্রহের সময় প্রত্যক্ষ করেছেন।
[৩২] জাহাঙ্গীর আলম, বয়স- ৩৫, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণী, খাদেম, বায়েজীদ বোস্তামী (রহঃ) মাজার, চট্টগ্রাম।
[৩৩] গবেষক তথ্য সংগ্রহের সময় প্রত্যক্ষ করেছেন।
[৩৪] ইদ্রিস আলী, বয়স- ৪৬, শিক্ষা- স্নাতকোত্তর, পেশা- শিক্ষকতা, মিরপুর-১; ঢাকা।
[৩৫] ডা. নূরুজ্জামান ভান্ডারি, বয়স- ৪৭ বছর, শিক্ষা- নবম শ্রেণি, পেশা- পল্লী চিকিৎসক, মনিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।
[৩৬] জব্বার হোসেন ও খন্দকার তাজউদ্দিন, *দানবাক্স বাণিজ্য: প্রতিদিন আয় আড়াই লাখ*, "সাপ্তাহিক ২০০০", ২৯ জুলাই, ২০০৫, ঢাকা।
[৩৭] ডা. নূরুজ্জামান ভান্ডারি, বয়স- ৪৭ বছর, শিক্ষা- নবম শ্রেণি, পেশা- পল্লী চিকিৎসক, মনিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

[৩৮] Asim Roy, The Islamic Syncretistic Tradition in Bengal, Academic Publishers, Dhaka, 1983, P. 209.

[৩৯] গবেষক তথ্য সংগ্রহের সময় প্রত্যক্ষ করেছেন।

[৪০] গবেষক তথ্য সংগ্রহের সময় প্রত্যক্ষ করেছেন।

[৪১] ইবনে মাজাহ কিতাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস।

[৪২] আলাউদ্দিন জালালী, বয়স- ৫২, শিক্ষা- তৃতীয় শ্রেণি, পেশা- গান করা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

[৪৩] জুলেখা বেগম, বয়স- ৫৫, শিক্ষা- স্বাক্ষর, পেশা- ধাত্রী, এরশাদনগর, টঙ্গী, গাজীপুর; আব্দুল খালেক, বয়স- ৫৮, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, পেশা- বাবুর্চি, সোবাহানবাগ, ঢাকা; প্রমুখ।

[৪৪] সুরাইয়া বেগম ও হাসিনা আহমেদ, *মাজার সংস্কৃতি ও বাংলাদেশ*, ঢাকা, সমাজ নিরীক্ষণ, ১৯৯০, সংখ্যা- ৩৮।

[৪৫] প্রাগুক্ত।

[৪৬] গবেষক তথ্যসংগ্রহের সময় প্রত্যক্ষ করেছেন।

ISSN: 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট : বাজার প্রতিযোগিতা কাঠামো ও ভোক্তা আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

এম. জাহাঙ্গীর কবির*

Abstract: In the present world, with the implementation of internet into mobile devices, and with the combination of these two, the ubiquitous internet connectivity has become a reality. According to the BTRC, the total number of internet users in Bangladesh as of late 2010 was about eight millions and the active internet connections have reached to only 600 thousands. It is a matter of concern that, according to the World Bank statistics, the regular internet user in Bangladesh is only one million. But, in Bangladesh, a country with 78 millions mobile connections, digital divide could be easily narrowed by mobile internet. Simultaneously, in a rapidly expanding mobile telecommunication market like Bangladesh, mobile internet may be a lucrative business opportunity for any company. It is evident that, success of any product largely depends on the competitive structure of relevant market and consumer perception regarding the specific product. Keeping all the things in mind, the market competition of mobile internet in Bangladesh, factors affecting consumer perception, and barriers to use mobile internet have been chosen as the subject matter of this paper. To investigate the core issue, in the first part of this paper Porter's Five Forces Model of Competition has been used, and in the second part an empirical study has been conducted to analyze the factors affecting consumer perception regarding mobile internet.

১. ভূমিকা

মোবাইলে ইন্টারনেটের ব্যবহার ক্রমেই বিশ্বজুড়ে দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সার্চ ইঞ্জিন গুগলের হিসাবে গত দুই বছরে (২০০৯ ও ২০১০ সালে) বিশ্বে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বেড়েছে প্রায় পাঁচগুণ এবং এই সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়েই

* সহকারী অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।

চলেছে।[১] বিশ্বজুড়ে মোবাইল ফোনের ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে ইন্টারনেটের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে বিশ্ব এখন মোবাইল ইন্টারনেটের যুগে প্রবেশ করেছে, যা গত পাঁচ দশকের তথ্যপ্রযুক্তির পঞ্চম পর্যায় বলে বিবেচিত হচ্ছে।[২]

বর্তমানে নতুন প্রজন্মের একটা বড় অংশ মোবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ইমেইল করতে, শেয়ারবাজারে বর্তমান দর জানতে, এবং ফেসবুকে চ্যাট করতে অহরহই কর্মব্যস্ত মানুষজন মোবাইল ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হয়। মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত যে কোনো স্থান থেকে একটি মধ্যম ক্ষমতার মোবাইল সেট দিয়েই ইন্টারনেট সেবা পাওয়া সম্ভব। ১৯৯০ এর আগ পর্যন্ত মোবাইল ইন্টারনেট শুধু ওয়াপ প্রযুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আইফোন এবং টাচস্ক্রিন প্রযুক্তির আবির্ভাবের ফলে এখাতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়।

৯০ এর দশক থেকেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল নিয়ামক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে।[৩] বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তি বিশ্বে অন্যতম আলোচনার বিষয় ডিজিটাল ডিভাইডের মূল উৎস হচ্ছে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের অসমতা। এই পার্থক্য হ্রাসকল্পে অনেক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিন্তু সফলতা আসেনি। বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের রয়েছে অমিত সম্ভাবনা। এখানে খুব অল্প সংখ্যক মানুষেরই ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ কম্পিউটার আছে। বিপরীতে প্রায় সকলের কাছেই রয়েছে একটি করে মোবাইল সেট। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পৌঁছে গেছে একাধিক মোবাইল কোম্পানির নেটওয়ার্ক। ফলে দুর্গম এলাকাতেও মোবাইল ফোনের একজন গ্রাহক খুব সহজেই ইন্টারনেটের আওতায় থাকতে পারছে।

বাংলাদেশে মোবাইলের গ্রাহকসংখ্যা বর্তমানে ৭৩ মিলিয়ন[৪] হলেও ইন্টারনেটের ব্যবহার এখনও আশাব্যঞ্জক নয়। বিটিআরসি এর হিসাবমতে বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে ৮ মিলিয়ন হলেও আশঙ্কাজনক ভাবে লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশে সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা ৬ লাখের অধিক নয়।[৫] বিশ্বব্যাংকের হিসাবে নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মাত্র ১ মিলিয়ন। অতএব বাংলাদেশের মতো একটি দ্রুত বর্ধনশীল মোবাইল বাজারে মোবাইল ইন্টারনেট হতে পারে যে কোনো কোম্পানির জন্য আর্কষণীয় বিনিয়োগ সুযোগ।

---

[১] http://www.internetworldstats.com/top20.htm, প্রেক্ষণ: ২২ মে ২০১১।

[২] Wireless Internet Institute, *The Wireless Internet Opportunity for Developing Countries* (Boston: World Times Inc., 2003), 3.

[৩] Ibid., XI.

[৪] http://www.btrc.gov.bd/newsandevents/mobile_phone_subscribers/mobile_phone_subscribers_march_2011.php, প্রেক্ষণ: ২০ মে ২০১১।

[৫] Md Fazlur Rahman, "Net Users Grow, Contents Not," *The Daily Star*, 21 January 2011, Friday.

বাজারজাতকরণের তত্ত্বসমূহে একথা পরিষ্কার যে, কোন বিনিয়োগের সাফল্য এবং পণ্যের প্রসার নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট বাজারে প্রতিযোগিতার ধরণ এবং নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবার বৈশিষ্ট্যাবলীর প্রতি ভোক্তাদের প্রত্যক্ষণ দ্বারা। অতএব বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের প্রসার ঘটিয়ে ডিজিটাল ডিভাইড দুর করতে হলে এই বাজারের প্রতিযোগিতা, ভোক্তা আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান, এবং উক্ত সেবা ব্যবহারে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে সেগুলো সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। একথা প্রমাণিত যে, কোন প্রযুক্তি ব্যবহারে অনীহার পেছনে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির সুবিধার ঘাটতি অপেক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতাই বেশি দায়ী।

কোন পণ্য বা সেবার ভোক্তা প্রত্যক্ষিত সুবিধা ও অসুবিধাই অনেকাংশে নির্দিষ্ট করে দেয় যে, ঐ পণ্য বা সেবা ভোক্তা কি মাত্রায় ব্যবহার করবে। এজন্যই বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট বাজারে প্রতিযোগিতার ধরণ নির্ণয় এবং ভোক্তা আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান নির্ধারণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। গবেষণা কর্মটি নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে:

১. বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট বাজারে প্রতিযোগিতা কেমন?
২. বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের ভোক্তা প্রত্যক্ষিত সুফল কোনগুলো?
৩. বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট বিস্তারে মূল প্রতিবন্ধকতা কি কি?

গবেষণা প্রশ্নসমূহের আলোকে কিছু সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য স্থির করা হয়:

১. বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট বাজারের প্রতিযোগিতার ধরণ বিশ্লেষণ।
২. বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের ভোক্তা প্রত্যক্ষিত সুফল নির্ণয়।
৩. বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে ভোক্তা প্রত্যক্ষিত প্রতিবন্ধকতা নির্ণয়।

২. গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা প্রশ্নের আলোকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের ভিত্তিতে গবেষণাটি দুই ধাপে সম্পন্ন করা হয়। প্রথম ধাপে আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট বাজারে প্রতিযোগিতার ধরণ নির্ণয় করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় ধাপে জরিপের মাধ্যমে ভোক্তা আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান নির্ণয় করা হয়েছে।

প্রথম ধাপে মোবাইল ইন্টারনেট বাজারের প্রতিযোগিতা কাঠামো নির্ণয়ে মাইকেল পর্টারের সর্বাধিক প্রচলিত ও গ্রহণযোগ্য পঞ্চশক্তি মডেল (Five Forces Model) ব্যবহার করা হয়েছে। পর্টারের মতে, কোনো পণ্য বা সেবার বাজারে প্রতিযোগিতার মাত্রা নির্ধারিত হয় পাঁচটি প্রধান বাজার শক্তির সমন্বিত অন্যোন্যক্রিয়ার দ্বারা।[৬] তবে এ মিথস্ক্রিয়ার মাত্রা যাই হোক না কেন একটি কোম্পানি তার উপযুক্ত কৌশল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজার হুমকি থেকে নিজেকে রক্ষা করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অবস্থান

---

[৬] Michael E. Porter, *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors* (New York: Free Press, 1980), chapter 1.

শক্তিশালী করতে পারে।[৭] হার্ভাড বিজনেস রিভিউতে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে পর্টার সর্বপ্রথম এ পঞ্চশক্তির অবতারণা করেন। শক্তিগুলো যথাক্রমে–

- বাজারে প্রবেশ প্রতিবন্ধকতা।
- ক্রেতার দরকষাকষি ক্ষমতা।
- যোগানদারের দরকষাকষি ক্ষমতা।
- বিকল্প পণ্যের প্রাপ্যতা।
- বিদ্যমান কোম্পানিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা।[৮]

বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট বাজারে প্রতিযোগিতা কাঠামো নির্ণয়ে এই পঞ্চশক্তির আলোকে বিভিন্ন সহায়ক উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রধান প্রধান উৎস হিসেবে বিটিআরসি, মোবাইল কোম্পানিগুলোর বার্ষিক রিপোর্ট, মাসিক ও দৈনিক পত্রিকা, প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য।

মোবাইল সেবা নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম সংগঠিত হলেও ভোক্তা পর্যায়ে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান নিরূপণের জন্য তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা পরিলক্ষিত হয় না। অধিকাংশ গবেষকের কাজের পরিধি ছিল তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী এবং মূল উদ্দেশ্য ছিল মোবাইল কমার্স বা মোবাইল ইন্টারনেটের কিছু সাধারণ বিষয়কে ব্যবহারের প্রেষণা হিসেবে উল্লেখ করার প্রচেষ্ঠা। এ বিষয়গুলোর মধ্যে আবার নমনীয়তা ও বহণযোগ্যতা নিয়ে সর্বাধিক কাজ করা হয়েছে।[৯] এসব বৈশিষ্ট্য এত বেশি সাধারণ যে, ভোক্তা পর্যায়ে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান নির্ণয়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত মোবাইল অপারেটরগুলো কৌশল ব্যবস্থাপনায় বেশ সমস্যায় পড়ে যায়। আমরা বর্তমান মোবাইল ইন্টারনেট প্রযুক্তির দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব ভোক্তারা থ্রিজি (3G) এর মতো উন্নততর বৈশিষ্ট্যকে কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে।

এজন্য দ্বিতীয় ধাপে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে ভোক্তা আচরণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান নির্ণয়ে প্রায়োগিক গবেষণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। গবেষণা পর্যালোচনার মাধ্যমে সর্বপ্রথম মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহারে ভোক্তা প্রত্যক্ষিত সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর নির্ধারিত সূচকের আলোকে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে ভোক্তা প্রত্যক্ষিত সুফল এবং প্রতিবন্ধকতা অনুধাবনে একটি প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ জরিপ পরিচালনা করা হয়। প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, এবং হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০০ জন

---

[৭] Arthur A. Thompson and A. J. Strickland, *Strategic Management: Concepts and Cases* (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2004), 80.

[৮] Arthur A. Thompson and A. J. Strickland, 81.

[৯] J. Herman and T. Neff, "Managing through the M-commerce Storm," in *World Market Series Business Briefings: Wireless Technology 2002* (New York: World Market Research Center, 2002), 79.

ছাত্রকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। নমুনা স্থিরের পরে একটি প্রশ্নপত্রের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ সম্পন্ন করা হয়। প্রশ্নপত্রটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল–

১. ব্যক্তিগত তথ্য ও মোবাইল ইন্টারনেটে অভিজ্ঞতা।
২. মোবাইল ইন্টারনেটের প্রত্যক্ষিত সুফল সম্পর্কিত ১৪টি প্রশ্ন।
৩. মোবাইল ইন্টারনেট বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কিত ১২টি প্রশ্ন।

এই প্রশ্নপত্রে ভোক্তাদের মনোভাব জানতে লিকার্টের ৫ পয়েন্ট স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে ছাত্রদের প্রশ্নপত্রে বর্ণিত বিবৃতিগুলো সম্পর্কে তাদের মতামত প্রকাশ করতে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে এ মতামতগুলো সংখ্যায় (৫= চূড়ান্তভাবে সম্মত থেকে ১= চূড়ান্তভাবে অসম্মত) রূপান্তরিত করে গড় ও পরিমিত ব্যবধান নির্ণয় করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও ডাকযোগে প্রশ্নপত্র প্রেরণ করা হয়। ১০০ টি প্রশ্নপত্রের মধ্যে ৭৯ টি ব্যবহারযোগ্য প্রশ্নপত্র গৃহীত হয়।

৩.১. বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট বাজারে প্রতিযোগিতার ধরণ

এ গবেষণায় পর্টারের পঞ্চশক্তি মডেলের আলোকে বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট বাজারের প্রতিযোগিতা কাঠামো আলোচনা করা হয়েছে। একটি নতুন কোম্পানি যখন কোনো বাজারে প্রবেশ করতে যায় তখন সংশ্লিষ্ট বাজারে প্রবেশ প্রতিবন্ধকতার মাত্রা বিশ্লেষণ খুবই প্রয়োজনীয়। প্রবেশ প্রতিবন্ধকতার সাথে বাজার প্রতিযোগিতার নেতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান। প্রবেশ প্রতিবন্ধকতা বেশি হলে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায় আবার প্রতিবন্ধকতা কম হলে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল ডিভাইড দুরীকরণের জন্য এক মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে যা ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকার ৯০ এর দশক থেকেই বৈদেশিক বিনিয়োগ আর্কষণে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। এ লক্ষে কর অবকাশ সুবিধা ২০১৩[১০] সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং মুনাফা স্থানান্তরের সুবিধাসহ বৈদেশিক কোম্পানিগুলোকে বিভিন্ন প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে। সম্প্রতি বাজেট বক্তৃতায় বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী মোবাইল সিমের উপর কর ৮০০ টাকা থেকে হ্রাস করে ৬০০ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব দিয়েছেন।[১১] এসব প্রণোদনা বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট প্রসারে ভূমিকা রাখবে এবং বাজার প্রবেশ প্রতিবন্ধকতা হ্রাস করবে। তবে এ সকল সুবিধার পাশাপাশি বাজার প্রবেশে কিছু সমস্যাও আছে। লাইসেন্স প্রাপ্তিতে জটিলতা, থ্রিজি (3G) এর মতো উন্নত প্রযুক্তি অবমুক্তকরণে অনীহা, এবং উচ্চহারে সিম করারোপ নতুন কোম্পানিকে এ বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুৎসাহী করছে।

---

[১০] আবুল মাল আব্দুল মুহিত, ২০১১-২০১২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতা।
[১১] তদেব।

সারণি ১: বাংলাদেশে নিয়মিত[১২] ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা (হাজার)[১৩]

সাল	ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা (হাজার)	যৌগিক বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি
২০০০	১০০	--
২০০২	২০০	৪১.৪২%
২০০৪	৩০০	২২.৪৭%
২০০৬	৪৫০	২২.৪৭%
২০০৮	৫৬০	১১.৫৫%
২০১০	১০০০	৩৩.৬৩%

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি মোবাইল অপারেটর রয়েছে। বিটিআরসি এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোবাইল সেবার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৭৩ মিলিয়ন হলেও ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মাত্র ৮ মিলিয়ন।[১৪] তাদের মধ্যে আবার অধিকাংশই অনিয়মিতভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আর সব মিলিয়ে বাংলাদেশে সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা মাত্র ৬ লাখ। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মাত্র ১ মিলিয়ন।

সারণি ২: বাংলাদেশে মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা (মিলিয়ন)[১৫]

মোবাইল অপারেটর	মার্চ ২০০৯	ফেব্রুয়ারি ২০১০	মার্চ ২০১১	যৌগিক বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি
গ্রামীনফোন	২১.০৫	২৩.৭৫	৩১.৯৮	২৩.২৬%
বাংলালিংক	১০.৮৩	১৪.১৩	২০.১৩	৩৬.৩৪%
রবি	৮.৭৬	১০.৩১	১৩.২৬	২৩.০৩%
এয়ারটেল	২.২৬	৩.০০	৪.৬১	৪২.৮২%
সিটিসেল	১.৮৭	১.৯৪	১.৭৯	-২.১৬%
টেলিটক	০.৯৮	১.০৪	১.২০	১০.৬৬%
মোট	৪৫.৭৫	৫৪.১৫	৭২.৯৬	২৬.২৮%

আপাতদৃষ্টিতে ৭৩ মিলিয়ন ভোক্তার মোবাইল বাজার এবং ৮ মিলিয়ন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দেখে মনে হয় বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট বাজারে ভোক্তা দরকষাকষি ক্ষমতা অনেক বেশি। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগ এবং সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাবে সরকারের দুইধাপে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মূল্য কমানোর[১৬] পরেও ভোক্তা পর্যায়ে ইন্টারনেট সেবার মূল্য হ্রাস না পাওয়া ভোক্তার দরকষাকষি ক্ষমতার দুর্বল অবস্থাই নির্দেশ করে।

---

[১২] নিয়মিত ইন্টারনেট ব্যবহারকারী বলতে বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী যারা নূন্যতম ৩০ দিনে একবার ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

[১৩] http://devdata.worldbank.org/ict/bgd_ict.pdf/, প্রেক্ষণ: ১২ ডিসেম্বর ২০১১; www.tradingeconomics.com/bangladesh/internet_usera_wb_data.html/, প্রেক্ষণ: ১২ ডিসেম্বর ২০১১।

[১৪] Md Fazlur Rahman.

[১৫] http://www.btrc.gov.bd/newsandevents/mobile_phone_subscribers/, প্রেক্ষণ: ২০ মে ২০১১।

[১৬] http://www.tech.net.bd/imdadulhaq/2011/01/15/number-of-internet-subscribers-touches-6-million-in-bangladesh/, প্রেক্ষণ: ২০ মে ২০১১।

সারণি ৩: বাংলাদেশে সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যার প্রবৃদ্ধি (হাজার)

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর ধরণ	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	যৌগিক বার্ষিক গড় প্রবৃদ্ধি
মোবাইল অপারেটর	--	২০	১০০	৩২০	৩০০.০০%
ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আই এস পি)	১৭৫	১৮০	১৯০	২০০	৪.৫৫%
ওয়াই ম্যাক্স	--	--	২০	৮০	৩০০.০০%
মোট	১৭৫	২০০	৩১০	৬০০	৫০.৭৯%

বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেটের প্রয়োজনীয় হার্ডওয়ার- সরঞ্জাম যোগানের ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান এরিকসন এবং নকিয়া অন্যতম। আর ব্যান্ডউইথের জন্য মোবাইল কোম্পানিগুলো সম্পূর্ণভাবে বিটিআরসি এর উপর নির্ভরশীল। তবে সুস্পষ্ট নীতিমালার অভাবে বিটিআরসি এখনও মোবাইল অপারেটরদের বাজারজাতকৃত ইন্টারনেট সেবার মূল্য নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। তাই বলা যায় যোগানদার পক্ষ এ বাজারে মধ্যম দরকষাকষি সক্ষমতা ধারণ করে আছে।

বাংলাদেশের ইন্টারনেট বাজারে প্রায় ২০০টি আই.এস.পি. (ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার), ২টি ওয়াইম্যাক্স কোম্পানি, এবং ৬টি মোবাইল অপারেটরের উপস্থিতির ফলে ভোক্তাদের নিকট যথেষ্ট বিকল্প সেবা বিদ্যমান রয়েছে।[১৭] কিন্তু নিম্ন মাথাপিছু ও ব্যয়যোগ্য আয়ের কারণে এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানিতে স্থানান্তর ভোক্তাদের জন্য সম্ভবপর হয় না। আবার মোবাইল ইন্টারনেটের বিকল্প হিসেবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটও সহজলভ্য নয়।

সারণি ৪: ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত সক্রিয় ইন্টারনেট সংযোগ সংখ্যা (হাজার)[১৮]

ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর ধরণ	ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারীর সংখ্যা	সক্রিয় সংযোগ সংখ্যা
মোবাইল অপারেটর	৬ টি (গ্রামীনফোন, বাংলালিংক, রবি, এয়ারটেল, সিটিসেল, টেলিটক)	৩২০
ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আই এস পি)	২০০ টি	২০০
ওয়াই ম্যাক্স	২ টি (কিউবি এবং বাংলালায়ন)	৮০
মোট		৬০০

[১৭] http://www.btrc.gov.bd/, প্রেক্ষণ: ১২ মে ২০১১।

[১৮] Ibid.

মোবাইল অপারেটরদের বাজারজাতকৃত ইন্টারনেট সেবার মূল্য, গতি, এবং নেটওয়ার্কের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এক্ষেত্রে কথোপকথন মূল্যের মতো প্রতিযোগিতা নেই। অপারেটরদের নিজেদের মধ্যে স্বল্প মূল্যে ভোক্তা সেবা প্রদানের কৌশল প্রতিপালনে বাস্তবিক অনীহা বিরাজমান। ফলে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা প্রদান ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কথোপকথন সেবার ন্যায় মারাত্মক নয় বরং অনেকটা মধ্যম মানের। আর বিকল্প হিসেবে ব্রডব্যান্ড এবং ওয়াইম্যাক্স এখনও অপ্রতুল যা শুধু বড় শহরগুলোতেই সীমাবদ্ধ।

উপরোক্ত পঞ্চশক্তির মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মধ্যম প্রবেশ প্রতিবন্ধকতা, নিম্ন ভোক্তা দরকষাকষি সক্ষমতা, মধ্যম যোগানদার দরকষাকষি সক্ষমতা, মধ্যম মাত্রার বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবং বিকল্প সেবার অপ্রতুলতার কারণে বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট বাজারে প্রতিযোগিতার ধরণ তেমন মারাত্মক নয় বরং সহনশীল।

যদিও, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণে মূখ্য ভূমিকা পালন করে তথাপি নতুন এ বর্ধণশীল সেবা বাজারের মধ্যম সহনশীল প্রতিযোগিতা অন্যান্য নতুন কোম্পানিকে মোবাইল ইন্টারনেট সেবা বাজারজাতকরণে আগ্রহী করবে। যা পরিশেষে বাংলাদেশের মোবাইল ব্যবহারকারীদের মধ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের প্রেষণা বৃদ্ধি করে ডিজিটাল ডিভাইড দুরীকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

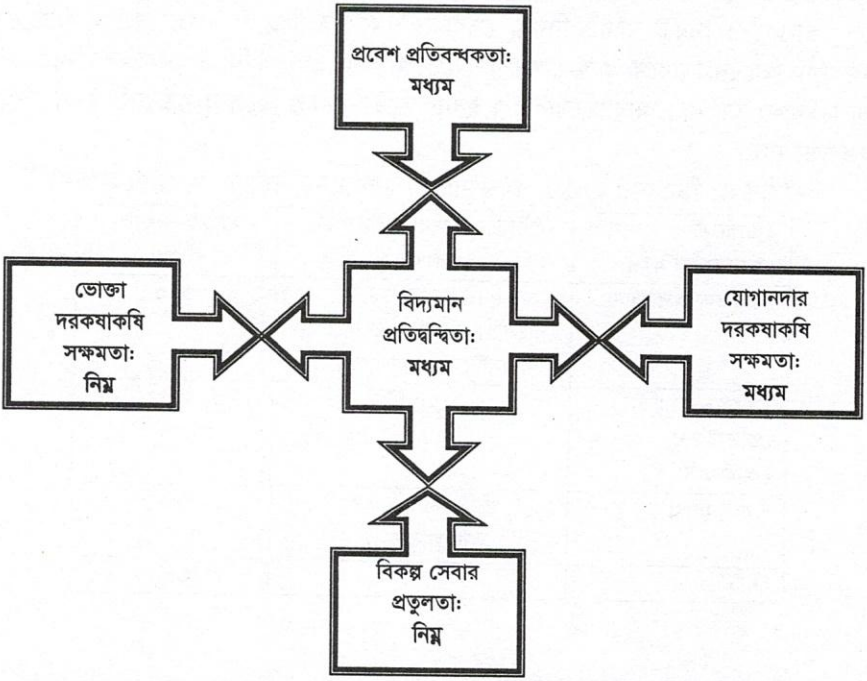

চিত্র: পর্টারের পঞ্চশক্তি মডেলের আলোকে বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট বাজারের প্রতিযোগিতা কাঠামো

৩.২. মোবাইল ইন্টারনেটের ভোক্তা প্রত্যক্ষিত সুফল ও প্রতিবন্ধকতা

১৯৯০ এর পরবর্তী সময়ে মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহারে ভোক্তা আচরণ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা কর্ম সংগঠিত হয়েছে। এসব গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল মোবাইল কমার্স ব্যবহারে ভোক্তাদের প্রত্যাশিত ও প্রত্যক্ষিত সুবিধা নির্ণয়। সাস্টার দেখিয়েছেন সেবা মূল্যই এক্ষেত্রে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি তিনি উন্নত মোবাইল সেট, সহজ ব্যবহার, কার্যকরী সেবা, নিরাপদ তথ্য স্থানান্তর, এবং উন্নত নেটওয়ার্ক সুবিধাকে মোবাইল ইন্টারনেট বিস্তারে সহায়ক উপাদান হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[১৯] গিলিক এবং ভ্যানডারহুফ মোবাইল কমার্সের অসুবিধার ক্ষেত্রে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন; প্রযুক্তি পরিমিতকরণ, ব্যবসায়িক দর্শন, ভোক্তা প্রত্যাশা, নিরাপত্তা, এবং স্বাতন্ত্র্য।[২০] বিশ্বখ্যাত নকিয়া কোম্পানির একটি বাজার গবেষণা থেকে জানা যায় প্রত্যক্ষিত সুফলের অনুপস্থিতি, রক্ষণশীলতা, এবং ব্যক্তি নিরাপত্তাহীনতা মোবাইল সেবা ব্যবহারের মূল প্রতিবন্ধক। পক্ষান্তরে, নিয়ন্ত্রণের সুবিধা এ সেবায় প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে।[২১] ষ্ট্রং এবং ওল্ড তাদের ইউ.কে. ভিত্তিক জরিপে দেখেছেন যে কোনো সময়ে যে কোনো স্থান থেকে ইন্টারনেটের সেবা প্রাপ্তি মোবাইল ইন্টারনেটের সবচেয়ে ইতিবাচক দিক আর ইন্টারনেট বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব, পরিচালন ব্যয়, ছোট পর্দা, এবং দুর্বল অনুসন্ধান সুবিধা এ সেবার মূল সমস্যা।[২২]

মোবাইল ইন্টারনেট বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে হলে শুধুমাত্র মোবাইল ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভোক্তাদের কি সুবিধা দেওয়া যায় তার প্রতি আলোকপাত না করে কোন কোন প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যার কারণে ভোক্তারা মোবাইল ইন্টারনেট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে সেদিকেও আলোকপাত করা প্রয়োজন। বাজারজাতকরণের বিভিন্ন তত্ত্বে এটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভোক্তার ক্রয় আচরণ অনেকাংশে ভোক্তার মূল্য প্রত্যক্ষণের সাথে সম্পর্কযুক্ত[২৩] এবং ভোক্তার মূল্য বিবেচনা আবার যুগপৎ অনুমিত বস্তু

---

[১৯] T. Shuster, "Pocket Internet and M-Commerce - (How) Will it Fly?" (February 2001), www.gwu.edu/~emkt/Ecommerce/file/Mcommerce.pdf, প্রেক্ষণ: ১২ মে ২০১১।

[২০] K. Gillick and R. Vanderhoof, "Mobile E-commerce: Marketplace Enablers and Inhibitors," *Paper presented at the Smart Card Forum Annual Meeting*, (25–28 September 2000), www.datacard.com/downloads/pdf/white_paper_ecommerce.pdf, প্রেক্ষণ: ১৭ জুন ২০১১।

[২১] Nokia 3G Market Research Centre, "M-commerce: An End User Perspective. Key Learnings from Global Research," *Nokia 3G Market Research Report* (May 2001), www.nokia.com/3G, প্রেক্ষণ: ২৫ এপ্রিল ২০১১।

[২২] C. Strong and J. Old, "How Can Mobile Developments Deliver Customer End-Value?" in *White Paper on Mobile Internet Applications*, (London: NOP Research Group, 2000), 187.

[২৩] G. H. G. McDougall and T. Levesque, "Customer Satisfaction with Services: Putting Perceived Value into the Equation," *Journal of Services Marketing*, Vol. 14, No.5 (2000): 393.

উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল।[২৪] এসব বিষয় বিবেচনা করে বলা যায় কোনো কোম্পানি ভোক্তা মূল্য নিরূপণে যদি শুধুমাত্র প্রাচীন উৎপাদনব্যয় হিসাব পদ্ধতি প্রয়োগ করে তবে সেই মোবাইল অপারেটর প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভোক্তা আকর্ষণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। তাই মোবাইল ইন্টারনেটের বিস্তার করতে হলে সমন্বিত সুবিধা ও প্রতিবন্ধকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাজার পর্যালোচনা করাই যুক্তিসংগত হবে।

উপরোক্ত গবেষণা পর্যালোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে ভোক্তা আচরণ শুধুমাত্র এর সুফলের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং মোবাইল সেট এবং মোবাইলের মাধ্যমে প্রাপ্ত সকল সেবার সুফল ও সমস্যার একটি সমন্বিত ক্রিয়াশীলতা। মোবাইল ইন্টারনেটের বিস্তার অনেকাংশে নির্ভর করে ভোক্তার মোবাইল সেটকে শুধুমাত্র ব্যক্তি যোগাযোগের মাধ্যম ছাড়াও উন্নত সকল যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার যোগ্যতার উপর। বর্তমান গবেষণার প্রয়োজনে বিভিন্ন গবেষণা পর্যালোচনা করে মোবাইল ইন্টারনেটের ১৪টি সম্ভাব্য সুফল নির্ধারণ করা হয়েছে। অতঃপর সুফলগুলো সম্পর্কে ছাত্রদের মতামত সারণি-৩ এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সারণি-৩ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে; নমনশীলতা, উন্নত যোগাযোগ বৈশিষ্ট্য, এবং অভূতপূর্ব যোগাযোগ সক্ষমতা বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভোক্তাদের সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে।

সারণি ৩: মোবাইল ইন্টারনেটের ভোক্তা প্রত্যক্ষিত সুফল

সুফল	গড়	পরিমিত ব্যবধান	সম্মত (%)	অসম্মত (%)
নমনশীলতা	৪.১০	০.৬৭	৮৯.৯০	৩.৮০
উন্নত যোগাযোগ বৈশিষ্ট্য	৪.০৬	০.৭২	৯২.৪০	৭.৬০
অভূতপূর্ব যোগযোগ সক্ষমতা	৪.০২	০.৯১	৮৩.৫০	৭.৬০
তাৎক্ষণিক তথ্য সেবা	৩.৯১	০.৭৪	৮১.১০	৬.৩০
হাতের কাছে মেলে এমন সুবিধাজনক যন্ত্র	৩.৮৪	০.৭৬	৮৩.৫০	৮.৯০
সময়ের সর্বোচ্চ ব্যবহার	৩.৬৭	১.২১	৭৪.৭০	২২.৮০
আমোদজনক বৈশিষ্ট্য	৩.৬৩	১.১০	৬৭.১০	২৪.১০
অনন্যতা	৩.৫৬	০.৯৬	৬৩.৩০	১৬.৪০
ব্যক্তিগত যত্নশীল তথ্য ও সেবা	৩.৪৭	১.০৮	৫৮.৪০	২৪.০০
হাল ফ্যাশান	৩.৪১	১.০২	৫৬.৯০	২৪.০০
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৩.০৬	১.২১	৪৯.৪০	৪৫.৬০
স্বল্প সেবা মূল্য	২.৯৭	১.৩০	৩৬.৭০	৪৪.৩০
কম্পিউটারের অভাব	২.৫৪	১.৩৮	৩৪.২০	৬৩.৩০
কম্পিউটারে অদক্ষতার বিকল্প	২.৪০	১.২৮	২৯.১০	৬৮.৪০

[২৪] J. Han and D. Han, "A Framework for Analyzing Customer Value of Internet Business," *Journal of Information Technology Theory and Application*, Vol. 3, No. 5 (2001): 35.

পূর্বের কিছু গবেষণায় দেখানো হয়েছে কম্পিউটারে অদক্ষতা এবং কম্পিউটারের বিকল্প হিসেবে মোবাইল ফোনের ব্যবহার মোবাইল ইন্টারনেট প্রসারের বড় কারণ।[২৫] বর্তমান গবেষণা এমন ধারণার সাথে দ্বিমত পোষণ করে।

একটি গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে শুধু মোবাইল সেটের বহণযোগ্যতার সুবিধা দিয়ে দ্রুত মোবাইল ইন্টারনেটের প্রসার ঘটানো সম্ভব।[২৬] কিন্তু বর্তমান গবেষণায় এটা প্রমাণ হয় না, কারণ শুধুমাত্র বহণযোগ্যতা সুবিধা দিয়ে মোবাইল ইন্টারনেটের প্রসার ঘটলে ৭৩ মিলিয়ন মোবাইল গ্রাহকের বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মাত্র ৮ মিলিয়নে সীমাবদ্ধ থাকত না।

বাজারজাতকরণের মূলভিত্তি ভোক্তা প্রত্যক্ষণ, শুধু পণ্য নয়। ভোক্তারা সবসময় তাদের প্রত্যক্ষিত উপযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতার উপরে ভিত্তি করে ক্রয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ কারণেই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভোক্তা সন্তুষ্টি বৃদ্ধির মাধ্যমে মোবাইল ইন্টারনেটের প্রসার ঘটাতে হলে ভোক্তাদের প্রত্যক্ষিত প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

সারণি ৪: মোবাইল ইন্টারনেটের ভোক্তা প্রত্যক্ষিত প্রতিবন্ধকতা

প্রতিবন্ধকতা	গড়	পরিমিত ব্যবধান	সম্মত (%)	অসম্মত (%)
মোবাইল সেটের সীমিত ক্ষমতা	৪.১৫	০.৯২	৮৯.৮০	৮.৯০
শ্লথ গতি ও তথ্য পরিবহণ	৩.৯৩	১.১৬	৭৫.৯০	১৯.০০
দুর্বল নেটওয়ার্ক	৩.৯৩	১.০০	৭৯.৮০	১৬.৫
মোবাইল সেটের ছোট পর্দা	৩.৮৬	০.৯৮	৮৩.৬০	১৩.৯০
নিরাপত্তা ঝুঁকি	৩.৮৪	০.৮৪	৮৭.৩০	৮.৯০
ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হুমকি	৩.৭৩	১.০৫	৬৯.৬০	১৬.৫০
মোবাইল সেবা ব্যবহারে জটিলতা	৩.৬৭	১.১৮	৭০.৯০	২১.৫০
উচ্চ পরিচালন ব্যয়	৩.৫৩	১.১৪	৬৩.৩০	২৫.৩০
অপ্রয়োজনীয় সেবা	৩.৩৪	১.১৫	৫৭.০০	২৫.৩০
উচ্চ প্রাথমিক ব্যয়	৩.২৮	১.১৯	৫৫.৭০	৩৬.৭০
মোবাইল সেট ব্যবহারে জটিলতা	২.৮৯	১.১৯	৪১.৭০	৪৮.১০
বাজারে নতুন মোবাইল সেটের অভাব	২.৭৭	১.১৮	৩৫.৫	৪৮.১০

[২৫] C. Strong and J. Old, 192.
[২৬] J. Han and D. Han, 27.

সারণি-৪ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সীমিত ক্ষমতা, শ্লথ তথ্য পরিবহণ, এবং দুর্বল নেটওয়ার্ক বাংলাদেশে মোবাইল ইন্টারনেট বিকাশে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। জরিপে আর একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, মোবাইল ইন্টারনেটের প্রাথমিক সংযোগ ব্যয় এবং পরিচালন ব্যয় ভোক্তাদের নিকট তেমন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নয় বরং ব্যক্তিগত গোপনীয়তায় হুমকি ও তথ্য নিরাপত্তার আশঙ্কা অনেকাংশে মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারে ভোক্তাদের নিরুৎসাহী করে যা পূর্ববর্তী গবেষণার সাথে কিছুটা সাংঘর্ষিক।

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকতে হলে মোবাইল কোম্পানিগুলোকে শুধুমাত্র ইন্টারনেট সেবা মূল্যের প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে বরং নেটওয়ার্ক উন্নয়ন, দ্রুত তথ্য পরিবহণ, এবং ভোক্তাদের তথ্য নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

৪. উপসংহার

মূল গবেষণা প্রশ্নের আলোকে বিষয়গুলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাংলাদেশের মোবাইল ইন্টারনেট বাজারে মধ্যম প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। এ ধরণের বাজারে ভোক্তা আকর্ষণ কৌশল প্রণয়ন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে যে দেশে মূল্যই সবচেয়ে বড় নির্ণায়ক সেখানে দ্রুত ও নিরবিচ্ছিন্ন সেবাকে ভোক্তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। এ গবেষণার আরও একটি উল্লেখযোগ্য ফলাফল হল মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভোক্তারা প্রত্যক্ষিত সুফল অপেক্ষা প্রতিবন্ধকতার উপরে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই মোবাইল ইন্টারনেট বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাদেশে ডিজিটাল ডিভাইড দুর করতে হলে কোম্পানিগুলোকে নমনশীলতা নিশ্চিতকল্পে নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করতে হবে। উন্নত যোগাযোগ বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রাখতে থ্রিজি (3G) এর মতো উন্নত প্রযুক্তি অবমুক্ত করতে হবে। কারণ, বর্তমানে মোবাইল ইন্টারনেট স্থির সংযোগের বিকল্প হিসেবে নয় বরং ইন্টারনেট সেবার প্রধান মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

গ্রামীণ গৃহস্থালিতে পশুসম্পদের ভূমিকা : একটি সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান

আবু রাসেল মুহাঃ রিপন•

Abstract: Bangladesh is an agrobased developing country. Animal protein comes mostly from livestock in the country. Livestock rearing in rural areas is helpful to meet domestic and international demand of protein. In Bangladesh, increasing population is creating tremendous pressure on arable land. As a result, land based agricultural production is decreasing day by day. In this perspective, livestock can play a significant role on socio-economic development of rural areas. Additional income from livestock helps promote financial solvency and fulfillment of different domestic needs. This paper attempts to analyse and find out the role of livestock on different socio-economic aspects in rural households.

ভূমিকা

আদিমকালে মানুষ শিকার-সংগ্রহের মাধ্যমে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করত। কাঠ ও পাথরের অস্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে পশু শিকার কিছুটা সহজ হয়। জার্মান ঐতিহাসিকগণ বিশ্বাস করেন যে, একদিকে যখন কতিপয় মানবগোষ্ঠী কৃষিকাজ শুরু করেছিল অন্যদিকে তখন অপর কতিপয় মানব গোষ্ঠী জীবজন্তুকে পোষ মানাচ্ছিল। বনের পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত পশুতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা কিভাবে মানুষের মাথায় এলো তা সঠিক জানার উপায় নেই। তবে পৃথিবীতে কুকুরই প্রথম গৃহপালিত জীব। বাসগৃহের বিশ্বস্ত প্রহরী ও শিকারিদের সহায়ক বান্ধব। বনের পশুকে পোষ মানিয়ে জীবিকা অর্জনের কৌশল শিখতে মানুষের বহু সময় লেগেছিল। শিকার করতে গিয়ে দু'একটা দুর্বল পশুশাবক শিকারির হাতে জ্যান্ত ধরা পড়া বিচিত্র নয়।

এইসব নিরীহ পশু শাবক যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়াকে মানুষ কাজে লাগালো। যাযাবর দল স্থানান্তরের সময়

•সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পশুগুলোকে ভার বহনে নিযুক্ত করে নিজেরা অব্যহিত পেলো। ফলে পশুশাবকগুলো বড় হয়ে খাদ্য উপযোগী হয়ে উঠলেও এগুলোকে হত্যা করা থেকে তারা বিরত রইলো। অর্থাৎ এগুলো গৃহপালিত পশুতে পরিণত হলো (ইসলাম, ১৯৭৮:১৬)। করভাফিন অনুরূপ ধারণা পোষণ করে বলেন, সকলের খাবারের মতো যথেষ্ঠ মাংস পাওয়া গেলে শিকারীরা আর ধৃত শুকুরছানা, কিংবা ছাগলছানা বা অন্যকোন পশুশাবকও মেরে ফেলতো না; কোন একটা ঘেরা জায়গায় শক্ত খুঁটিতে সেগুলো বেঁধে রাখতো। শুকুর, ছাগল, ভেড়া ও গরুকে পোষ মানিয়ে মানুষ পশুপালন করতে শুরু করলো। এভাবে শিকারের মধ্যে দিয়েই উদ্ভব হলো পশুপালনের (করভাফিন, ১৯৮৬:৩২)।

বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের পশু-পাখী রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে গৃহস্থালীভিত্তিক এসবের পালন করা হয়ে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এদেরকে কৃষি খামারের সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পশুসম্পদ সম্পর্কে সামাদ (২০০১:১) বলেন, "যেসকল পোষা পশু মানুষের গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার প্রয়োজনে ব্যবহার হয় এবং উপকার লাভ করা যায় তাদের লাইভস্টক (livestock) বলা হয়। যেমন- ঘোড়া, গবাদি পশু, মেষ, ছাগল ইত্যাদি"। কেউ কেউ বিনোদনের জন্য পালন করা প্রাণীকেও পশুসম্পদ বলে অবহিত করেন। এ প্রসঙ্গে রহমান (২০০৩:৯) বলেন, "যেসব পশু অর্থনৈতিক বা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে গৃহে পালন করা হয় এবং যেগুলো দ্বারা উপকার পাওয়া যায় তাকে লাইভস্টক বা গৃহপালিত পশু বলে। যেমন- গরু, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, ঘোড়া, শুকুর, গাধা, উট, বিড়াল, খরগোশ ইত্যাদি"। এছাড়া কৃষি ও আর্থিক বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বলা হয় Livestock refers to one or more domesticated animals raised in an agricultural setting to produce commodities such as food, fiber and labor... to any breed or population of animal kept by humans for a useful, commercial purpose (http://en.wikipedia.org/wiki/Livestock).

পশু সম্পদ থেকে অর্জিত আয় গৃহস্থালীতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ এলাকায় পশুসম্পদ পালনের ক্ষেত্রে নারিদের ভূমিকা বেশি থাকে। এ প্রসঙ্গে Fattah (2005 :130) যথার্থই বলেছেন, æPoultry is mainly owned and managed by women and children" হাঁস-মুরগি থেকে অর্জিত আয় দ্বারা অনেকে গরু, ছাগল ক্রয় করার সুযোগ পায়। তবে নারিদের উদ্যোগে পশুসম্পদ পালন করা হলেও এর সুফল গৃহস্থালির সবাই ভোগ করার সুযোগ পায়। বর্তমান প্রবন্ধে পশুসম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা ও গৃহস্থালিতে আর্থ-সামাজিক নানা বিষয়ে এর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

গ্রামীণ গৃহস্থালিতে পশুসম্পদ পালন ও নানামুখি ভূমিকা সম্পর্কে জানার জন্য নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানার অন্তর্গত রুহাই গ্রাম থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণা এলাকায় মোট খানার সংখ্যা ১৬০টি। গবেষণায় যারা গরু ও ছাগল যে কোন একটি বা একাধিক পশু পালন করে তাদের সকলকে নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সে হিসেবে ৩২টি খানা পশুসম্পদ পালন করায় মোট উত্তরদাতা ৩২টি খানা প্রধান। তথ্য সংগ্রহকালে সামাজিক জরিপ পদ্ধতির সাক্ষাৎকার কৌশল এবং প্রশ্নমালা ও পর্যবেক্ষণ টুলস্ ব্যবহার করা হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা (questionnaire) ব্যবহার করা হয়। এতে উন্মুক্ত এবং আবদ্ধ উভয় ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। এছাড়া তথ্য সংগ্রহকালে গবেষণা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট আনুসঙ্গিক প্রশ্নের মাধ্যমে এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করা হয়। বর্তমান গবেষণাটি বাংলাদেশের সকল গ্রামীণ এলাকার বৈশিষ্ট্য ধারন ও প্রকাশ না করলেও এ সম্পর্কিত পরবর্তি গবেষণায় সহায়ক হবে। তথ্য বিশ্লেষণ ও আলোচনায় গ্রামীণ গৃহস্থালি ও খানা শব্দ দুটি একই অর্থে (household) ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশে পশুসম্পদ পালন চালচিত্র

বাংলাদেশে বর্তমানে পশুসম্পদের সংখ্যা কত তা সঠিক জানা কষ্টকর। কারণ এ সম্পর্কিত তথ্যের অপ্রতুলতা রয়েছে। তবে বিভিন্ন সময়ে এ সম্পর্কিত কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ১৯৮৩-৮৪ সালের কৃষি শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ২১.৫০ মিলিয়ন গরু ছিল। তন্মধ্যে ষাঁড় ও বলদ ছিল ৭.৬৯ মিলিয়ন, গাভী ছিল ৬.৯৫ মিলিয়ন এবং দুগ্ধবতী গাভী ছিল ৬.৩৩ মিলিয়ন। বিগত ২৫ বছরে গরুর সংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল ০.৫% যা অতি নগন্য। ১৯৮৩-৮৪ সালের শুমারী অনুযায়ী দেশে মোট ছাগলের সংখ্যা ছিল ৮.৭৩ মিলিয়ন। বিগত ২৫ বছরে ছাগল সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২% থেকে ৪% (মাহমুদ, ২০০২:২০১-২০২)। অন্য এক হিসেবে দেখা যায়, বাংলাদেশে সর্বমোট প্রায় ২৩৪ লক্ষ গরুর মধ্যে বলদ ও গাভী যথাক্রমে ১১৯.১ ও ১১৪.৯ লক্ষ, ভারবাহী ২১.৩ লক্ষ ও উন্নতমানের গরু ৪২ লক্ষ (ইসলাম, ২০০৩:১৩৬)। দলগতভাবে বাংলাদেশে পশুপালন সংখ্যার চিত্র বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া যায়।

সারণি নং ১ : দলগতভাবে বাংলাদেশের পালিত পশুসংখ্যা (গরু ও ছাগল)

পশু	১৯৯৫-৯৬ (লক্ষ হিসেবে)	১৯৯৬-৯৭ (লক্ষ হিসেবে)	১৯৯৭-৯৮ (লক্ষ হিসেবে)
গরু	২৩১.৯৮	২৩৩.২০	২৩৪.০০
ছাগল	৩৩০.২০	৩৩৩.৩১	৩৩৩.০০

উৎসঃ পশুসম্পদ পরিদপ্তর (উদ্ধৃতঃ ইসলাম, ২০০৩:২৯০)।

তবে বিবিএস এবং ডিএলএস এর এক হিসেবে তিন ক্যাটাগরীতে বিভক্ত করে দেশে পশুসম্পদের সংখ্যার পরিসংখ্যান উপস্থাপন করা হয়।

সারণি নং ২: Livestock Population (Number)

Catagory	Year		
	1983-84	1995-96	1999-2000 (pojection)
a) Large Ruminant (cattle & Buffalo)	22.06	23.98	25.28
b) Small Ruminant (Goat&Sheep)	14.23	30.79	39.50

Source: BBS, DLS (Cited in Mian, 2001:24)

বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের পশু পাওয়া যায়। দেশী জাতের গরুর মধ্যে দেশী জাতের লাল চট্টগ্রাম গয়াল, পাবনা গরু উল্লেখযোগ্য। বিদেশী জাতের মধ্যে হরিয়ানা, সিন্ধি, শাহীয়াল, জের্সি ও হোলস্টেন ফ্রিসিয়ান, সংকর জাতের মধ্যে *Bos indicus, Bos taurus* পাওয়া যায়। ছাগলের মধ্যে যে জাত পাওয়া যায় তা হল- ব্লাকবেঙ্গল, যমুনা পাড়ি, ব্লাকবেঙ্গল যমুনা পাড়ির সংকর (ইসলাম, ২০০৩:২৯১)। ব্লাকবেঙ্গল জাতের ছাগল উন্নয়নের জন্য দেশে সরকারী উদ্যোগে অনেকগুলি খামার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উন্নত জাতের পাঁঠা গ্রামের নির্বাচিত কৃষকদের মধ্যে এবং উন্নতজাতের ছাগী আয় উপার্জনের জন্য ভূমিহীন দরিদ্র কিষাণীদের মধ্যে বিলি করা হয়। সরকারী খাতের পাশাপাশি দেশে ব্যক্তিগত খাতেও ব্যবসায় উদ্যোক্তা আছেন যারা বানিজ্যিক ভিত্তিতে বিভিন্ন খামার পরিচালনা করেন।

সারণি নং ৩ : পশুসম্পদ খামার

খামারের ধরন	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	১৯৯৭-৯৮
গরুর খামার	২৩,৯২৪	২৬,৫৮১	২৯,৬৪৯
ছাগল খামার	৯,২২৮	১৫,২৪৯	২০,৮৩৩

উৎসঃ পশুসম্পদ অধিদপ্তর (উদ্ধৃত, ইসলাম, খন্ড-৫, ২০০৩ঃ২৯১)।

Tareque, and Chowdhury (2010) এর মতে, Livestock population in Bangladesh in 2007-08 was cattle 23 million, buffalo 1.3 million, goats 21.6 million, sheep 2.8 million, chicken 212.5 million and ducks 39.8 million. The per capita number of cattle was o.16, goats 0.15, sheep 0.01, chicken 1.47 and ducks 0.27.

বাংলাদেশে পশুসম্পদের গুরুত্ব

বাংলাদেশে অনেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পালনের সাথে জড়িত। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী বলা হয়, Livestock are well integrated into the mixed farming system in Bangladesh, where 25 per cent of the population are directly involved in livestock production and another 60 per cent are indirectly involved (Bangladesh Economic Review, 2001), দেশের জাতীয় অর্থনীতিতে পশুসম্পদ এক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বাংলাদেশের কৃষি কাজে ব্যবহৃত শক্তির ৯০-৯৫ ভাগ আসে গো-মহিষ থেকে। আমাদের খাদ্যের প্রাণিজ আমিষের একটা প্রধান উৎস পশুসম্পদ। প্রাণিজ আমিষ যেমন- দুধ, মাংস ও ডিম ছাড়াও অনেক

উপজাতসামগ্রি গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী হতে পাওয়া যায়। গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর গোবর ও বিষ্ঠা জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির জন্য সার হিসেবে এবং জ্বালানী হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। গ্রামীণ জনসাধারণের এক বিরাট অংশ গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগী পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে (রহমান, ১৯৯২: ১১২)। বাংলাদেশের জিডিপিতে কৃষির যে অবদান তার মধ্যে পশুসম্পদের অবদান শতকরা ১২ ভাগ। কৃষি ক্ষেত্রে পশুশক্তির ব্যবহার দেশের সর্বত্র। জমি চাষ করতে পশু শক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে। এক হিসেবে, দেশে গোবরের ব্যবহারের ফলে মোট ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের শতকরা ১০.০০ ভাগ সমমানের জমির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। তারপর দেশে জ্বালানী কাঠের অভাবের কারণে মোট জ্বালানীর শতকরা ২৫.০০ ভাগ যোগান আসে গোবরের ঘুঁটে থেকে (কাসেম, ২০০৫:১৩০)। দেশের অর্থনীতিতে গবাদিপশু খাদ্যের উৎস, শক্তির উৎস, পোশাক পরিচ্ছদের উৎস, শ্রান্তি বিনোদনের উৎস, জৈব সারের উৎস, জ্বালানী হিসেবে, পশুখাদ্যকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যে রূপান্তর করে ভূমিকা পালন করছে। দেশের জনসংখ্যার প্রায় ২০% পশু ও হাঁস-মুরগী পালন ও প্রজনন কর্মসূচীর আওতায় জীবিকা নির্বাহ করে। পশুসম্পদ ভূমিহীন মানুষের জীবিকার একটি বড় অবলম্বন (ইসলাম, ২০০৩:২৯০)। পশুসম্পদ লালন পালন ও অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারে নারীদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে Seeberg (2005:114) উল্লেখ করেন, æWomen participating in smallholder livestock projects or other micro credit programmes argue that the means to accessing power inside the household is through money". গরু পালনের মাধ্যমে অনেকে তাদের আর্থিক দৈন্যতা থেকে মুক্তি পায়। কারণ এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা সম্ভব। Jahan & Rahman, 2003-এর মতে, Rearing of domestic animals is a major source of food, cash income and savings for poor rural households in Bangladesh. Poor farmers can diversify their income sources and enhance the family income through livestock production with small land requirements and potentially high returns. বিভিন্ন সময়ে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এর চিত্র খুজেঁ পাওয়া যায়। এমনই একজন নারী নিরঞ্জনা। জীবন যুদ্ধে পথ খুঁজে পেয়েছে। গরু পালন শুরুর মধ্যে দিয়ে তার জীবনের আলোর সন্ধান। বর্তমানে ছোট বড় মিলে ১১টি গরু ও ২টি ছাগলের মালিক। ইতিমধ্যে ২০ শতাংশ জমি ক্রয় করেছে। দরিদ্র্যতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়েছে (দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬/১১/০৬)। আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র্যদূরীকরণে গরু-ছাগল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিত্তহীন, ভূমিহীন, দরিদ্র ব্যক্তি, বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা যেকেউ পশুসম্পদের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করতে পারেন। যেকোন ভাড়া, জমিচাষ, দুধ বিক্রি, মোটাতাজাকরণ প্রভৃতি উপায়ে আয় করা সম্ভব। পশুসম্পদ সম্পর্কিত তথ্যে দেখা যায়, পশুসম্পদের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান হয়েছে ২৬.০২%, রপ্তানী আয়ে পশুসম্পদের অবদান ৪.৩৬%, চাষাবাদে পশুশক্তি ৯৫%, গ্রামীণ পরিবহণ শক্তি ৫০%, বর্তমান ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের প্রায় ১০%, প্রচলিত জ্বালানীর ২৫% (রহমান, ২০০৩:২১)। সর্বোপরি

পশুসম্পদের গুরুত্ব প্রসঙ্গে Tareque and Chowdhury-এর মন্তব্য প্রণিধাণযোগ্য। তিনি বলেন, Livestock is an integral component of agricultural economy of Bangladesh performing multifarious functions such as provisions of food, nutrition, income, savings, foreign currency earning (by exporting hides & skin, bone and other products), draft power, manure, fuel, transport, social and cultural functions (Tareque and Chowdhury, 2010).

গ্রামীণ গৃহস্থালিতে পশুসম্পদের ভূমিকা

আয়

উত্তরদাতাগণের মধ্যে আয়ের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। সম্পত্তি, পেশা, শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে আয়গত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সারণি নং ৪ উত্তরদাতাগণের বাৎসরিক আয়

বাৎসরিক আয় (টাকা)	গণসংখ্যা	শতকরা হার
২০,০০০-৩০,০০০	০২	৬.২৫
৩০,০০০-৪০,০০০	০৭	২১.৮৭
৪০,০০০-৫০,০০০	১১	৩৪.৩৭
৫০,০০০-৬০,০০০	০৫	১৫.৬২
৬০,০০০-৭০,০০০	০৩	৯.৩৭
৭০,০০০-৮০,০০০	--	--
৮০,০০০-৯০,০০০	০১	৩.১৪
৯০,০০০-১,০০,০০০	০২	৬.২৫
১,০০,০০০+	০১	৩.১৩
মোট	৩২	১০০.০০

সর্বোচ্চ সংখ্যক শতকরা ৩৪.৩৭ ভাগের বাৎসরিক আয় ৪০,০০০ টাকা থেকে ৫০,০০০ টাকার মধ্যে। শতকরা ৩.১৩ ভাগের বাৎসরিক আয় ১ লক্ষ টাকার উপর। শতকরা ৩৭.৫১ ভাগের বাৎসরিক আয় ৫০,০০০ টাকার উপরে। নিজ নিজ পেশার মাধ্যমে তারা আয় করে । অনেকে পশুসম্পদ পালনের মাধ্যমে বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আয় করে থাকে।

সারণি নং ৫ : পশুসম্পদ থেকে প্রাপ্ত বাৎসরিক আয়

আয় (টাকা)	গণসংখ্যা	শতকরা হার

০	০২	৬.২৫
০-১০,০০০	১৫	৪৬.৮৭
১০,০০০-২০,০০০	০৮	২৫.০০
২০,০০০-৩০,০০০	০৪	১২.৫০
৩০,০০০-৪০,০০০	০১	৩.১৩
৪০,০০০-৫০,০০০	--	--
৫০,০০০-৬০,০০০	০১	৩.১৩
৬০,০০০-৭০,০০০	--	--
৭০,০০০+	০১	৩.১২
মোট	৩২	১০০.০০

শতকরা ৬.২৫ ভাগের পশুসম্পদ থেকে বাৎসরিক কোন আয় নেই। কারণ তাদের পশুসম্পদ থেকে দুধ বা বাচ্চা বিক্রি করার সুযোগ পায় নাই। অবশিষ্ট শতকরা ৯৩.৭৫ ভাগ বছরে নির্দিষ্ট পরিমাণ আয় করতে সক্ষম হয়। তাদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক শতকরা ৪৬.৮৭ ভাগ বছরে ১০,০০০ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করে। ৭০,০০০ টাকার উপরে আয় করে শতকরা ৩.১২ ভাগ । তারা পশুসম্পদ থেকে যে উপায়ে আয় করে তার মধ্যে- বাচ্চা বিক্রি, গরু মোটাতাজাকরণের পর বিক্রি, ছাগল বড় করে বিক্রি, দুধ বিক্রি, হালচাষ বিক্রি, গরুর গোবর থেকে জ্বালানী তৈরি করে বিক্রি, গোবর দ্বারা কম্পোষ্ট সার তৈরি ও বিক্রি উল্লেখযোগ্য। পশুসম্পদ থেকে অর্জিত অর্থ তারা কৃষি, সাংসারিক প্রয়োজন, ব্যবসা, সন্তানের শিক্ষা, সন্তানের বিবাহ, যৌতুক, ঋণপরিশোধে, জমি বন্ধক তোলা, জমি ক্রয়, গরু-ছাগল ক্রয়, পশুর খাদ্য ক্রয়, পশুর চিকিৎসা প্রভৃতি কাজে ব্যয় করে। অধিকাংশই তাদের গরু-ছাগল কোরবাণির সময় বিক্রি করে। এ সময়ে মূল্য বেশি পায় বলে তারা জানায়। তবে সংসারের প্রয়োজনে যেকোন সময় তারা গরু-ছাগল বিক্রি করে ।

পেশা

পেশা হলো মানুষের জীবিকা নির্বাহের উপায়। গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পেশাজিবি লোক বসবাস করে। তবে কৃষিজিবি লোকের সংখ্যাই বেশি।

সারণি নং ৬ : **উত্তরদাতাগণের পেশা**

পেশা		গণসংখ্যা	শতকরা হার
প্রধান	কৃষি	২৪	৭৫.০০
	চাকুরি	৩	৯.৩৭
	ব্যবসা	২	৬.২৫
	দিনমজুর	৩	৯.৩৮
	মোট	৩২	১০০.০০

গৌণ	কৃষি	৫	১৫.৬৩
	দিনমজুর	২	৬.২৫
	ব্যবসা	৩	৯.৩৭
	মোট	১০	৩১.২৫

উত্তরদাতাগণের মধ্যে কৃষিজিবির সংখ্যাই বেশি। তবে অনেকেই চাকুরি করছে। এসকল চাকুরিজিবিরা শিক্ষকতাই বেশি করছেন। তারা প্রাইমারী ও হাইস্কুল শিক্ষকতা করছেন। এছাড়া রয়েছে ব্যবসা, দিনমজুর। যারা ব্যবসা করছে তাদের মধ্যে ক্ষুদে ও মাঝারি ব্যবসায়ি রয়েছে। অনেকের বিভিন্ন গৌণ পেশা রয়েছে। গৌণ পেশার মাধ্যমে তারা আয় বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। নিজ নিজ পেশার পাশাপাশি পশুসম্পদকে পেশা হিসেবে না নিয়ে আয় বৃদ্ধির সহায়ক উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে।

শিক্ষা

শিক্ষা হলো মানবীয় আচরণের অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ও প্রত্যাশিত পরিবর্তন। শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সাহায্য করে। শিক্ষা পেশা লাভ ও আয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অনেকেই শিক্ষা লাভে ব্যর্থ হয়।

সারণি নং ৭ : উত্তরদাতা ও উত্তরদাতাগণের সন্তানের শিক্ষা

শিক্ষার ধরন	উত্তরদাতা		উত্তরদাতাগণের সন্তান	
	গণসংখ্যা	শতকরা হার	গণসংখ্যা	শতকরা হার
শিশু	--	--	১০	৩১.২৫
নিরক্ষর	০২	৬.২৫	০৫	১৫.৬৩
প্রাথমিক	১৫	৪৬.৮৮	২৫	৭৮.১৩
মাধ্যমিক	০৮	২৫.০০	২৭	৮৪.৩৮
উচ্চমাধ্যমিক	০২	৬.২৫	০৫	১৫.৬২
উচ্চশিক্ষা	০৫	১৫.৬২	০৪	১২.৫০

উত্তরদাতাগণের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষার হার বেশি। নিরক্ষর রয়েছে শতকরা ৬.২৫ ভাগ । উচ্চ শিক্ষার হার খুব বেশি নয়। সেসময় সুযোগ-সুবিধার অভাব, সচেতনতার অভাব ও অন্যান্য কারণে তাদের মধ্যে শিক্ষার হার কম বলে জানায়। তাছাড়া নিজেদের মধ্যে সদিচ্ছার অভাব ছিল বলেও উল্লেখ করে। অনেকের পিতার কৃষি জমি বেশি ও অভাব না থাকায় নিজেরাও কৃষি পেশায় জড়িয়ে পড়ে। ফলে লেখাপড়ায় আগ্রহী ছিল না।

উত্তরদাতাগণের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ প্রবণতা কম থাকলেও তাদের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষা গ্রহণ করানোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রায় প্রতিটি খানায় স্কুল-কলেজগামী সন্তান রয়েছে। নিজেদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে তারা সাধ্যমত তাদের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণ করাচ্ছে। অনেকে শিক্ষা গ্রহণ শেষে ভাল চাকুরি

লাভ করেছে। সন্তানদের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণের হার বেশি। কারণ তারা এখনও লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া উত্তরদাতাগণের বয়স বিবেচনায় তাদের সন্তানরা লেখাপড়া করবে এটাই স্বাভাবিক। শতকরা ১৫.৬৩ ভাগ সন্তান নিরক্ষর। শতকরা ৭৮.১৩ ভাগ সন্তান প্রাথমিক শিক্ষা, শতকরা ৮৪.৩৮ভাগ মাধ্যমিক শিক্ষা, শতকরা ১৫.৬২ ভাগ উচ্চমাধ্যমিক এবং শতকরা ১২.৫০ ভাগ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে।

অধিকাংশ জানায় তাদের সন্তানদের শিক্ষা গ্রহণে পশুসম্পদের ভূমিকা রয়েছে। কারণ সন্তানদের মাসিক বেতন, বই, খাতা, কলম, পেন্সিলসহ আনুসঙ্গিক সামগ্রি ক্রয় করার সময় পশুসম্পদ থেকে অর্জিত অর্থ ব্যয় করে। তাছাড়া গরুর দুধ পানের মাধ্যমে সন্তানদের শরির সুস্থ্য ও মেধা বৃদ্ধি পায় বলে তারা জানায়। সন্তানদের লেখাপড়ার বাইরেও অনেক চাহিদা থাকে যা পূরণ করার ক্ষেত্রে পশুসম্পদ ভূমিকা পালন করছে। তবে স্বল্প সংখ্যক জানায়, তাদের সন্তানদের শিক্ষায় পশুসম্পদের ভূমিকা নেই। কারণ এখন পর্যন্ত পশুসম্পদ থেকে তেমন আয় করতে পারে নাই। বরং পশুসম্পদ বাড়িতে থাকায় অনেক সময় তা লালন-পালনের জন্য সন্তান সময় ব্যয় করে। ফলে তারা ঠিকমত লেখাপড়া করতে চায় না।

পশুসম্পদ পালনের ধরন ও সংখ্যা

গবেষণা এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পশুসম্পদ লালন-পালন করতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে পশুসম্পদ গত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

সারণি নং ৮ : পশুসম্পদ পালনের ধরন ও সংখ্যা

পশুসম্পদ	সংখ্যা	গণসংখ্যা	শতকরা হার
গরু	>২	০৫	১৫.৬২
	৩-৪	১৮	৫৬.২৫
	৫-৬	০৪	১২.৫০
	৭-৮	০২	৬.২৫
	৯-১০	০১	৩.১৩
	মোট	৩০	৯৩.৭৫
ছাগল	>২	০৩	৯.৩৮
	৩-৪	০৪	১২.৫০
	মোট	০৭	২১.৮৮

অধিকাংশই গরু পালন করে। ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সাবধানতা বেশি অবলম্বন করতে হয় বলে ইহা পালন সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। গবেষণা এলাকায় ছাগল পালন সংখ্যা খুবই কম । কারণ গ্রামটি চলনবিলের মধ্যে অবস্থিত। বর্ষার সময় ছাগল দ্বারা অন্যের গাছ-পালা নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে। ফলে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যায়। তাই ছাগল পালন সংখ্যা কম। তারা যেসব কারণে পশুসম্পদ পালন করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ অর্থনৈতিক লাভ, চাষাবাদ, ব্যবসায় উন্নতি, দুধ খাওয়া, শখ, ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার

খরচ চালানো, বাড়তি আয়ের ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা, নিজস্ব ভাবে কোরবাণি দেওয়া, ভবিষ্যৎএ বিপদে সাহায্য করার আর্থিক সক্ষমতা সৃষ্টি করা, জ্বালানি সংকট দূর করা, জৈব সার তৈরি, নিজস্ব কৃষিকাজ করা, মানসিক প্রশান্তি প্রভৃতি।

পশুসম্পদের হ্রাস-বৃদ্ধি

পশুসম্পদ পালনের পর থেকে অনেকের পশু সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। শতকরা ৪৩.৯৩ ভাগ জানায় তাদের পশুর সংখ্যা আগের চেয়ে কম হয়েছে। কারণ পশু মারা গেছে, চুরি হয়েছে, প্রয়োজনে বিক্রি করেছে, সন্তানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে, মেয়েকে দান করেছে, খাদ্যের অভাবে বিক্রি করেছে ইত্যাদি। শতকরা ৩৭.৮৫ ভাগ জানায় তাদের পশুসম্পদ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাচ্চা প্রসব ও ক্রয়ের মাধ্যমে আগের চেয়ে পশুসম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানায়। শতকরা ১৮.২২ ভাগ জানায় তাদের পশুসম্পদ আগের মতই রয়েছে। কম বা বেশি হয় নাই। কারণ তাদের পশুসম্পদ এখন পর্যন্ত বাচ্চা দেয় নাই। তাছাড়া ছাগলগুলো খাসি ও গরুগুলো ষাঁড় হওয়ায় পশুসম্পদ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। পশুসম্পদ বিভিন্ন উৎস থেকে পেয়েছে বলে জানায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া, শ্বশুর বাড়ি থেকে পাওয়া, ক্রয় করা, ছাগলের বর্গাভাগ থেকে পাওয়া ইত্যাদি। তারা মাঠ ও বাজার থেকে পশু খাদ্য সংগ্রহ করে। মাঠ হতে ঘাস ও খর সংগ্রহ করে। বাজার হতে খইল, ভূষি, লালি ক্রয় করে। বাড়িতে ধানের কুড়া, ভাতের মাড় পশুকে খাওয়ানো হয়। ছাগলের জন্য ভূষি, ভাত, চাল, ডাল, গাছের পাতা খাওয়ানো হয়। শতকরা ৭৪.৭৭ ভাগ উত্তরদাতা জানায় বর্তমানে পশুখাদ্য সংকট হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে এ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। তাছাড়া পশুখাদ্যের মূল্য আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বংশপরম্পরায় পশুসম্পদ পালন ও কোরবাণি প্রদান

অনেকেই বংশপরম্পরায় পশুসম্পদ পালন করে আসছে। বাবা-দাদা থেকে প্রাপ্ত গরু-ছাগল বংশবিস্তার করার মাধ্যমে পালন করে আসছে। এসকল পশুসম্পদ দ্বারা পারিবারিক ঐতিহ্য ও বংশ পরম্পরায় অনেকে পশু কোরবাণী দিয়ে আসছে।

সারণি নং ৯ : বংশপরম্পরায় পশুসম্পদ পালন ও কোরবাণি সম্পর্কিত ধারণা

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
বংশপরম্পরায় পশুপালন	২৩	৭১.৮৮
নিজস্ব পশু কোরবাণি প্রদান	১০	৩১.২৫

শতকরা ৭১.৮৮ ভাগ বংশপরম্পরায় পশুসম্পদ পালন করে। পশুসম্পদ দেখাশোনার জন্য অনেকে রাখাল রাখে। কারণ তাদের সংসারে লোকের অভাব, নিজেদের কাজের ব্যস্ততা

থাকে। পশুসম্পদের দিকে খেয়াল রাখার সময় কম। অনেকে রাখাল রাখে না। কারণ তারা নিজেরাই যথেষ্ট। তাছাড়া খরচ বেশি , অল্প পশু, আর্থিক সংগতি না থাকা ও প্রয়োজন মনে না করায় রাখাল হিসেবে কোন কাজের ছেলে রাখে না।

পশুসম্পদ লালন-পালনের জন্য নিজেরা, সন্তান, স্ত্রী, বৃদ্ধমা, বেশি সময় ব্যয় করে বলে জানায়। তারা ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিভিন্ন কাজে সময় ব্যয় করে। মহিলারা গোয়ালঘর থেকে গরু বের করার পর তাদের খাবার দেওয়া, গোয়াল ঘর পরিস্কার করার কাজ করে। পুরুষ সদস্যগণ বিভিন্ন সময় খাবার দেবার কাজে মহিলাদের সহযোগিতা করে। তাছাড়া গরুর গোসল করানোর জন্য পুরুষ সদস্যরাই কাজ করে। তারা পশুখাদ্য হিসেবে মাঠ থেকে ঘাস সংগ্রহ করে। মহিলারা গরুকে পানি খাওয়ানোর কাজ করে। সন্ধ্যায় গোয়াল ঘরে গরু তোলার জন্য পুরুষ সদস্যরাই বেশি ভূমিকা পালন করে। এসব কাজ করতে গিয়ে পশুসম্পদের প্রতি মায়ার সৃষ্টি হয়। ফলে পশুসম্পদের প্রতি বেশি যত্নবান হয়। তাছাড়া ছাগল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজেদের শয়ন ঘরেই রাখে। এমনকি খাট বা চৌকির উপর রাত্রে ছাগল ঘুমায়। অনেকে পশুসম্পদকে তাদের সন্তানের মতই দেখে। অনেকে জানের (জীবন) চেয়ে বেশি ভালবাসে বলে জানায়। শতকরা ৩১.২৫ ভাগ নিজ বাড়ির গরু-ছাগল কোরবাণি দিয়ে থাকে। তারা বংশপরম্পরায় পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে কোরবাণি দেয় বলে জানায়।

পশুসম্পদের সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা

পশুসম্পদ যারা পালন করে তাদের নিজেদের মধ্যে এবং অন্যান্যদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সামাজেক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নানা উপায়ে এ সম্পর্কের বিস্তার ঘটে থাকে।

সারণি নং ১০: পশুসম্পদ লালন-পালনে সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা সম্পর্কিত মতামত

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি	৩০	৯৩.৭৫
সামাজিক সম্পর্ক নষ্টে	১৬	৫০.০০
পারিবারিক অশান্তি	১৩	৪০.৬৩

শতকরা ৯৩.৭৫ ভাগ জানায় পশুসম্পদ পালনের মাধ্যমে তাদের সামাজিক যোগাযোগ আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। পশুসম্পদ ক্রয়-বিক্রয়, পশুসম্পদের খাবার সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন স্থান বিশেষ করে হাট-বাজারে গমনের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কের বিস্তার ঘটে। তাছাড়া গ্রামীণ এলাকায় কিছু স্থায়ি দুধ ক্রেতা থাকে যারা নিয়মিত দুধ ক্রয় করে এবং মাস শেষে টাকা পরিশোধ করে । তাদের সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্ক ও বিশ্বাস স্থাপন হয়। বাজারেও কিছু নিয়মিত দুধ ক্রেতা রয়েছে যারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। তাদের সঙ্গে মেলামেশায় সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন ও বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে জানায়। তারা বিভিন্ন উৎসব ও পালা পার্বনে প্রতিবেশি বা আত্মিয়-স্বজনকে বিনা পয়সায়

দুধ প্রদান করে। এতে তাদের সাথে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া জ্বালানি প্রদানের মাধ্যমেও সম্পর্কের বিস্তার ঘটে। বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে প্রতিবেশি বা আত্মিয়-স্বজনকে গরু ধার প্রদান করে। তারা চাষাবাদ, জমিতে মই দেওয়া, ধান বা শস্য মাড়াই করার কাজে গরু ব্যবহার করে। ফলে তাদের মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় হয়। সম্পর্ক ভাল হবার ফলে বিপদের সময় বা প্রয়োজনে তাদের নিকট থেকে আর্থিকসহ বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে থাকে।

পশুসম্পদ লালন-পালনের সময় অনেক ক্ষেত্রে পশুসম্পদ দ্বারা অন্যের শস্যের ক্ষতি হয়ে থাকে। এতে ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়। গ্রামীণ এলাকায় যেকোন ফলগাছ পশুসম্পদ নষ্ট করলে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়।

শতকরা ৫০.০০ ভাগ জানায় পশুসম্পদের মাধ্যমে তাদের সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে না। তাদের মতে উন্নত পদ্ধতিতে পশুসম্পদ পালন করলে সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হবার সুযোগ নাই। শতকরা ৫০.০০ ভাগ জানায় পশুসম্পদ পালন করায় তাদের অনেক সময় সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হয়। কারণ গরু দ্বারা অন্যের ক্ষতি কম হলেও ছাগল দ্বারা বেশি ক্ষতি হয়। ছাগলকে সবসময় বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না। শতকরা ৪০.৬৩ ভাগ জানায় পশুসম্পদ পালনের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। যেসব কারণে পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাত হলেও গরু গোয়াল ঘরে না উঠানো, ঠিকমত পশুসম্পদের যত্ন না নেওয়া, অন্যের ক্ষতি করলে, রান্না করতে দেরী হলে, ব্যস্ততার কারণে সন্তানদের ঠিকমত খোঁজখবর না নিলে, সন্তানরা পশুসম্পদকে ঠিকমত খাবার না দিলে, সন্তানরা পশুসম্পদের প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া ও লেখাপড়ায় অমনোযোগী হওয়া ইত্যাদি।

পশুসম্পদের প্রতি যত্ন

নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী পশুসম্পদ রাখার স্থান তৈরি করে। গরু রাখার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করলেও ছাগল রাখার জন্য আলাদা ঘর তৈরি করে না। নিজেদের শয়ন ঘরে, বারান্দায় কিংবা রান্নাঘরে ছাগল রাখে। গরু রাখার জন্য গোয়াল ঘর তৈরি করে। অধিকাংশ গোয়ালঘরের চালা টিনের তৈরি। চারিদিকে বেড়া দেওয়া কখনওবা খোলা। মেঝে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাঁচা। অনেকে ইটের তৈরি মেঝেতে গরু পালন করে। অধিকাংশের ঘরে আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে। মেঝে যেন সুকনা থাকে সে বিষয়ে নিয়মিত খেয়াল রাখে।

অর্ধেক সংখ্যক জানায় পশুসম্পদ পালনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান আছে। তারা বই পড়ে ও পশুপালন করতে করতে শিখেছে। অবশিষ্টরা জানায় তাদের পশুপালন বিষয়ে কোন ধারণা নেই। মশার আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য এবং নিজেদের সচেতনতার জন্য অনেকে পশুর জন্য মশারী ব্যবহার করে। শতকরা ২৮.১৩ ভাগ পশুসম্পদের জন্য মশারী ব্যবহার করে। অবশিষ্ট ৭১.৮৭ ভাগ পশুসম্পদের জন্য মশারি ব্যবহার করে না। কারণ আর্থিক সামর্থ নাই, সচেতনতার অভাব, প্রয়োজন মনে না করা, অলসতা ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে কেউ কেউ কয়েল, ধুপ, ধূঁয়া প্রভৃতি উপায়ে মশা তাড়ানোর ব্যবস্থা করে।

সারণি নং ১১ : পশুসম্পদের প্রতি যত্ন সম্পর্কিত মতামত

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
পশুসম্পদ পালন সম্পর্কিত জ্ঞান	১৬	৫০.০০
মশারী ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান	০৯	২৮.১৩
শীতকালে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ	৩১	৯৬.৮৮
গর্ভাবস্থায় বিশেষ যত্ন নেওয়া	২৪	৭৫.০০
শাল দুধ খাওয়ানো	২৬	৮১.২৫
প্রতিবেশীর মনোভাব	২৫	৭৮.১৩

শীতের দিনে পশুসম্পদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। শতকরা ৯৬.৮৮ ভাগ শীতকালে পশুসম্পদের জন্য বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা করে। গরুর জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা হলো- গায়ে চট লাগিয়ে দেওয়া, সকালে দেরী করে ঘর থেকে বের করা, গোয়াল ঘরের চারিদিকে ভাল করে বেড়া দেওয়া, রাতে মেঝেতে খর বিছিয়ে দেওয়া, পানি খাওয়ানোর সময় হাল্কা গরম করা, ঠান্ডা যেন না লাগে সে দিকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া, সুষ্কও রৌদ্দজ্জ্বল স্থানে রাখা প্রভৃতি। অন্যান্য সময়ে নদী, খালে গরুকে ২/৩ দিন পরপর গোসল করালেও এ সময়ে হাল্কা গরম পানি দিয়ে স্থলভাগেই গোসল করায় কিংবা রোদ বেশি হলে নদি, খালে গোসল করে রোদে পশুর শরির শুকিয়ে নেয়।

পশুসম্পদ গর্ভধারণের পর থেকে তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখে খানার প্রতিটি সদস্য। বিশেষ করে কিছু নমুনা দ্বারা যখন টের পায় যে পশুসম্পদ গর্ভধারণ করেছে, তখন যত্ন ও সতর্কতা বেড়ে যায়। এ সময়ে খাবার দেওয়া হয় বেশি, ভারি কাজ থেকে বিরত রাখা হয়, গোসল করানোর সময় সাবধানে করানো হয়। শতকরা ৭৫.০০ ভাগ পশুসম্পদের গর্ভাবস্থায় বিশেষ যত্ন নেয়। এসময় পশুকে আলাদা ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়, ষাঁড় বা বলদ থেকে আলাদা রাখা হয়, পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়, শোবার স্থান সমান ও নরম রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বাচ্চা প্রসবের আগে যেভাবে টের পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- পেট বেশি বড় হওয়া, গাভীর অস্থির হওয়া, ছটফট করা, ওলান ছেড়ে দেওয়া, পেটে বাচ্চা নড়াচড়া করা, হাঁটতে সমস্যা হওয়া, বাঁট দিয়ে দুধ বের হওয়া, মাসের হিসাব রাখা প্রভৃতি। শতকরা ৮১.২৫ ভাগ জন্মের পর বাচ্চাকে শালদুধ খাওয়ায়। কারণ শালদুধ খাওয়ালে বাচ্চার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী হয়। শতকরা ১৮.৭৫ ভাগ জন্মের পর বাচ্চাকে শালদুধ খাওয়ায় না। তাদের ধারণা এদুধ ক্ষতিকর, তাই খাওয়ানো উচিৎ না। তাছাড়া এ দুধের কার্যকারিতা সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব রয়েছে বলে জানায়। শতকরা ৭৮.১৩ ভাগ জানায় পশুসম্পদ গর্ভ ধারণ করলে প্রতিবেশির মনোভাব খুব ভাল থাকে। তারাও বিশেষ খেয়াল যত্ন করে, পশুসম্পদের কোন সমস্যা হলে মালিককে জানায় । গর্ভাবস্থায় পশুসম্পদের যত্ন করার পরেও অনেক সময় জন্মের পর বাছুর বা গাভী মারা যায়। স্বল্প সংখ্যক জানায় জন্মের পর তাদের বাছুর মারা যায়।

যেসব কারণে বাছুর মারা যায় তা হলো- প্রসবে সমস্যা, জন্মের সময় আঘাত পাওয়া, নিউমোনিয়া, পাতলা পায়খানা, বসন্ত, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ প্রভৃতি।

পশুসম্পদ যেসমস্ত রোগে আক্রান্ত হয় তা হলো- ক্ষুরা রোগ, পাতলা পায়খানা, তরকা, গলাফুলে যাওয়া, পেট ফাঁপা, বাঁটের রোগ, বাদলা, স্বর্দি-জ্বর, কাশি, ঘার বাঁকা হওয়া, ডায়রিয়া, চোখের সমস্যা, পায়ের সমস্যা, কৃমি, খাওয়া বন্ধ হওয়া, মুখে ঘা, নিউমেনিয়া প্রভৃতি। অধিকাংশই পশুসম্পদ অসুস্থ্য হলে চিকিৎসকের নিকট নিয়ে যায় এবং চিকিৎসা করানোর চেষ্টা করে। তারা ডাক্তার, কবিরাজ, অন্যের কাছে শুনে ঔষধ প্রদান করে। অনেকে থানা পশু হাসপাতালে গিয়ে পশুর চিকিৎসা করায়। অধিকাংই পশুসম্পদের রোগ প্রতিরোধের জন্য টীকা দিয়ে থাকে। যারা পশুসম্পদের রোগ প্রতিরোধে টিকা প্রদান করে না তার উল্লেখযোগ্য কারণ হলো- এ সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব, সচেতনতার অভাব, দরিদ্রতা, ডাক্তারের অভাব প্রভতি।

মহিলাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে পশুসম্পদের ভূমিকা

পশুসম্পদ পালনের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা বেশি থাকে। কারণ তারা বাড়িতে থেকে পশুসম্পদের প্রতি খেয়াল রাখার সুযোগ পায়। তাই দেখা যায় পশুসম্পদ বিক্রি করার সময় মহিলারাই বেশি কষ্ট পায়।

সারণি নং ১২ : মহিলাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচনে পশুসম্পদের ভূমিকা সম্পর্কিত মতামত

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
মহিলাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি	২৫	৭৮.১৩
দারিদ্র্য বিমোচন	২৪	৭৫.০০

অধকাংশ জানায় পশুসম্পদ লালন-পালনে মহিলাদের গুরুত্ব আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ তাদের গরু বা ছাগল ক্রয়ের সময় স্ত্রীর নিকট থেকে কিছু টাকা নেয়। মহিলারা এ টাকা সংগ্রহ করে হাঁস-মুরগী বিক্রির মাধ্যমে। আর হাঁস-মুরগী পালন পুরোটাই মহিলারা করে থাকে। তাই পশুসম্পদ বিক্রির সময় শতকরা বেশিরভাগই তাদের স্ত্রীদের মতামত গ্রহণ করে। এতে মহিলারা তাদের মতামত দেবার সুযোগ পায়। যেকোন পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণেও মহিলাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সন্তানদের বিভিন্ন প্রয়োজনে অর্থ সাহায্য করতে পারায় তাদের কাছেও মহিলাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে।

পশুসম্পদ পালনের মাধ্যমে অনেকেই তাদের আর্থিক স্বচ্ছতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আগে অনেক কষ্টে দিনাতিপাত করলেও বর্তমানে সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করছে। শতকরা ৭৫.০০ ভাগ জানায় পশুসম্পদ পালনের মাধ্যমে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় অনেকেই ব্যবসা করার সুযোগ পায়, জমি ক্রয় করতে পেরেছে। কেউ জমি বর্গা নিয়ে অধিক জমি চাষ করার সুযোগ পাচ্ছে। কেউ হালচাষ বিক্রির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিভিন্ন উৎপাদনমুখি কাজে ব্যয় করার সুযোগ পাচ্ছে। নিজেদের পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রেও পশুসম্পদের ভূমিকা রয়েছে বলে কেউ কেউ জানায়।

পশুসম্পদ পালন করায় নিজেদের স্বাস্থ্য সচেতনতা

পশুসম্পদের যত্ন নিতে গিয়ে নানা কারণে নিজেদের শারিরিক যত্নের প্রতি খেয়াল রাখতে পারে না বলে অধিকাংশ জানায়।

সারণি নং ১৩ : পশুসম্পদের শরীরে হাত দেবার পর অন্যান্য কাজ করা সম্পর্কিত মতামত

মতামত	গণসংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	২২	৬৮.৭৫
না	১০	৩১.২৫
মোট	৩২	১০০.০০

অধিকাংশ উত্তরদাতা এবং তাদের খানার সদস্যরা পশুসম্পদের গায়ে হাত দেবার পর নিজেদের হাত পরিস্কার না করেই সাংসারিক কাজ এমনকি শুকনা জাতীয় খাবার (চিড়া, মুড়ি প্রভৃতি) খায় । কারণ অসচেতনতা, সঠিক জ্ঞানের অভাব, খেয়াল না থাকা, ভুলে যাওয়া, হাত পরিস্কার করতে সময় লাগবে তাই অলসতা, এত কিছু ভাবার সময় নেই, নিজেদের কাজের ব্যস্ততা ইত্যাদি। এমনও দেখা যায় বাচ্চারা প্লেটে ভাত বা মুড়ি খাচ্ছে সে প্লেটে ছাগল বা গরুর বাছুর মুখ দিচ্ছে, তাদের সড়িয়ে দিয়ে ঐ খাবারই শিশুরা খাচ্ছে।

উপসংহার ও সুপারিশ

আগে হাল চাষের জন্য প্রায় প্রতিটি কৃষকের খানায় চাষযোগ্য গরু পালন করত। বর্তমানে পাওয়ারট্রিলারের মাধ্যমে জমি চাষ করায় লাঙ্গলের প্রচলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। তবে পশুসম্পদ পালন সে হারে হ্রাস পায়নি। কৃষি নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিতে পশুসম্পদ বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পশু চিকিৎসার উন্নতির ফলে এবং পশু চিকিৎসা বিষয়ে মানুষের সচেতনতা আগের চেয়ে তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় পশু মৃত্যু হার কমে এসেছে। গবেষণা এলাকায় পশুসম্পদের গর্ভাবস্থায় বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়। পশুর বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী খাদ্য, বাসস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা হয়। এগুলো পালন করতে গিয়ে অনেক সময় নিজেদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ে খেয়াল রাখতে ব্যর্থ হয়। পশুসম্পদ পালনের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পশুসম্পদ কর্তৃক অন্যের শস্যের ক্ষতির কারণে সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হবার ঘটনাও ঘটে। গ্রামীণ মহিলারা পশুসম্পদ পালনের ক্ষেত্রে অগ্রণি ভূমিকা পালন করায় প্রতিটি খানায় তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পারিবারিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামতের গুরুত্ব দেওয়া হয়। পশুসম্পদ পালনের মাধ্যমে অধিকাংশের আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসায় তাদের দারিদ্র্য বিমোচন হয়েছে। নিজেদের কিংবা খানার অন্য সদস্যদের পেশা গ্রহণেও পশুসম্পদ ভূমিকা পালন করছে। সন্তানের শিক্ষা গ্রহণে পশুসম্পদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গ্রামীণ গৃহস্থালিতে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশুসম্পদকে উপায় হিসেবে অনেকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু পশুসম্পদ পালনে কতিপয় সমস্যা রয়েছে। তাই দেশের পশুসম্পদ উন্নয়নে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে যাতে দেশের সার্বিক উন্নয়নে

পশুসম্পদ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করার সুযোগ পাবে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলি হলো- পশু চিকিৎসার আরো উন্নয়ন ও সহজলভ্য করা, বিনামূল্যে পশুর রোগ প্রতিরোধমূলক টিকা দেবার ব্যবস্থা করা, যারা পশুসম্পদ পালন করে তাদের প্রয়োজনিয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও পুঁজি সংস্থান করে পশুপালনে উৎসাহিত করা, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা, পশুখাদ্য সংকট দূরিকরণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া, পশুখাদ্যের মূল্য হ্রাস করা প্রভৃতি। উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্যমে পশুসম্পদের উন্নয়ন সম্ভব ।

গ্রন্থপঞ্জি

ইসলাম মাহমুদা (১৯৭৮) : *সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকা*, ঢাকা ঃ মল্লিক ব্রাদার্স।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) (২০০৩) : *বাংলাপিডিয়া ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খন্ড-৩, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদিত) (২০০৩) : *বাংলাপিডিয়া ঃ বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, খন্ড-৫, ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

করভাফিন, ফিওদর (১৯৮৬) : *পৃথিবীর ইতিহাস ঃ প্রাচীন যুগ*, মস্কো ঃ প্রগতি প্রকাশন।

কাসেম, মোঃ আবুল (২০০৫) : *বাংলাদেশের কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি*, ঢাকা ঃ পালক পাবলিশার্স।

মাহমুদ, সৈয়দ আকমল (২০০২) : *বাংলাদেশের অর্থনীতি*, ঢাকাঃ বই বিতান।

রহমান, মোঃ আনিছুর (২০০৩) : *আধুনিক পদ্ধতিতে পশুপালন, চিকিৎসা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা*, ঢাকা ঃ প্রান্ত প্রকাশন।

রহমান, মোঃ মাহফুজুর (১৯৯২) : "বাংলাদেশের কৃষির বহুমূখীকরণ ও পশুসম্পদ উন্নয়ন কৌশল" *Bangladesh Journal of Political Economy*, Vol. 12, No. 1, (September) Pp.110-117.

সামাদ, এম,এ, (২০০১) : *পশুপালন ও চিকিৎসা বিদ্যা*, ময়মনসিংহ ঃ লেপ প্রকাশন।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৬-১১-২০০৬ ইং।

Bangladesh Economic Review (2001): Economic Advisors wing Finance Division, Ministry of Finance, Peoples Republic of Bangladesh

Fattah, Dr. Kazi Abdul (2005): æRural Poultry Development in Bangladesh: A Critical Review of Success and Failure", Proceedings of the third Annual Scientific Conference, *Chittagong Veterinary University*, Pp, 129-133.

Jahan, Nasrin and Rahman, Hafezur (2003): Livestock Services and the Poor in Bangladesh: A Case Study, Denmark: Danish Agricultural Advisory Centre.

Main, Md. Shahjahan (2001): *Economics and Agricultural Development: Bangladesh Perspectives*, Dhaka: Universal Publications.

Seeberg, Ms Dea Schiodt (2005): æRural Livestock Development and Women's Empowerment", Proceedings of the third Annual Scientitic Conference, *Chittagong Veterinary University*, Pp, 112-118.

Tareque, A.M.M. and Chowdhury, Shah Md. Ziqrul Haq (2010): Agricultural Research Priority: Vision- 2030 and beyond, Dhaka: Bangladesh Agricultural Research Council

Wikipedia,awebEncyclopedia,retrivedfrom http://en.wikipedia.org/wiki/Livestock, viewed on 05 July, 2011.

ISSN 1561-798X
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনায় নির্দেশকের শিল্পভাবনা

এস. এম. ফারুক হোসাইন*

Abstract: This article tries to explore the artistic thoughts of the directors in staging plays in Bangladesh. Many of our directors are artistically western minded. As a result, our stage often reflects the simplification of western art. In some cases an effort to combine eastern and western views can be noticed. A few, however, have made attempts to modernize their art by following our own Bengali culture. In this paper the author tries to find out the myriad nature play-directions in Bangladesh from 1972 to 2000. The study includes 54 productions of 16 Dhaka-based directors.

ভূমিকা

সাধারণ অর্থে নাট্যনির্দেশনার শিল্পভাবনা হলো নির্দেশকের নাট্যনির্দেশনা সম্পর্কে বোধ ও ধারণা, যা ক্রমাগত ঋদ্ধ হয় নির্দেশকের অভিজ্ঞতার আলোকে। তাঁর এই অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতিগুলোর নান্দনিক প্রকাশ ঘটে নাট্য ও নাট্যনির্দেশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত বহু বিচিত্র অনুষঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যমে, যেখানে নাটকের বস্তুসত্যের সহায়তায় তিনি দর্শক সম্মুখে আবিষ্কার করেন শৈল্পিক সত্যকে। এ ক্ষেত্রে বক্তব্য ও বিষয়-ভাবনার বহিঃপ্রকাশই তাঁর মূল লক্ষ; উপকরণ, উপাদান এবং আঙ্গিক উপায় মাত্র। নির্দেশক কর্তৃক যা বিন্যস্ত হয় শৃঙ্খলা (order) এবং প্রয়োজনীয়তার (Necessity) অনুষঙ্গে।[১] নির্দেশকের শিল্পভাবনার প্রসঙ্গটিও তাঁর ভাবাদর্শের ভিত্তিমূলকেন্দ্রিক। অর্থাৎ নাটকের আঙ্গিক ও প্রায়োগিক উপাদানগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি যে শিল্প-দর্শন বা শিল্পরীতিতে বিশ্বাসী তার উদ্ভব নির্দেশকের ভাবাদর্শের ভিত্তিমূল থেকে। তাই কোনো নির্দেশনাকর্ম সেই নির্দেশকের ভেতরের মানুষটির বা শিল্পসত্তার পূর্ণ অবয়বেরই বহিঃপ্রকাশ। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের মূল অভিপ্রায় বাংলাদেশের নাট্যনির্মাণে নির্দেশকের শিল্পভাবনা।

গবেষণার পরিধি

আলোচ্য প্রবন্ধে অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকগণ হচ্ছেন—মমতাজউদদীন আহমদ (থিয়েটার আরামবাগ, ঢাকা), আতাউর রহমান (নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা) আবদুল্লাহ আল-মামুন (থিয়েটার, ঢাকা), আলী যাকের (নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা), মামুনুর রশীদ (আরণ্যক, ঢাকা), নাসির উদ্দীন ইউসুফ (ঢাকা থিয়েটার, ঢাকা), আসাদুজ্জামান নূর (নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, ঢাকা), ফেরদৌসী মজুমদার (থিয়েটার, ঢাকা), এস. এম.

---

* ড. এস. এম. ফারুক হোসাইন, সহকারী অধ্যাপক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] ড. শীতল ঘোষ, *সাহিত্যের শিল্প ও তত্ত্ব প্রসঙ্গে* (কলিকাতা : বর্ণালী, ১৯৯৭), পৃ. ৭৭।

সোলায়মান (থিয়েটার আর্ট ইউনিট, ঢাকা), সেলিম আল দীন (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জা.বি.), জামিল আহমদ (ঢাকা পদাতিক, ঢাকা), আফসার আহমদ (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জা.বি.), তারিক আনাম (নাট্যকেন্দ্র, ঢাকা), কামরুজ্জামান রুনু (থিয়েটার আরামবাগ, ঢাকা), লিয়াকত আলী লাকী (লোকনাট্যদল, ঢাকা), জাহিদ রিপন (ফরিদপুর থিয়েটার, ফরিদপুর)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বক্ষ্যমাণ গবেষণাকর্মটি মূখ্যত মাঠপর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তভিত্তিক গবেষণা। তথ্যের অন্যতম উৎস হিসেবে ব্যবহৃত নির্বাচিত প্রযোজনার নির্দেশক, কলা-কুশলী কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য, আলোকচিত্র এবং পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সাধারণ সমালোচনা ও গবেষণা প্রবন্ধ। এ প্রসঙ্গে গবেষণার অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে তথ্যের অপ্রতুলতা। কারণ ১৯৭২ পরবর্তী অনেক নাট্যপ্রযোজনার বস্তুনিষ্ঠ তথ্য অনেকটা দুস্প্রাপ্য। ফলে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে মূখ্যত সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রাপ্ত অপ্রতুল তথ্যের সমন্বয়ে।

প্রবন্ধের পরিধি ও অবয়ব বিবেচনায় গবেষণার সময়সীমা নির্ধারিত ১৯৭২-২০০০ সাল পর্যন্ত এবং গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয় উক্ত সময়ের মধ্যে ১৬জন নির্দেশকের নির্দেশিত ৫৪টি মঞ্চ-প্রযোজনা। নির্দেশকগণের নির্দেশনাকর্মে শিল্পভাবনা প্রসঙ্গটি অনুসন্ধানের সুবিধার্থে উক্ত সময়কে তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব ১৯৭২ থেকে ১৯৮০, দ্বিতীয় পর্ব ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ এবং তৃতীয় পর্ব ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সময়। সময়ের এরূপ বিভাজন আমাদের রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলোকে যেমন বৃহৎ অর্থে চিহ্নিত করে তেমনি নাটক নির্বাচন ও নির্মাণে আমাদের নির্দেশকগণের বোধ ও আগ্রহকে নানা মাত্রায় প্রভাবিত করে। বর্তমান প্রয়াস বক্ষ্যমাণ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকগণের উল্লিখিত পর্বভিত্তিক নির্দেশনাকর্মে শিল্পভাবনা প্রসঙ্গটির অনুসন্ধান।

প্রথম পর্ব (১৯৭২-১৯৮০)

এ পর্বে নির্দেশিত নাটকগুলি হচ্ছে—আতাউর রহমান নির্দেশিত মৌলিক নাটক *মাইল পোস্ট* (১৯৬৭), *সাজাহান* (১৯৭৯); আবদুল্লাহ আল-মামুন নির্দেশিত মৌলিক নাটক *সুবচন নির্বাসনে* (১৯৭৪), *এখন দুঃসময়* (১৯৭৬), *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* (১৯৭৬); আলী যাকের নির্দেশিত মৌলিক নাটক *বাকি ইতিহাস* (১৯৭৩), *অচলায়তন* (১৯৮০), রূপান্তর নাটক এই *নিষিদ্ধ পল্লিতে* (১৯৭৩), *সৎ মানুষের খোঁজে* (১৯৭৫); মামুনুর রশীদ নির্দেশিত মৌলিক নাটক *কবর* (১৯৭২), *পশ্চিমের সিঁড়ি* (১৯৭২), *ওরা আছে বলেই* (১৯৮০); নাসির উদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত মৌলিক নাটক *সংবাদ কার্টুন* (১৯৭৩), *মুনতাসীর* (১৯৭৬), *শকুন্তলা* (১৯৭৮); আসাদুজ্জামান নূর নির্দেশিত রূপান্তর নাটক *দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা* (১৯৭৭) এবং ফেরদৌসী মজুমদার নির্দেশিত উপন্যাসের নাট্যরূপ *দুইবোন* (১৯৭৮)।

আতাউর রহমান নির্দেশিত *মাইল পোষ্ট* প্রযোজনাটির মূল পটভূমি দুর্ভিক্ষ। নাট্যকাহিনীর বিষয়বস্তু প্রকাশে মৃত গরু ও মহিষের শুকনো মাথার ব্যবহার নির্দেশকের উচ্চকিত শিল্পভাবনার প্রকাশ ঘটায়। নির্দেশক কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় বাস্তববাদ এবং অধিবাস্তববাদের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট প্রযোজনাটির অভিনয়রীতি। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নির্দেশক প্রতীক, সাজেশন, বাস্তব এবং স্বভাববাদের আশ্রয়ী। *সাজাহান*-এ নির্দেশক আতাউর

রহমানের শিল্পভাবনা একান্তভাবে পাশ্চাত্য নন্দনশাস্ত্রের অনুগত। অভিনয়, দৃশ্যপরিকল্পনা, পোশাক, মেকআপ প্রভৃতির ক্ষেত্রে নির্দেশক ছিলেন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য নির্ভর।[২]

আবদুল্লাহ আল-মামুন নির্দেশিত *সুবচন নির্বাসনে*'র মূল প্রাণ সংলাপ নির্ভর অভিনয়। নাটকটি নির্দেশনার ক্ষেত্রে নির্দেশকের শিল্পভাবনায় লক্ষ করা যায় ব্রেখটীয় রীতির প্রভাব। তাঁর নির্দেশিত অন্য নাটক *এখন দুঃসময়*-এর কাহিনীবস্তু বন্যা ও তার ফলাফল। আপ-স্টেজে ক্রমশ বন্যার পানি বৃদ্ধির সঙ্গে অভিনেতা-চরিত্রদের উৎকণ্ঠা তথা সামগ্রিক অভিনয়কে ছন্দাবদ্ধ করে উপস্থাপিত করেন নির্দেশক আবদুল্লাহ আল-মামুন। সামালোচকের মতে আবদুল্লাহ আল-মামুন নির্দেশিত *পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়* অনেকটা গীতিধর্মী কাব্যনাটক। গীত এবং কাব্যের প্রয়োজনেই সঙ্গীত একটি মূখ্য ভূমিকা পালন করে এ প্রযোজনায়। তবে অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা, পোশাক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিল্পাদর্শে প্রভাবিত নির্দেশক আবদুল্লাহ আল-মামুনের শিল্পভাবনা।[৩]

বাকি ইতহাস-এ নির্দেশক আলী যাকেরের শিল্পভাবনা পাশ্চাত্যের বাস্তববাদ রীতির অনুসারী। ভাড়া করা কিছু বস্তুগত উপাদানের সমন্বয়ে নির্দিত দৃশ্যসজ্জায় চরিত্রকেন্দ্রিক সংলাপ নির্ভর অভিনয়কেই তিনি মূখ্য করে তুলেছেন। পরবর্তী প্রযোজনা *অচলায়তন*-এ লক্ষ করা যায় বাস্তবরীতি ও প্রতীকী রীতির যৌথ সমন্বয়। বিভৎস আকৃতির গাছের গুড়ির মধ্যকার ক্ষীণ একটি আলো কুসংস্কারপূর্ণ অচলায়তনে পঞ্চকের তথা প্রগতির উপস্থিতিকে প্রতীকায়িত করে। কাপড়ের পর্দা এবং আলোর সাহায্যে শোণপাংশুদের পল্লী এবং অচলায়তনের পার্থক্যকে অর্থপূর্ণ ব্যঞ্জনায় চিত্রায়িত করেছেন দির্দেশক। শোণপাংশুদের পোশাকের বিচিত্র উজ্জল রঙ, অচলায়তনের ছাত্রদের কয়েদির পোশাক সদৃশ পোশাক ব্যবহারে আলী যাকের নাট্যচরিত্রগুলোর মানসিক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার যথার্থ প্রকাশ ঘটিয়েছেন। *বাকি ইতহাসের* শিল্পরীতির অনুবর্তন লক্ষ করা যায় আলী যাকেরের *এই নিষিদ্ধ পল্লীতে* নাটকে। তবে জানালার ধারে একটি ছোট গাছ প্রযোজনাটিকে ভিন্ন এক ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত করে। এই গাছের পরিচর্যার মধ্যদিয়ে নির্দেশক প্রকাশ করেছেন মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া একটি দম্পতির সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার প্রণানান্তকর চেষ্টা। *সৎ মানুষের খোঁজে* উপস্থাপনায় নির্দেশক আলী যাকের সম্পূর্ণতই ব্রেখটীয় রীতির আশ্রয়ী। প্লাকার্ডের ব্যবহার, দৃশ্যসজ্জায় নিরাভরণতা, অভিনয়ে বিযুক্তিকরণ, পোশাকে স্বাভাবিকতা প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দেশনাকর্মটি সম্পন্ন করেছেন তিনি।[৪]

কবর নাটকে মামুনুর রশীদ বাস্তববাদ এবং অধিবাস্তববাদের সমন্বয়ে নির্দিষ্ট করেছেন এর প্রযোজনারীতি। খাকি পোশাক পরিহিত একটি কাকতাড়ুয়া, জীর্ণ একটি গাছের ডাল প্রযোজনাটির মূল বক্তব্যকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছে। *পশ্চিমের সিঁড়ি*-তে মামুনুর রশীদ মঞ্চে শুধু একটি রেলিংওয়ালা সিঁড়ি ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পন্ন করেছেন সমগ্র অভিনয় ক্রিয়া। সিঁড়ির এই রূপকধর্মী ব্যবহার নাটকের বিষয়বস্তু প্রকাশের যথেষ্ট সহায়ক বলে মনে হয়।[৫]

---

২ কায়কোবাদ মিলন, *পূর্বাণী*, (ঢাকা : ৮ চৈত্র, ১৩৮৫)।

৩ নিজস্ব প্রতিনিধি, *ইত্তেফাক*, (ঢাকা : ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৬)।

৪ অনিরুদ্ধ, *সংবাদ*, (ঢাকা : ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭)।

৫ *আরণ্যক (একটি দলের নাট্যকথা)*, গবেষণা ও সম্পাদনা- আশিষ ঘোস্বামী, (ঢাকা : ফেব্রুয়ারি ২০০১), পৃ. ৭৮।

সংবাদ কার্টুন-এ নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ এক ধরনের ব্যঙ্গাত্মকভঙ্গি নির্ধারণ করেছেন অভিনেতাদের সংলাপ এবং চলনে। প্রযোজনাটিতে যেমন লক্ষণীয় বর্ণনাধর্মী রূপ তেমনি অভিনয়ে বিযুক্তিকরণ প্রক্রিয়াটিও দুর্লক্ষ্য নয়। নৃত্য ও ছন্দবহুল এ উপস্থাপনাটি উত্তরকালের নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফের নির্দিষ্ট শিল্পভাবনারই পূর্বাভাস দেয়।[৬] তাঁর অপর প্রযোজনায় *মুনতাসীর*-এ নাসির উদ্দীন ইউসুফ নৃত্য, সমিল গদ্য ছন্দ এবং সঙ্গীতকে ব্যবহার করেছেন নানা মাত্রায়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণতই প্রাচ্য আদর্শ অনুসারী। মিউজিক্যাল কমেডি রূপে খ্যাত এ নাটকটির নতুন এক নির্দেশনারীতির উদ্ভব বলে মনে করেন সমালোচকগণ।[৭] *শকুন্তলা* নাটকটি নির্দেশনায় নাসির উদ্দীন ইউসুফ অনেকটাই প্রাচ্যধর্মী নাট্যরীতির আদর্শ অনুসারী। অভিনেতাদের সংলাপ নির্মাণে, চরিত্রের আবেগ নির্মাণে এবং মঞ্চ পরিকল্পনার নিরাভরণতায় প্রাচ্যধর্মী নাট্যরীতির সুস্পষ্ট প্রভাব প্রযোজনাটির সর্বত্রই লক্ষণীয়।[৮]

দেওয়ান গাজীর কিস্‌সা'য় আসাদুজ্জামান নূর ব্রেখট্‌ীয় রীতির অনুষঙ্গেই নির্দেশনার কার্যটি সম্পন্ন করেছেন। ফলে অভিনয়, মঞ্চপরিকল্পনা, সঙ্গীত, আলোক-সম্পাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্রেখটীয় নির্দেশনা রীতির অনুবর্তন লক্ষণীয়। তবে নির্দেশক তাঁর শিল্পভাবনায় প্রযোজনাটিকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন। যার ফলে কাহিনীটি যেমন রূপান্তরিত হয়েছে বাঙালির কাহিনীতে, তেমনি মঞ্চে উপস্থাপিত হয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মানুষ।[৯]

দুইবোন প্রযোজনায় নির্দেশক ফেরদৌসী মজুমদার বাস্তবরীতি এবং বাস্তবরীতির সরলীকরণের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেছেন তাঁর নির্দেশনা। ঘরের দৃশ্যে পুরানো দিনের একটি জানালা ব্যবহারের মাধ্যমে তিনি তোলে ধরতে চেয়েছেন নাট্যকাহিনীর কালকে। নাট্যচরিত্রগুলোর পোশাক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও এই প্রবণতা লক্ষণীয়। উর্মিলার চিঠি পড়ার দৃশ্যে ছুটন্ত ট্রেনের শব্দ এবং শশাঙ্কর পেশা পরিবর্তনে ক্রেন ও অন্যান্য ধাতব পদার্থের সংঘর্ষের শব্দ দৃশ্যটিকে গতিশীল করে তোলে।[১০]

দ্বিতীয় পর্ব (১৯৮১-১৯৯০)

দ্বিতীয় পর্বে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত নির্দেশকগণের নির্দেশিত নাটকসমূহ হচ্ছে, মমতাজউদদীন আহমদ নির্দেশিত মৌলিক নাটক *জমিদার দর্পণ* (১৯৮৩), *সাতঘাটের কানাকড়ি* (১৯৮৯); আতাউর রহমান নির্দেশিত অনুবাদ নাটক *গডোর প্রতীক্ষায়* (১৯৮৪), *কবর দিয়ে দাও* (১৯৮৬), *গ্যালিলিও* (১৯৮৮); আবদুল্লাহ্ আল-মামুন নির্দেশিত মৌলিক নাটক *এখনও ক্রীতদাস* (১৯৮৩), *তোমরাই* (১৯৮৭), *কোকিলারা* (১৯৮৯), অনুবাদ নাটক *ওথেলো* (১৯৮১), উপন্যাসের নাট্যরূপ *ঘরে বাইরে* (১৯৮৫); আলী যাকের নির্দেশিত মৌলিক নাটক *নূরলদীনের সারাজীবন* (১৯৮৩), রূপান্তর নাটক *কোপেনিকের ক্যাপ্টেন* (১৯৮১); মামুনুর রশীদ নির্দেশিত মৌলিক নাটক *ইবলিশ* (১৯৮১), *গিনিপিগ* (১৯৮৩), *সমতট* (১৯৮৪); নাসির উদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত মৌলিক নাটক *কিত্তনখোলা* (১৯৮১),

---

৬ নরেশ ভূইয়াঁ, *চিত্রালী*, (ঢাকা : ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪)।
৭ মূলধারা প্রতিবেদন, *মূলধারা*, (ঢাকা : ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯০)।
৮ রাজা রহমান, *সংবাদ*, (ঢাকা : ২৬ এপ্রিল ১৯৮০)।
৯ হীরেন দে, *চিত্রালী*, (ঢাকা : ৮ ডিসেম্বর ১৯৭৮)।
১০ ফিরোজ আহমদ, *ইত্তেফাক*, (ঢাকা : ৯ মার্চ ১৯৭৮)।

কেরামতমঙ্গল (১৯৮৫), *হাত হদাই* (১৯৮৯); লিয়াকত আলী লাকী নির্দেশিত রূপান্তর নাটক *কঞ্জুস* (১৯৮৭)।

মমতাজউদদীন আহমদ নির্দেশিত *জমিদার দর্পণ* প্রযোজনায় অভিনয় এবং প্রয়োগ-পরিকল্পনায় লক্ষ করা যায় বাস্তবরীতি ও ইঙ্গিতধর্মীরীতির সমন্বয়। চারটি বাঁশের খুঁটি ও ক্ষুদ্র একটি চালার সাহায্যে দেখানো হয়েছে আবু মোল্লার গৃহ। সিঁড়ির একটি ধাপ পেরিয়ে গৃহাভ্যন্তর। অন্যদিকে চারটি ধাপ অতিক্রম করে উঁচু একটি প্লাটফর্মে স্থাপিত হয়েছে জমিদারের আবাসস্থল। বস্তুগত কিছু উপদানের উচ্চতার তারতম্য ঘটিয়ে আবু মোল্লা ও জমিদারের মধ্যকার শ্রেণীগত বৈষম্যটি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন দির্দেশক। *সাতঘাটের কানাকড়ি* মূলত স্যাটায়ারধর্মী প্রযোজনা। এ প্রযোজনার অভিনয়ে বাস্তবরীতি এবং দৃশ্যপরিকল্পনায় প্রতীকী রীতির আশ্রয়ী মমতাজউদদীন আহমদ। আপ-স্টেজে ব্যবহৃত মাকড়শার জালে সাত ছেলের আটকে পড়ার দৃশ্যটি একই সঙ্গে দর্শদের যেমন সচকিত ও মুগ্ধ করে, সেই সঙ্গে নাট্যকাহিনীর পুরো বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটি আভাসও প্রদান করে।

গডোর প্রতীক্ষায় প্রযোজনাটিতে আতাউর রহমান দৃশ্যসজ্জা হিসেবে ব্যবহার করেছেন বৃক্ষাকৃতি একটি হাতের সাজেশন। হাতের ভাগ্যরেখার ওপর মানুষের যে নির্ভরশীলতা সে বিশ্বাসকেই প্রতিকায়িত করেছেন নির্দেশক। সমগ্র প্রযোজনায় নৈঃশব্দের সৃষ্টিতে এবং প্রতীক্ষিত সময়গুলোকে আরো দীর্ঘতম করার অভিপ্রায়ে পানি পড়ার টুপ-টুপ শব্দের ব্যবহার, প্রযোজনাটির অভিনয়ে ভিন্ন একটি দ্যোতনার সৃষ্টি করে। *কবর দিয়ে দাও* প্রযোজনায় যুদ্ধে নিহত সৈনিদের বীভৎস চেহারা এবং বীভৎস সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহারে যুদ্ধের ভয়াবহতার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেছেন নির্দেশক আতাউর রহমান। মেকআপ ও পোশাকের ক্ষেত্রে নির্দেশক সম্পূর্ণতই চরিত্রানুরূপ।[১১] তাঁর অন্য প্রযোজনা *গ্যালিলিও*-তে নির্দেশক আতাউর রহমান দৃশ্যসজ্জার বাহুল্যের পরিবর্তে শুধুমাত্র সংলাপ নির্ভর অভিনয়কেই মূল অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। পোশাক এবং সঙ্গীত ব্যবহারে তিনি সেকালের ইতালিয়ান আবহ তৈরিতেই সচেষ্ট ছিলেন।

এখনও ক্রীতদাস নাটকের নাট্যঘটনা আবর্তিত মূলত একটি বস্তিকে কেন্দ্র করে। বাস্তবরীতি এবং বাস্তবকে সরলীকরণের মধ্য দিয়ে বস্তিবাসীর বিচিত্র জীবনের সরল এক মঞ্চচিত্র রচনা করেছেন নির্দেশক আবদুল্লাহ আল-মামুন। তাঁর পরবর্তী নির্দেশনা *তোমরাই*-এ অভিনয়, দৃশ্যসজ্জা, পোশাক, আলো প্রভৃতির ক্ষেত্রে নির্দেশক পূর্বোক্ত প্রযোজনায় (*এখনও ক্রীতদাস*) নির্দিষ্ট শিল্পরীতিরই অনুবর্তন ঘটিয়েছেন। *কোকিলারা* নাটকটির নির্দেশনায় আবদুল্লাহ আল-মামুন মঞ্চ উপাচারের আধিক্যের পরিবর্তে মঞ্চের 'স্পেস'-কেই অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে কোকিলার একাকিত্ব ও নিঃস্বঙ্গতা। দৃশ্যসজ্জায় ব্যবহৃত খিলানহীন দুটি ন্যাড়া থাম আমাদের অন্তঃসারশূন্য সভ্যতারই প্রতীক বলে মনে হয়। দ্বিতীয় কোকিলার বিয়ে এবং মধুযামিনীর প্রসঙ্গে গাঙচিলের ডাক আবহটি নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন।[১২]

---

[১১] রামেন্দু মজুমদার, *সুন্দরম*, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা : ভাদ্র-কার্তিক ১৩৯৩), পৃ. ১১৪-১১৫।

[১২] শফি আহমেদ, *সুন্দরম*, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা : জ্যৈষ্ট-শ্রাবণ ১৩৯৬), পৃ. ৯৬।

ওথেলো প্রযোজনাটি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্যে লক্ষ করা যায়, "পোশাকে তাঁরা যত পুঙ্খানুপুঙ্খ মঞ্চসজ্জায় নন তত বাস্তবিক, সঙ্গীতে প্রায় উদ্দেশ্যবিহীন।"[১৩] এ মন্তব্যে *ওথেলো*-র নির্দেশক আবদুল্লাহ আল-মামুনের শিল্পভাবনার একটি সাধারণ পরিচয় উদঘাটিত হয়। সম্ভবত *ওথেলো*-কে শেক্সপীয়রের একটি ধ্রুপদী নাটক হিসেবেই তিনি মঞ্চে এনেছেন। এ কারণেই নির্দেশকের নিজস্ব শিল্পভাবনায় নিরীক্ষাধর্মী কোন প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। আবদুল্লাহ আল-মামুনের পরবর্তী প্রযোজনা *ঘরে বাইরে*-তে লক্ষণীয় বাস্তবরীতি ও বাস্তবের সরলীকরণের প্রয়াস। সংলাপনির্ভর অভিনয়কেন্দ্রিক এ প্রযোজনায় সঙ্গীত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নূরলদীনের সারাজীবন-এ নির্দেশক আলী যাকের অভিনয় মঞ্চকে উদ্ভাসিত করেছেন পূর্ণিমা চাঁদের শ্বেতশুভ্র আভায়। দর্শকের উপলব্ধিতে আসে বন সংলগ্ন কোনো এক নদীর ধূসর পাড়ের বাস্তব কোন ঘটনাকেই যেন তাঁরা প্রত্যক্ষ করছেন। ইংরেজ এবং কৃষকদের মধ্যকার শ্রেণীগত, জাতিগত পার্থক্যকে পোশাকের সাহায্যে যথার্থরূপে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। *কোপেনিকের ক্যাপ্টেন*-এ আলী যাকের মঞ্চকে ব্যবহার করেছেন পিটার ব্রুকের এম্পটি স্পেস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। সংলাপ-নির্ভর চরিত্রকেন্দ্রিক অভিনয়রীতিতে মহিলা সমিতি মঞ্চের দর্শকাসনের মধ্যবর্তী বৃহৎ অংশকে তিনি রূপান্তর করেছেন অভিনয় মঞ্চরূপে।

ইবলিশ-এ নির্দেশক মামুনুর রশীদ বাঁশ-ঝোঁপ, বাঁশে ঝুলানো সুতার লাচি, স্লাইড প্রজেক্টরের সাহায্যে প্রদর্শিত মসজিদের মিনার, মেঘ ও বৃষ্টির দৃশ্য প্রভৃতির সমন্বয়ে মঞ্চনাট্য রচনা করেন। প্রযোজনাটির সার্বিক পরিকল্পনায় তেমন কোনো নতুনত্বের আভাস না মিললেও যান্ত্রিক সুবিধা গ্রহণের প্রসঙ্গটি বেশ কুশলতার সাথে ব্যবহার করেছেন নির্দেশক। দলীয় অভিনয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশকের নৈপূণ্য উৎসাহব্যঞ্জক। *গিনিপিগ*-এ মূল মঞ্চব্যবস্থা হিসেবে লক্ষ করা যায় একটি সিঁড়ির বহুমাত্রিক ব্যবহার। আমাদের শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সঙ্গতিপূর্ণ প্রতীক হিসেবে সিঁড়িটির বহুমাত্রিক ব্যবহার অনেকটাই অর্থপূর্ণ। অন্যত্র *সমতট* প্রযোজনায় মামুনুর রশীদ মঞ্চসজ্জায় রূপকাশ্রয়ী। অভিনয়সহ অন্যান্য পরিকল্পনায় পূর্বোক্ত প্রযোজনাগুলোর প্রয়োগরীতির অনুষঙ্গেই নির্ণীত।[১৪]

কিত্তনখোলা নাটকের নির্দেশনায় নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাঙলা নাট্যাভিনয়ের নির্দিষ্ট একটি রূপ সৃজনে প্রয়াসী। ফলে মঞ্চপরিকল্পনায় এসেছে যেমন নিরাভরণতা, তেমনি অভিনয়ে লক্ষ করা যায় লোকায়ত অভিনয়রীতির বিচিত্রতর ব্যঞ্জনা। মৃত মহিষের শিং, ভাঙ্গা ঘুড়ি, গরুর গাড়ির চাকা, মঞ্চের ধূসর রঙ প্রভৃতি অনুষঙ্গগুলি জীবনের গভীর সত্যকে প্রকাশপূর্বক মঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন দ্যোতনার সৃষ্টি করে। অভিনয়ের প্রতি সর্গে সর্গ-সংখ্যা অনুযায়ী ব্যবহৃত ঘণ্টাধ্বনি যাত্রা পালার অভিনয়রীতিকে স্মরণ করায়। প্রযোজনায় ব্যবহৃত কাঁকড়ার দাঁত সদৃশ মঞ্চটি আমাদের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার প্রকৃত স্বরূপটি

---

[১৩] মফিদুল হক, *থিয়েটার* (নাট্য ত্রৈমাসিক), সম্পাদক- রামেন্দু মজুমদার, (ঢাকা : ১০ম বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ যুগ্ম সংখ্যা, অক্টোবর ১৯৮৩), পৃ. ২৩৭-২৩৮।

[১৪] তপন দাস, *আরণ্যকের সমতট, একটি নান্দনিক প্রযোজনা*, সুন্দরম, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা : ভাদ্র-কার্তিক ১৩৯৫), পৃ. ৮৫।

প্রকাশ করে। যার চাপে যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষের রূপান্তর ঘটছে প্রতিনিয়ত।[১৫] *কেরামতমঙ্গল*-এ নাসির উদ্দীন ইউসুফের বদলি অভিনয়রীতিটি প্রাচীন বাঙলার নাথ গীতিকার প্রভাবকে স্বীকার করে নেয়। নানা ভঙ্গুরতার সমন্বয়ে সৃষ্ট বৃত্তাবদ্ধ মঞ্চচিত্রে *কেরামতমঙ্গল*-এর অভিনয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে, যা বৃত্তায়িত জীবনের প্রতীক। ফলে সমাজের গণ্ডী থেকে কেরামতের বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তায়িত মঞ্চের বিভাজিত অংশেরও বিচ্ছিন্নতা ঘটে। সমালোচকের মতে মঞ্চসজ্জার মাধ্যমে জীবনের রূপান্তরের এরূপ প্রতীকী রূপায়ণ সম্ভবত বাঙলা নাট্যমঞ্চে এটিই প্রথম।[১৬] বিশেষজ্ঞের মতে প্রযোজনাটির নন্দন কৌশলে পাশ্চাত্যের নানা উপাদানের ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও মঙ্গলকাব্যের প্রভাব এতে দুর্লক্ষ্য নয়। যার ফলে অভিনয়রীতিতে ও সঙ্গীতে লক্ষণীয় বাঙালির নাট্যাভিনয় রীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ।[১৭] *হাত হদাই* প্রযোজনায় নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ সমুদ্রোপকূলীয় সংগ্রামশীল ভাঙ্গা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিচ্ছবিটি উৎসব মুখরতায় মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন। ফলে বহুবর্ণিল পোশাকে সজ্জিত মানুষগুলোর জাগতিক জীবনের নানা সুখ-দুঃখ ও স্বপ্নভাঙ্গার আর্তনাদের অনুষঙ্গে মঞ্চে ওঠে এসেছে লৌকিক নানা আনন্দানুষ্ঠান। ভেড়ার লড়াই, কাছিম শিকার, মোরগের লড়াই, ঘুড়ি উড়ানো, বলী খেলা প্রভৃতি বাঙালির ঐতিহ্যকে মঞ্চায়নে নির্দেশক বাঙলা নাট্যনির্দেশনায় ভিন্ন ও স্বতন্ত্র একটি আবহ সৃষ্টি করেন। নিরাভরণ মঞ্চটির বর্ধিত সম্মুখভাগ নদী ভাঙ্গনের প্রতীক হিসেবে নাট্যকাহিনীর ভৌগোলিক অবস্থাকে চিহ্নিত করে যথার্থরূপে। চুক্কুনীর মৃত্যুর দৃশ্যটি অভিনয় ও আলোর যৌথ সম্মিলনে উচ্চতম শিল্প-কুশলতায় উদ্ভাসন করেছেন নাসির উদ্দীন ইউসুফ। উল্লেখ্য, এই প্রযোজনাটি বাংলা নাট্যনির্দেশনার আদর্শ রূপে বিবেচিত হতে পারে।[১৮]

কঞ্জুস-এর নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকীর মন্তব্য থেকে জানা যায়, মলিয়েরের নাট্যাভিনয়ের প্রাক-শর্ত পূরণের অভিপ্রায়ে তিনি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের তৈরিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। মূল নাট্যকাহিনীর বিষয়বস্তুকে তিনি উপস্থাপন করেছেন পুরাতন ঢাকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ জীবন ও সংস্কৃতির অনুষঙ্গে।[১৯] কিন্তু প্রযোজনাটি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য থেকে জানা যায়, এর কাহিনী-বিন্যাস, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, আলোর কোনটিই শিল্পসম্মতভাবে উপস্থাপিত হয় নি।[২০] তাদের মতে অতিঅভিনয় হিন্দি ও উর্দু গানের অর্থহীন ব্যবহার এর মঞ্চ সফলতার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে।

তৃতীয় পর্ব (১৯৯১-২০০০)

তৃতীয় পর্বে আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত নিদের্শকগণের নির্দেশিত নাটকসমূহ হচ্ছে— মমতাজউদদীন আহমদ নির্দেশিত মৌলিক নাটক *বট বৃক্ষের ধরম করম* (২০০০);

---

[১৫] আফসার আহমদ, *ঢাকা থিয়েটারের কিত্তনখোলা : মহাজীবনের মঞ্চসঙ্গীত*, সুন্দরম, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা : শীত সংখ্যা, অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৯৫), পৃ. ৯৬।

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

[১৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

[১৯] আলফ্রেড যোশেফ, *আকর্ষণ*, (ঢাকা : ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩)।

[২০] মো. হাবিবুল্লাহ, *লোকনাট্য দলের কুঞ্জুস*, সুন্দরম, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা : অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৯৬), পৃ. ৮২।

আতাউর রহমান নির্দেশিত মৌলিক নাটক *ঈর্ষা* (১৯৯১), অনুবাদ নাটক *গণনায়ক* (১৯৯২), *হিম্মতী মা* (১৯৯৫); আবদুল্লাহ আল-মামুন নির্দেশিত মৌলিক নাটক *মেরাজ ফকিরের মা* (১৯৯৫), রূপান্তর নাটক *দ্যাশের মানুষ* (১৯৯১); আলী যাকের নির্দেশিত মৌলিক নাটক *খাট্টা তামাশা* (১৯৯৫), রূপান্তর নাটক *দর্পণ* (১৯৯৭); মামুনুর রশীদ নির্দেশিত *জয়জয়ন্তী* (১৯৯৫), *প্রাকৃতজনকথা* (১৯৯৭); এস. এম. সোলায়মান নির্দেশিত রূপান্তর নাটক *কোর্টমার্শাল* (১৯৯৩); সেলিম আল দীন নির্দেশিত নব্য নৃ-গোষ্ঠী নাট্য *একটি মারমা রূপকথা* (১৯৯৩); নাসির উদ্দীন ইউসুফ নির্দেশিত মৌলিক নাটক *বনপাংশুল* (১৯৯৮), *প্রাচ্য* (২০০০); জামিল আহমদ নির্দেশিত মৌলিক নাটক *চাকা* (১৯৯১), উপন্যাসের নাট্যরূপ *বিষাদ সিন্ধু* (১ম পর্ব, ১৯৯১), *বিষাদ সিন্ধু* (২য় পর্ব, ১৯৯২); আফসার আহমদ নির্দেশিত নব্য নৃ-গোষ্ঠী নাট্য *মা চ ক্যান* (১ম পর্ব-১৯৯৬), *মা চ ক্যান* (২য় পর্ব-১৯৯৭); তারিক আনাম খান নির্দেশিত রূপান্তর নাটক *বিচ্ছু* (১৯৯১); কামরুজ্জামান রুনু নির্দেশিত ঐতিহ্যবাহী বাঙলা নাটক *রূপভান* (১৯৯৬); লিয়াকত আলী লাকী নির্দেশিত *সোনাই মাধব* (১৯৯৩); জাহিদ রিপন নির্দেশিত *কাজলরেখা* (১৯৯৬)।

বটবৃক্ষের ধরম করম প্রযোজনায় মমতাজউদদীন আহমদ নাট্যচরিত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ছন্দাবদ্ধতার চমৎকার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শুভ এবং অশুভের দ্বন্দ্ব এ নাটকের মূল প্রতিপাদ্য। পোশাকে, আচরণে যথার্থরূপে উভয় শক্তির প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ করেছেন নির্দেশক। অশুভ শক্তির আস্তানা হিসেবে বটবৃক্ষের প্রতীকী ব্যবহার প্রযোজনাটির মূল বক্তব্যকে স্পষ্টতর করে তোলে। বাস্তববাদ, পরাবাস্তববাদ ও ফোকফ্যান্টাসির এক ধ্রুপদী মিশ্রণে উচ্চকিত ব্যঙ্গ বিদ্রুপ শ্লেষেভরা অঙ্গভঙ্গি সহকারে নাট্য মুহূর্তসমূহ তৈরি করেছেন নির্দেশক এ প্রযোজনাটিতে। অর্থাৎ *বটবৃক্ষের ধরম করম* প্রযোজনায় নির্দেশক অনেকটা সমন্বয়বাদের আশ্রয়ী। ইঙ্গিতধর্মী মঞ্চরীতি, বাস্তবরীতির অভিনয় ও পোশাক, ফ্যান্টাসিধর্মী সঙ্গীতের প্রয়োগ এ সত্যেরই যথার্থতা প্রমাণ করে। মমতাজউদদীন আহমদ তাঁর শিল্পভাবনায় অনেকটা পাশ্চাত্য রীতি অনুসারী।

ঈর্ষা'য় আতাউর রহমান সংলাপনির্ভর চরিত্রকেন্দ্রিক অভিনয়ের বিশুদ্ধ একটি রূপ নির্মাণে অভিপ্রায়ী হয়েছেন। স্থান এবং কালের ঐক্যের যৌথ সম্মিলনে উপস্থাপিত হয়েছে প্রযোজনাটি। বিশাল স্পেস এবং সীমিত মুভমেন্টে চরিত্র তিনটির নিঃসঙ্গতার শৈল্পিক অবয়ব সৃষ্টি করেছেন নির্দেশক আতাউর রহমান। যুবতীকে লক্ষ করে প্রৌঢ়ের নিক্ষিপ্ত ফুলদানিটি যেন চরিত্র তিনটির মধ্যকার সম্পর্ককেই প্রতীকায়িত করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যা খান-খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। *গণনায়ক*-এর অভিনয়ে চরিত্রগুলো নির্মাণের ক্ষেত্রে নির্দেশক আতাউর রহমান সম্পূর্ণতই শেক্সপীয়রীয় অভিনয়রীতিকে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু দৃশ্যসজ্জায় ব্যবহার করেছেন বিভিন্ন রঙের নানা পর্দা। এ ক্ষেত্রে মঞ্চের স্পেসের ব্যবহারের প্রসঙ্গটিকেই তিনি অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। *হিম্মতী মা* নাটকটি মূলত ব্রেখটীয় এপিকধর্মী নাটক। কিন্তু নির্দেশক আতাউর রহমান এর উপস্থাপনরীতি হিসেবে নির্দিষ্ট করেছেন সংলাপনির্ভর চরিত্রকেন্দ্রিক অভিনয়রীতিকে। *হিম্মতী মা*-র ঠেলাগাড়িটি ব্যতীত মঞ্চসজ্জার অন্যান্য প্রসঙ্গগুলো তৈরিতে অনেকটা প্রতীকী এবং সরলীকরণের আশ্রয় নিয়েছেন তিনি।

মেরাজ ফকিরের মা প্রযোজনায় নির্দেশক আব্দুল্লাহ আল-মামুন বাস্তবরীতি অভিনয়ের সাথে সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন ব্রেখটীয় অভিনয়রীতির। ফলে মঞ্চসজ্জায় নির্দেশক তার পূর্বতর

প্রযোজনাগুলো থেকে অনেকটা সহজ-সরল ও নিরাভরণ। অভিনেয়-চরিত্রদের পোশাক ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বাস্তবরীতির অনুসরণ। অভিনয়ের শেষাংশে অতুল প্রসাদের 'সবারে বাসরে ভালো'[২১] এই গানটির মাধ্যমে নির্দেশক সংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মূল দ্বন্দ্বের স্বরূপটিই যেন প্রকাশ করেন।

খাট্টা তামাশা-য় নির্দেশক আলী যাকের সমগ্র প্রযোজনাটিকে গড়ে তুলেছেন সংলাপনির্ভর চরিত্রকেন্দ্রিক অভিনয়ের অনুষঙ্গে।[২২] নাটকটির মূল উপজীব্য দুর্ভিক্ষ। পোড়া বাঁশের বেড়ার উপর ছড়ানো একটি ছেঁড়া কাপড়, কালো কাপড়ে অঙ্কিত জয়নুল আবেদীনের দুর্ভিক্ষের চিত্র এবং একটি কাঠের গুড়ির সমন্বয়েই সম্পন্ন হয়েছে এর মঞ্চসজ্জা। নাটকের বিষয়বস্তুর সাথে এই পরিকল্পনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং অর্থবোধক। নিরাভরণ মঞ্চ এবং মৃদু আলোর সাহায্যে অভিনয়ে একটি বিষণ্ন আবহ সৃষ্টির মাধ্যমে আলী যাকের নাটকের মূল সুরটিকেই যেন স্পর্শ করতে চেয়েছেন। *দর্পণ* নাটকের নির্দেশনায় আলী যাকের অনেকটা বাঙলা লোক নাট্য-আঙ্গিকের আদর্শ অনুসারী। অভিনয়ের সূচনাতেই লক্ষ করা যায় দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যবদ্ধ সুর-ঝংকার। যা প্রাচীন ভারতীয় 'নান্দী' রীতি এবং লোকনাট্য যাত্রাপালার সঙ্গে সদৃশ্যপূর্ণ।[২৩] এছাড়াও নাট্যকাহিনীর অগ্রগতির লক্ষ্যে গায়েন ও দোহার রীতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। দৃশ্যসজ্জায় তিনটি দরজার কঙ্কালসদৃশ কাঠামো ব্যবহারের মাধ্যমে নির্দেশক অতি সহজেই প্রকাশ করেছেন আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার অন্তঃসার শূন্যতাকে।

জয়জয়ন্তী প্রযোজনায় মামুনুর রশীদ চরিত্রকেন্দ্রিক অভিনয়ের সমান্তরালে সঙ্গীতকেও গুরুত্বপূর্ণরূপে বিবেচনা করেছেন নাটকের কাহিনীবস্তু উপস্থাপনের অভিপ্রায়ে। ফলে সংলাপে, দেহভঙ্গিমায় স্বাভাবিকভাবেই লক্ষণীয় সংযমী ভাব। প্রযোজনাটির মঞ্চব্যবস্থাপনায় নির্দেশক নির্দিষ্ট করেন মহিলা সমিতি মঞ্চের দর্শকাসনের মধ্যবর্তী স্থান। ঈষৎ অসমতল আনুভূমিক একটি কাঠের প্লাটফর্ম মঞ্চরূপে ব্যবহৃত হয়েছে উক্ত প্রযোজনায়। সম্পূর্ণ নিরাভরণ এ মঞ্চে অভিনেতাদের প্রভাব দক্ষতায় নির্দেশক পূর্ণ করেছেন মঞ্চের সকল শূন্যতা। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কীর্তনীয়ার ব্যবহার এবং অভিনয়ে বিভিন্ন লোকনাট্য-আঙ্গিকের ব্যবহারে প্রযোজনাটিতে অনেকটা প্রাচ্যধর্মী অভিনয়রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়।[২৪] মামুনুর রশীদ তাঁর নির্দেশিত নাটকগুলোর অভিনয়ে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ বা দলীয় অভিনয়ের একটি শিল্পিত রূপদানে সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন। জয়-পরাজয় যাই হোক না কেন, শ্রেণী-বৈষম্যের প্রতিবাদ তাঁর প্রযোজনাগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। মামুনুর রশীদের *প্রাকৃতজনককথা* প্রযোজনাটিও এর ব্যতিক্রম নায়।

কোর্টমার্শাল-এ এস. এম. সোলায়মান সম্পূর্ণতই পাশ্চাত্যের বাস্তবধর্মী অভিনয়রীতির আশ্রয়ী। চরিত্রকেন্দ্রিক অভিনয় সমৃদ্ধ এ প্রযোজনাটিতে প্রধান আকর্ষণ অভিনেতাদের বাচিক

---

[২১] আতাউর রহমান, *সুন্দরম*, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা : ভাদ্র-কার্তিক ১৪০৩ সংখ্যা), পৃ. ৮০-৮১।

[২২] মফিদুল হক, *নাগরিক এর তিতামিঠা প্রযোজনা*, সুন্দরম, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা: ভাদ্র-কার্তিক ১৪০২ সংখ্যা), পৃ. ৮৮।

[২৩] রশিদ হারুন, *সুন্দরম*, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা : ভাদ্র-কার্তিক ১৯৯৮), পৃ. ৮০-৮১।

[২৪] আতাউর রহমান, *ভোরের কাগজ*, (ঢাকা : ২৩ জুলাই ১৯৯৬)।

অভিনয়ের উৎকর্ষতা। গান ও বিভিন্ন রাগের ব্যবহারে প্রযোজনাটিতে নান্দনিক একটি দ্যোতনার সৃষ্টি করেছেন। আলোর ব্যবহার অতি সাধারণ হলেও সিপাহী আকবরের অতীত স্মৃতি এবং ফাঁসির দৃশ্য ভিন্ন মাত্রার সৃষ্টি করে।[২৫]

নব্য নৃ-গোষ্ঠী নাট্য *একটি মারমা রূপকথা-য়* সেলিম আল দীন বদলি অভিনয়রীতি ও বাঙলা বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সংমিশ্রণে মঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন মারমাবাসীর প্রাকৃত জীবনকে। দৃশ্যসজ্জাহীন নিরাভরণ মঞ্চে বর্ণিল ওড়না আর কঞ্চির রেখার বহুমাত্রিক ব্যবহারে নির্দেশক ঘুচিয়ে দিয়েছেন[২৬] পাশ্চাত্যধর্মী মঞ্চসজ্জার ক্লিশে বাস্তবতার সকল প্রয়োজনীয়তাকে। পরীকন্যাদের মর্তে আগমনের সিঁড়ি বা ঝর্ণা, সুতাকাটার চরকা, নাগরাজের গুহা, পদ্ম, বিয়ের আসর, শিকারের দৃশ্য প্রভৃতি দৃশ্য-উপাদানসমূহ কঞ্চি ও বর্ণিল ওড়নার সাহায্যে নির্মিত হয়েছে নির্দেশকের সৃজন ক্ষমতার নিপুণ প্রয়োগে। হ্রদের পানিতে গোসলের অভিপ্রায়ে পরীকন্যাদের বস্ত্র খোলার স্পর্শকাতর দৃশ্যটিও নান্দনিকতায় নন্দিত হয় নির্দেশকের সৃজনশীলতায়। পোশাক, সঙ্গীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রেও নির্দেশকের এ সৃষ্টিশীলতার পরিচয় মেলে। বাংলাদেশের এ ধারার নাট্যনির্দেশনার এটিই যেমন প্রথম নিদর্শন তেমনি ঢাকার মঞ্চে কঞ্চি ও ওড়নার এরূপ বহুমাত্রিক ব্যবহারও সম্পূর্ণরূপে নতুন।[২৭]

বনপাংশুল প্রযোজনাটি মূলত পাঁচালি ধর্মী উপস্থাপনা। নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ সম্ভবত এ কারণেই তাঁর এ প্রযোজনাকে চিহ্নিত করেন নব্যকালের প্যাঁচালি অভিধায়।[২৮] যার আধুনিক রূপায়ণে নির্দেশক গ্রহণ করেছেন আসর-কেন্দ্রিক অভিনয়ের বর্ণনাত্মক মঞ্চায়নরীতি। ফলে সংগত কারণেই নির্দেশককে যেখানে ক্ষয়িষ্ণু অরণ্য এবং অরণ্যবাসী বিলুপ্তপ্রায় মান্দাইদের জীবনাচরণের বর্ণনাধর্মী আসরকেন্দ্রিক উপস্থাপনা সম্ভব। কারণ, অরণ্যের সঙ্গে অরণ্যবাসীর সম্পৃক্ততা অবিচ্ছেদ্য। নাসির উদ্দীন ইউসুফ তাঁর নান্দনিক শিল্পভাবনায় মহিলা সমিতির দর্শকাসনের মধ্যবর্তী আয়তকার স্থানে প্রাসঙ্গিকভাবেই নির্মাণ করেছেন সঞ্চরণশীল অরণ্য।[২৯] মান্দাইদের জীবনের নানা সংস্কার, বিশ্বাস, সুখ-দুঃখের নানা ঘটনা, প্রাত্যহিক জীবন, ফরেস্টারের আত্মদ্বন্দ্ব, লুৎফর মাষ্টারের অরণ্যপ্রীতি প্রভৃতি অনুষঙ্গগুলিকে যেখানে নির্দেশক উপস্থাপিত করেছেন বাঙালির নিজস্ব অভিনয় পদ্ধতিতে। পোশাকের ক্ষেত্রে সাদা রঙ শাড়ির রক্তরঙের আঁচলটি সুকী, মঙ্গলি, সোনামুখিসহ প্রত্যেক মান্দাই নারীর ভেতরকার নীরব রক্তক্ষরণেরই প্রকাশ ঘটায়। *প্রাচ্য* প্রযোজনায় নির্দেশক নাসির উদ্দীন ইউসুফ বাঙালির লোকজধর্মী বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সঙ্গে স্তানিস্লাভস্কি প্রবর্তিত অভিনয়রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন।[৩০] তবে নির্দেশক

---

[২৫] মামুনুর রশীদ, *সুন্দরম*, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা : জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৪০০), পৃ. ১১০-১১২।

[২৬] লুৎফর রহমান, *এথনিক থিয়েটার : একটি মারমা রূপকথা*, নাট্যকলা, বাংলাদেশের গ্রাম থিয়েটারের ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সম্পাদক- সেলিম আল দীন, (ঢাকা : ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৪), পৃ. ৬৯।

[২৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

[২৮] প্রযোজনা স্মারক (*বনপাংশুল*)।

[২৯] লুৎফর রহমান, *সুন্দরম*, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা : ফাল্গুন ১৪০৫, বৈশাখ ১৪০৬), পৃ. ৭০।

[৩০] প্রযোজনা স্মারক (*প্রাচ্য*)।

বর্ণনাত্মক অভিনয়কে সম্পূর্ণতই স্বতন্ত্ররূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর পূর্বোক্ত প্রযোজনাগুলোর বর্ণনাকারী নাট্যচরিত্রের ভাবপ্রকাশক। চরিত্রের অভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এসে চরিত্রের অনুভূতিগুলো প্রকাশ পূর্বক পুনরায় ফিরে যায় চরিত্রের ভেতর। ঢাকার মঞ্চে এরূপ অভিনয়ের নির্দেশন সম্ভবত এটিই প্রথম। এছাড়াও নোলককে সাপে কাটার পর ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ, ভাসানযাত্রার গান প্রভৃতি বিষয়সমূহের মঞ্চরূপ দানে নির্দেশক আশ্রয় নিয়েছেন বাঙালির লোকায়ত ঐতিহ্যের। মহিলা সমিতি মঞ্চের দর্শকাসনের মধ্যবর্তী স্থানে আড়াআড়ি স্থাপিত মঞ্চটির বিশাল পরিকল্পনায় সয়ফলের বিস্তৃত জীবনের প্রতীক হয়ে ওঠে।[৩১] রঙের ক্ষেত্রে একমাত্র ব্যক্তিক্রমী পোশাক সাদা শাড়ি পরিহিত দাদীকে নির্দেশক প্রতীকায়িত করেছেন প্রাচ্য জনপদের সহস্র বছরের জীবনদর্শনের প্রতিমূর্তি রূপে।

চাকা-য় নির্দেশক জামিল আহমেদ বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির শিল্পোত্তীর্ণ এক রূপ নির্ণয়ে সচেষ্ট হয়েছেন। শুধুমাত্র সংলাপের প্রাধান্যে তিনি বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কথানাট্যের প্রথম মঞ্চরূপ।[৩২] প্রযোজনাটি উপস্থাপনে নির্দেশক অবলম্বন করেছেন গায়েনরীতির অভিনয়পদ্ধতিকে। মূল গায়েন বা কথক এ অভিনয়পদ্ধতিতে নিজেই বিভিন্ন চরিত্রের রূপায়ণ ঘটান অবলীলায়। গ্রামীণ নানান উপকরণ ও উপাদানের ব্যবহারের মহিলা সমিতির দর্শকাসনে সংস্থাপিত নিরাভরণ মঞ্চটি গৃহাঙ্গন কোন আসরেরই অনুভূতি জন্মায়।[৩৩] *বিষাদ* সিন্ধু প্রযোজনায় নির্দেশক জামিল আহমেদ বাঙলা বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির সঙ্গে পাশ্চাত্যধর্মী অভিনয়রীতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ফলে প্রযোজনাটির অভিনয়রীতিতে কোন একক বা নির্দিষ্ট কোন রীতির অনুবর্তন ঘটে নি। এ ক্ষেত্রে জামিল আহমেদ রীতিগত কোন ঐক্যকে প্রাধান্য না দিয়ে গ্রহণ করেছেন সারগ্রাহী প্রযোজনারীতি। পরিণতিতে প্রযোজনাটিতে লক্ষ করা যায় গাজিরগান, পালাগান, পুতুলনাচ, লাঠি খেলাসহ লোক নাট্য-আঙ্গিকের নানা ঐতিহ্যবাহী রূপ এবং পিটার ব্রুক, ব্রেখট, গ্রোটোয়াস্কির রীতি-পদ্ধতিসহ বিশ্বনাট্যের বিচিত্র প্রকরণ।[৩৪]

রূপভান সম্পূর্ণতই একটি মিশ্ররীতির বা সারগ্রাহী প্রযোজনা। প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী যাত্রাপালা, কথাকলি, ভরত নাট্যম, পালাগান-এর সঙ্গে পাশ্চাত্যের চরিত্রকেন্দ্রিক অভিনয়ের যৌথ সমন্বয়ে এ প্রযোজনাটি উপস্থাপিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অভিনেতাদের সংলাপ-নির্মাণ, মঞ্চসজ্জা, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির প্রসঙ্গে নির্দেশক কামরুজ্জামান রুনু প্রাচ্যধর্মী অভিনয়রীতিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। নিরাভরণ মঞ্চে মঞ্চসজ্জা হিসেবে শুধুমাত্র চিত্রপটের ব্যবহার প্রয়োজনাটিতে ভিন্ন একটি দ্যোতনা সৃষ্টি করলেও এর প্রয়োগ বাঙলা নাট্যমঞ্চে নতুন নয়।

---

[৩১] ফৌজিয়া খান, *ভোরের কাগজ*, (ঢাকা : ১৮ মার্চ ২০০২)।

[৩২] সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্য নির্দেশনা শিল্পরীতি : নাসির উদ্দীন ইউসুফ*, থিয়েটার স্টাডিজ, সম্পাদক- সেলিম আল দীন, (ঢাকা : সংখ্যা ৭, জুন ২০০০, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জা.বি), পৃ. ১৮।

[৩৩] আফসার আহমদ, *সুন্দরম*, সম্পাদক- মুস্তফা নূরুল ইসলাম, (ঢাকা : জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ ১৩৯৮), পৃ. ৯২-৯৩।

[৩৪] জামিল আহমদ, *বিষাদ সিন্ধু : গ্রন্থ থেকে নাট্যে*, স্যাস (নাট্যপত্র), সম্পাদক- সত্যভাদুরী, (কলকাতা : একাদশ বার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৯৪), পৃ. ৭৯।

মা চ ক্যান পালায় নির্দেশক আফসার আহমদ নৃত্য, গীত এবং অভিনয়-এই ত্রয়ী শিল্পের আশ্রয়ে গড়ে তুলেছেন সমগ্র প্রযোজনাটি। নির্দেশকের মন্তব্য থেকে জানা যায়, এ নির্দেশনাটির মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্যমুখী থিয়েটার প্রবণতার বিরুদ্ধে নিরাভরণ একটি শিল্প মাধ্যম আবিষ্কারের প্রত্যয়ী তিনি।[৩৫] ফলে অভিনেতাদের দৈহিক অবয়বকেই মঞ্চসজ্জার প্রধানতম উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন আফসার আহমদ। এ ছাড়াও বন্দনাদৃশ্য, দোলনার দৃশ্য, রাজদরবারের দৃশ্য প্রভৃতি নির্মাণে কঞ্চি ও বর্ণিল ওড়নার অভিনব ব্যবহার নির্দেশকের নান্দনিক সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটায়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নির্দেশকের নিরীক্ষাধর্মী প্রয়াস মারমাদের অন্তর্গত জীবনের অনেক অনুষঙ্গকেই প্রকাশ করে।

বিচ্ছু-তে নির্দেশক তারিক আনাম খান *কমেডিয়া ডেলার্তে* অভিনয়রীতির অনুসরণে প্রযোজনাটির মঞ্চরূপ নির্মাণ করেছেন।[৩৬] ফলে এর অভিনয়পদ্ধতিতে লক্ষণীয় *কমেডিয়া ডেলার্তে*-র সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ। মঞ্চাসজ্জায় ধ্রুপদী একটি আবহ সৃষ্টির প্রয়াস থেকে বলা যায় নির্দেশক নাটকটিকে ধ্রুপদী একটি প্রযোজনারূপে উপস্থাপনে সচেষ্ট ছিলেন।

সোনাই মাধব প্রযোজনায় নির্দেশক লিয়াকত আলী লাকী তিন দিক দর্শক বেষ্টিত নিরাভরণ চৌকোণ খোলা মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন সোনাই ও মাধবের প্রণয় এবং সোনাইয়ের করুণ পরিণতিকে। মঞ্চরূপ রচনায় নির্দেশক সমন্বয় ঘটিয়েছেন পদাবলী কীর্তন, যাত্রার লোক-আঙ্গিক এবং চরিত্রকেন্দ্রিক অভিনয়রীতির। প্রযোজনাটিতে সংলাপের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে সঙ্গীত।[৩৭] নির্দেশকের মতে এটি একটি নিরীক্ষাধর্মী প্রযোজনা। তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে মেয়েদের ভূমিকায় ছেলেদের অভিনয় এবং সংলাপের পরিবর্তে গানের ব্যবহার ব্যতীত এতে নিরীক্ষাধর্মী কোন প্রয়াসের সন্ধান মেলে না। এছাড়াও লোকনাট্যের উপস্থাপনা হিসেবে ভাবনার চরিত্রটির অত্যাধুনিক রূপসজ্জা প্রশ্নের উদ্রেক করে।

নির্দেশক জাহিদ রিপনের মতে তাঁর *কাজলরেখা* প্রযোজনাটি বাঙলা লোকনাট্যের আধুনিক উপস্থাপনা হিসেবে মঞ্চায়িত। প্রযোজনাটির অভিনয়, নৃত্য, গীত, ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র, মঞ্চসজ্জা, পোশাক, আলো, মঞ্চ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণে নির্দেশকের এ উক্তির যথার্থ প্রমাণ মেলে। নির্দেশক গীতিকার অভিনয়রীতির শর্ত সাপেক্ষে, নিরাভরণ মঞ্চসজ্জায়, ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ন্যূনতম হস্তবাহিত উপকরণে, দেশীয় বাদ্যযন্ত্রের প্রয়োগে, চরিত্র নিরপেক্ষ পোশাক ব্যবহারে আসর কেন্দ্রিক বর্ণনাত্মক অভিনয়রীতির আশ্রয়ে উক্ত প্রযোজনাটি উপস্থাপন করেছেন।[৩৮] অভিনেতাদের শারীরিক অবয়ব এবং তাদের ব্যবহৃত বর্ণিল ওড়নার বহুমাত্রিক ব্যবহারে রচিত বিভিন্ন দৃশ্যকল্প নির্দেশকের সৃজন ক্ষমতার নিপুণ প্রয়োগের প্রকাশ ঘটায়। ফলে সাধারণ একটি ওড়নাকে মৃত সূঁচরাজা হিসেবে বিবেচনা করতে দর্শকদের কল্পনাশক্তিতে কোন বিঘ্ন ঘটায় না।

---

[৩৫] আফসার আহমদ, *নব্য নৃ-গোষ্ঠী নাট্যের আলোকে মারমা জ্যা মা চ ক্যান*, থিয়েটার স্টাডিজ, সম্পাদক-সেলিম আল দীন, (ঢাকা : সংখ্যা ৭, জুন ২০০০, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জা.বি), পৃ. ৩৮।

[৩৬] প্রযোজনা স্মারক (*বিচ্ছু*)।

[৩৭] আহমেদ আবিদ, *ভোরের কাগজ*, (ঢাকা : ২৩ আশ্বিন ১৪০০)।

[৩৮] জাহিদ রিপন, *লোকনাট্যের আধুনিক উপস্থাপনা রীতি : মৈয়মনসিংহ গীতিকা'র কাজলরেখা*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৭), পৃ. ২১।

উপসংহার

এ পর্যন্ত আলোচনায় লক্ষণীয় যে সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনায় শিল্পভাবনার প্রসঙ্গটি বহু বিচিত্র মুখিনতায় এক সুবিশাল সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছেন।

নাট্যনির্দেশনার ক্ষেত্রে অনেক নির্দেশক নিজস্ব ভাষার লেখকদের নাটককে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন বলে মনে হয়। রূপান্তর অনুবাদ নাটকের সংখ্যাও অপ্রতুল নয়। আতাউর রহমান, আলী যাকের, তারিক আনাম প্রমুখ সৃষ্টিশীল নির্দেশকগণ বিশ্বখ্যাত নাটকগুলোর রূপান্তর-অনূদিতরূপ মঞ্চায়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলাদেশের নির্দেশনা-শিল্পকে। যদিও এক্ষেত্রে নিরীক্ষার প্রবণতা খুব একটা অধিক নয়। এর অন্যতম কারণ নাট্যশিল্পকে পেশাদারিত্বের জায়গা থেকে গ্রহণ করার কোনো সুযোগ নির্দেশকগণ পান নি। ফলশ্রুতিতে অল্পসংখ্যক কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত গতানুগতিক প্রবণতার মধ্য থেকেই নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে দেখা যায়। অন্যত্র লোককাহিনী অবলম্বনে ঐতিহ্যবাহী বাংলা নাট্য এবং নব্য নৃ-গোষ্ঠী নাট্যের নির্দেশনার ধারা দুটি বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনায় নতুন একটি মাত্রা প্রণয়নে সম্ভাবনা রাখে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রঙ্গমঞ্চ[৩৯] প্রবন্ধে বহুবৎসর পূর্বে যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তার যথার্থ রূপায়ণ লক্ষ করা যায় নির্দেশনার এ ধারা দুটিতে। উল্লেখ্য এই সম্ভাবনার বিশুদ্ধ ও পরিণত রূপ প্রথম লক্ষণীয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের গবেষণাগারে তৈরি নব্য নৃ-গোষ্ঠী নাট্যের নির্দেশনার মাধ্যমে। বাংলাদেশের নির্দেশকগণ, বিশেষ করে মমতাজউদদীন আহমদ (১৯৩৫), আতাউর রহমান, আবদুল্লাহ আল-মামুন (১৯৪২-২০০৮), আলী যাকের (১৯৪৪), মামুনুর রশীদ (১৯৪৮), এস. এম সোলায়মান (১৯৫৩-২০০১), নাসির উদ্দীন ইউসুফ (১৯৫০), সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮), জামিল আহমদ (১৯৫৫), তারিক আনাম (১৯৫৪), আফসার আহমদ (১৯৫৯), জাহিদ রিপন (১৯৬৯) প্রভৃতিজন নাট্যনির্মাণে শিল্পমান কৌশল সম্পন্ন নাট্যশ্রষ্ঠা হিসেবে নিজস্ব শিল্পকুশলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ফলে বাংলাদেশের নাট্যমঞ্চে নির্দেশকগণের শিল্পভাবনার বহু বিচিত্র রূপ পরিলক্ষিত হয়। মমতাজউদদীন আহমদ, আতাউর রহমান, আবদুল্লাহ আল-মামুন, আলী যাকের, মামুনুর রশীদ, এস. এম. সোলায়মান, তারিক আনাম নাট্যনির্মাণের শিল্পভাবনায় মূলত পাশ্চাত্য শিল্পশাস্ত্র অনুগত। অর্থাৎ পাশ্চাত্য মঞ্চসূত্র ও নির্দেশনাসূত্রের নানামাত্রিক সরলীকরণ এবং সমন্বয়বাদের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করেছেন তাঁদের নাট্যনির্মাণ প্রক্রিয়া। নির্দেশনাকর্মে নাসির উদ্দীন ইউসুফ এবং জামিল আহমদ পরস্পর ভাবনা সংলগ্ন। তাঁদের নির্দেশনাকর্মে লক্ষণীয় বাঙলা নির্দেশনারীতির অন্তর্ধর্মকে আবিষ্কারের নান্দনিক প্রয়াস। তবে নাসির উদ্দীন ইউসুফের নাট্যনির্দেশনা এতটা বিচিত্র পথে, সৃষ্টিশীলপন্থায় বিকশিত হয়েছে যে তা আন্তর্জাতিক নাট্যধারায় একটি অভিনব সংযোজন বলে মনে করা যায়। নাসির উদ্দীন ইউসুফ তাঁর আন্তর্জাতিক নাট্যধারার সঙ্গে সহস্র বৎসরের বাঙলা নাট্যরীতির যে অভিনব সংযোজন ঘটিয়েছেন তা শিল্পের নিখুঁত মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। বিশেষজ্ঞের মতে

---

[৩৯] *বিচিত্র প্রবন্ধ*, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৭ শ্রাবণ ১৩৯২), পৃ. ৪৪৯।

নাসির উদ্দীন ইউসুফের শিল্পভাবনা বিশ্বনাট্যমঞ্চে ঐতিহ্যবাহী নাট্যনির্দেশনার ইঙ্গিতরূপে বিবেচিত হতে পারে।[৪০]

অনেকটা নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা যায়, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতাকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ। বাংলাদেশের নাট্যনির্দেশনায় সৃষ্টিশীল নির্দেশকগণ সমকালীন বাস্তবতার সঙ্গে পাশ্চাত্য নাট্যধারার অনুপ্রেরণায় লোকঐতিহ্যের সহস্র বৎসরের ধারার সঙ্গে মিশে মঞ্চে তোলে এনেছেন নব নব সৃষ্টির সম্ভাবনা।

---

[৪০] সেলিম আল দীন, *বাঙলা নাট্য নির্দেশনা শিল্পরীতি : নাসির উদ্দীন ইউসুফ*, থিয়েটার স্টাডিজ, সম্পাদক- সেলিম আল দীন, (ঢাকা : সংখ্যা ৭, জুন ২০০০, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জা.বি), পৃ. ২২।

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক চিত্রঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেক্ষিত

মোঃ ফারুক হোসাইন•
মোঃ আখতার হোসেন মজুমদার

Abstract: Begging is a great socio-economic problem of both developed and developing countries in the world. It is considered as a symptom of internal disorganization of a society. Bangladesh being a poverty-stricken country is afflicted with numerous social problems and begging is one of them. Beggars generally are not involved in any kind of productive work, rather they depend on others for leading their lives. In this article the author tries to present the findings of a survey on the socio-economic life of the beggers, causes of their begging and livelihood strategies of the roving beggars at the Rajshahi University campus.

১. ভূমিকা

ঐতিহ্যগত বা সনাতন সামাজিক প্রথা হিসেবে সুপ্রাচীনকাল হতে বিশ্বের সকল সমাজেই ভিক্ষাবৃত্তি প্রচলিত রয়েছে। পৃথিবীর এমন কোন দেশ বা সমাজ নেই যেখানে ভিক্ষুকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। উন্নত-অনুন্নত সব দেশে, আধুনিক কিংবা প্রাচীন সব কালেই ভিক্ষাবৃত্তি অসুবিধাগ্রস্থ শ্রেণীর জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ধর্মীয় অনুভূতি, মানবিক আবেদন, পরকালীন প্রশান্তির আশা ভিক্ষাবৃত্তিকে সমাজের স্থায়ী প্রথা হিসেবে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে। ভিক্ষাবৃত্তি একটি সমাজের রোগাক্রান্ত স্বাস্থ্য, সমাজের নড়বড়ে কাঠামো এবং বিশৃংখল অবস্থা নির্দেশ করে। ভিক্ষুকরা কোন সমাজের বিদ্যমান কাঠামো থেকেই বেরিয়ে আসে। এরা সমাজের ভেতরেই অন্যের উপর পরনির্ভরশীল হয়ে কোনমতে বেঁচে থাকা এক ভিন্ন শ্রেণী। সমাজ ও রাষ্ট্র এদের মধ্যে বিদ্যমান কর্মদক্ষতা, প্রতিভা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করতে না পারায় এরা সমাজের অব্যবহৃত মানবসম্পদ হিসেবে উৎপাদনশীল কাজে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতে পারেনা। এজন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে সমাজ, দেশ বা জাতির কলঙ্কস্বরূপ বিবেচনা করা হয়ে থাকে (রহমান, ২০০২:৮৭)।

• ড. মোঃ ফারুক হোসাইন, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।
সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

১.১. *ভিক্ষুক: সমাজের পরনির্ভরশীল একটি অংশ*

সমাজে নানা শ্রেণী যেমন; স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা, বৃদ্ধ ইত্যাদি অসুবিধাগ্রস্থ লোক রয়েছে। ভিক্ষুকরাও অসুবিধাগ্রস্থ শ্রেণীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। এরা অধিকাংশই অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনযাপন করে। পরনির্ভরশীল হিসেবে জীবন যাপন করলেও বিশ্বের অনেক দেশে ভিক্ষুকরা সে সমাজের অনেক কর্মজীবী শ্রমিকের চেয়েও অর্থনৈতিকভাবে বেশী স্বাবলম্বী। সম্প্রতি পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে দেখা যায়- ইরানের রাজধানী তেহরানের ভিক্ষুকেরা মাসে ১ হাজার ৫০০ ডলার আয় করেন। তাদের এই আয় ইরানের নিম্ন বেতনভোগী কর্মকর্তাদের পাঁচ গুণ (দৈনিক প্রথম আলো, ৫ মে, ২০১০:৮)। দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল, জনসংখ্যাবহুল, দারিদ্র্যপীড়িত দেশ হিসেবে বাংলাদেশেও ভিক্ষাবৃত্তি একটি অনিয়ন্ত্রিত স্থায়ী সামাজিক প্রথা হিসেবে সমাজ জীবনের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। কেননা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নানাবিধ কারণে পঙ্গুত্ব, বার্ধক্য, অন্ধত্ব, স্বামী পরিত্যক্তা, বিধবা বিভিন্ন প্রকৃতিতে অসুবিধাগ্রস্থ। আর এ চরম অসুবিধাগ্রস্থ জনসংখ্যার একটা বিশাল অংশ আর্থ-সামাজিক কারণে ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িত।

১.২. *বাংলাদেশের ভিক্ষুক: সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক*

বাংলাদেশে মোট ভিক্ষুক সংখ্যা কত, তার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া কঠিন ও দুষ্কর। এমনকি আদমশুমারী রিপোর্টেও এ বিষয়ে কোন সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সংবাদপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় বাংলাদেশে বর্তমানে ৬ লক্ষাধিক ভিক্ষুক রয়েছে (দৈনিক ইত্তেফাক, ২২ অক্টোবর, ২০০৬)। সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী ঢাকা মহানগরীতে প্রায় ১০ হাজার ভিক্ষুক রয়েছে। যার মধ্যে জন্মগত পেশাদার ভিক্ষুকের সংখ্যা শতকরা ২০ ভাগ, অভাবের তাড়নায় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছে শতকরা ৩০ ভাগ, কর্মবিমুখ ভিক্ষুক শতকরা ৩৫ ভাগ, বেকার, বাড়ি থেকে পালানো এবং অন্যান্য ভিক্ষুকের হার শতকরা ১৫ ভাগ এবং সংঘবদ্ধ পেশাদার ভিক্ষুক দলের সংখ্যা ১০০ এর উপরে (রহমান, ২০০২:৮৮)। এর থেকে বাংলাদেশের সমাজ জীবনে ভিক্ষাবৃত্তির ব্যাপকতা সম্পর্কে সহজেই অনুমান করা যায়। আর ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার নিরাপত্তাহীনতা, গ্রাম্য শোষণ-নির্যাতন ইত্যাদি অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে (শওকতুজ্জামান, ১৯৯৩:২৯৫)। পাশাপাশি বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মভীরু হওয়ায় তারা মনে করে যে, ভিক্ষুককে কোন দিন খালি হাতে ফেরৎ দিতে নেই। তাই তারা কোন ভিক্ষুক দ্বারে উপনীত হওয়া মাত্রই দুমুঠো চাল, কিছু পয়সা বা খাবার দিয়ে বিদায় করে। এমনকি যদি হঠাৎ কোন কারণে দান করতে অপারগ হয়, তবে অত্যন্ত বিনয় সহকারে ভিক্ষুককে মাফ করতে বলে, যা এক অর্থে ভিক্ষাবৃত্তিকে উৎসাহিত করে। এরা রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, অলি-গলি, গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর, অফিস-আদালত এমনকি দেশের ছোট বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

১.৩. *শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভিক্ষুকদের বিচরণ*

বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দরসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভিক্ষুকদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষকরে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে অধিক আয়ের আশায় এরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বেশী বিচরণ করে থাকে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ও এর ব্যতিক্রম নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ও উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। এ প্রতিষ্ঠানে ৯ টি অনুষদে ৪৭ টি বিভাগে ২৬ (প্রায়) হাজার ছাত্র-ছাত্রী, ১,০৬০ শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ২,৩৩৭ কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ডায়েরী, ২০১০:২)। প্রতিষ্ঠার সময়কাল বিবেচনায় তুলনামূলক পুরাতন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ব প্রান্তের প্রবেশ পথ বিনোদপুর গেট থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ক্যাম্পাসের মোড়ে, বিভিন্ন ভবনের পাশে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন-লাইব্রেরী চত্বর, মসজিদের রাস্তা, প্রশাসনিক ভবনের গেট, ফোকলোর চত্বর, বেগম রোকেয়া চত্বর এবং বিভিন্ন হলের আশে পাশে কিছু বিকলাঙ্গ, রুগ্ন ভিক্ষুক উচ্চস্বরে নানাভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক ভিক্ষা করে (ছবি-১)।

ছবি ১: *বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বপ্রান্তের প্রবেশ পথ বিনোদপুর গেট সংলগ্ন রাস্তায় বিচরণকৃত ভিক্ষুক।*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভিক্ষুকদের ইতস্তত; বিচরণ, ক্লাস রুম, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত চেম্বার, অফিস কক্ষ ইত্যাদিতে ঢুকে ভিক্ষা চাওয়া এখন নিত্য দিনের ঘটনা, যা শিক্ষার পরিবেশসহ নষ্ট করছে শিক্ষার্থীদের সময় এবং ক্ষুন্ন করছে প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য ও উজ্জ্বল ভাবমূর্তি।

বিশ্ববিদ্যালয় বিচরণকৃত ভিক্ষুকেরা অনেক সময় বিভিন্ন অপ্রত্যাশিক ঘটনা যেমন: বিভিন্ন ভবনের বাথরুম ব্যবহার বা যত্রতত্র প্রস্রাব-পায়খানাসহ সুযোগ বুঝে মুল্যবান জিনিসপত্র চুরি করা ইত্যাদির জন্ম দেয়। এমনকি অনেক সময় ভিক্ষুকেরা বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মনোস্তাত্ত্বিকভাবে দূর্বল করে টাকা-পয়সা হাতিয়ে নিয়ে থাকে, যা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের জন্য সমস্যা ও উদ্বেগের বিষয়। কিন্তু সারাদেশে ভিক্ষুক ও ভবঘুরেদের পূনর্বাসনের জন্য সাতটি পুনর্বাসন কেন্দ্র (বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫:৩০) থাকলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন বিশেষ নীতিমালা নেই। অতএব

শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখাসহ, ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা তুলে ধরা এবং ক্যাম্পাসে ভিক্ষুকদের দ্বারা সংঘঠিত বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত ঘটনা নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্যেই এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করা হয়েছে।

২. ভিক্ষাবৃত্তি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা

২.১. *ভিক্ষাবৃত্তি প্রত্যয়টির ব্যাখ্যা*

সাধারণত নিজের শক্তি সামর্থ্যের উপর নির্ভর না করে অন্যের দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহের উপায় হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি। আর যারা এ বৃত্তি গ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় ভিক্ষুক। প্রফেসর আ.স.ম. নুরুল ইসলাম ও প্রফেসর মোঃ হাবিবুর রহমান ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে বলেছেন-দ্বারে দ্বারে ঘুরে অন্ন সংস্থানের জন্য ধর্মের আবরণ দিয়ে অন্যের অনুকম্পা ও কৃপা প্রার্থনা করাকেই ভিক্ষাবৃত্তি বলে এবং এ বৃত্তি যারা অবলম্বন করে, তাদেরকে ভিক্ষুক বলা হয় (ইসলাম ও রহমান, ১৯৭৭:১৭)। বাংলা বিশ্বকোষ ৩য় খন্ডে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি স্বীয় অভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করে সে ভিক্ষুক। আর ভিক্ষুকের স্বীয় অভাব অন্যের নিকট প্রকাশ করে সাহায্য লাভ করে জীবিকা নির্বাহের কৌশলই ভিক্ষাবৃত্তি (হাকিম, ১৯৭৩:২৭৯)। ভিক্ষাবৃত্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে C. N. Shankar Rao বলেছেন-Beggary means begging on roads or on door to door standing or entering a dwelling, house or a place of business or otherwise for the maintenance of himself and his dependants (Rao, 2006:577).

Commission for Eradication for Social Evils (পাকিস্তান সামাজিক অনাচার বিলোপ কমিশন) রিপোর্টের বর্ণনানুযায়ী-যারা ভিক্ষা প্রার্থনা করে অথবা স্বীয় আর্থিক, মানসিক ও দৈহিক অক্ষমতা প্রদর্শন করে মানুষের সহানুভূতি বা করুণা লাভের জন্য নিজেদের অসহায়ভাবে উপস্থিত করে, তারাই ভিক্ষুক। এরূপ পরনির্ভর জীবন ধারণের উপায়কে বলা হয় ভিক্ষাবৃত্তি (পাকিস্তান সরকার, ১৯৬৪:৩০)। ভিক্ষুকদেরকেই ভবঘুরে হিসেবে উল্লেখ করে B. B. Sharma বলেছেন-Sections of the population who combine homelessness, intermittent and casual employment, marginal attachment to the conventional institutions of society, and survival through welfare benefits, begging and minor criminal activity have been identified as constituting the problem of vagrancy or beggary (Sharma, 1999:1033). সার্বিকভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন কলা-কৌশল (যেমন; ধর্মীয় গান গেয়ে, অসুস্থ বাচ্চা দেখিয়ে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশান হাতে নিয়ে) প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজের অক্ষমতা যেমন; শরীরের কোন ক্ষত প্রকাশ, প্রতিবন্ধির অভিনয় ইত্যাদি প্রকাশ করে অন্যের করুণা লাভের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের উপায়ই হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি।

২.২. *ভিক্ষাবৃত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত*

ভিক্ষাবৃত্তির প্রচলন ঠিক কখন কিভাবে হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা না গেলেও, মানব ইতিহাসের শুরু থেকে সকল সমাজে এটি দূর্বল অসহায় শ্রেণীর টিকে থাকার কৌশল

হিসেবে লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে প্রাক-শিল্প সমাজে যে, মানবিকতাবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন ও দানশীলতাভিত্তিক সমাজসেবা প্রচলিত ছিল তা থেকেই ভিক্ষাবৃত্তির জন্ম বলে অনুমান করা হয়। কেননা বিশ্বে প্রচলিত সকল ধর্মেই দান করাকে পূণ্যের কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বে প্রচলিত সবচেয়ে প্রাচীন বা সনাতন হিন্দু ধর্মে ত্যাগ, বিনয়, উৎসর্গ, মানুষের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন, সদাচার, দান প্রভৃতি মানবিক গুনাবলীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যাদাতা স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়-নারায়ণ তথা ভগবান দরিদ্রদের মাঝে অবস্থান করেন। তাই দরিদ্রদের সেবার মাধ্যমেই নারায়ণের সেবা করা সম্ভব (তালুকদার, ২০০৫:২৩৫)। বৌদ্ধ ধর্মেও দানশীলতা তথা অন্যের সেবা করার কথা বলা হয়েছে। অহিংসা পরম ধর্ম এটি বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্র। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন- সকল জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করার মাধ্যমে অহিংসা পরম ধর্ম নীতির পরিশীলন করা সম্ভব (ঢালী, ১৩৯৪:৩৬)। মানবপ্রেম, মানবসেবা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও অহিংসার প্রতি খৃষ্ট ধর্মে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। 'খোদার রাজ্যে সবাই সমান' এ হচ্ছে খৃষ্টানধর্মের মূলমন্ত্র। অনুরূপভাবে ইসলাম ধর্মে দান-সদকাসহ মানব সেবাকে সবচেয়ে মহাপূণ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কোরআন শরীফে বলা হয়েছে-তোমরা আল্লাহর প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজের ধন-সম্পদ, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার জন্য ব্যয় করবে (সূরাহ আল বাক্বারাহ্, আয়াত-১৭৭)। এভাবে দেখা যায় যে, ধর্মীয় অনুভুতিতে দান-সদকা করা অত্যন্ত পূণ্য বিবেচিত হওয়ায় ভিক্ষাবৃত্তি সকল সমাজেই সুদূর অতীতকাল থেকে প্রচলিত রয়েছে। তবে ইংল্যান্ডে ১৩৪৮ সালে 'প্লেগ' বা 'ব্লাক ডেথ' এর পর শ্রমিকের স্বল্পতা সৃষ্টি হওয়ায় রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ভিক্ষাবৃত্তির উপর প্রথম নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। পরবর্তীতে অষ্টম হেনরী ১৫৩১ সালে একটি গঠনমূলক পদক্ষেপ হিসাবে ভিক্ষুকদের জন্য বিশেষ বিধান সম্বলিত একটি বিশেষ আইন প্রবর্তন করেন। এ আইনে বলা হয়েছে-The beggars were to be registered and licensed to beg in an assigned area (Friedlander, 1964:15). তারই ধারাবাহিকতায় অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতে ভিক্ষাবৃত্তি ও ভবঘুরে নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে ১৮৭৪, ১৯১১, ১৯১৬, ১৯১৭, ১৯২২, ১৯৩৯ এবং ১৯৪৩ সালে বিভিন্ন আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা বর্তমান বাংলাদেশেও কার্যকর রয়েছে (আহমদ, ১৯৯৭:১৮)। এভাবে ভারতীয় উপমহাদেশসহ বাংলাদেশী সমাজেও এ আধুনিক যুগে ভিক্ষাবৃত্তি অনিবার্য অনুষঙ্গরুপে প্রচলিত রয়েছে।

২.৩. *ভিক্ষুকদের শ্রেণীবিন্যাস*

ভিক্ষাবৃত্তি যেকোন সমাজের জন্য একটি কলঙ্কজনক প্রথা হিসেবে বিবেচিত। এটা নিয়ন্ত্রণে নানাবিধ আইনি পদক্ষেপ সত্ত্বেও কোন সমাজেই ভিক্ষাবৃত্তি নিবারণ করা সম্ভব হয়নি, বরং ক্রমান্বয়ে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থায় মারাত্মক সমস্যার তৈরী করেছে। বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তির ধরন ও প্রকৃতি বিচিত্র। কেউ কাজের অভাবে ভিক্ষা করে, কেউ ভিক্ষা কাজ দুটোই করে। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সৈয়দ শওকতুজ্জামান কমক্ষম ভিক্ষুক, বিকলাঙ্গ

ভিক্ষুক এবং অনাথ ও বৃদ্ধ ভিক্ষুক ইত্যাদি ধরনের ভিক্ষুকের কথা উল্লেখ করেছেন (শওকতুজ্জামান, ১৯৯০:১৩২)। G. R. Madan ভিক্ষুকদের শ্রেণী হিসেবে Able-bodied adult beggars, Able-bodied child beggars, Hereditary beggars, Sick or disabled beggars, Physically disabled, Mentally retarded, Old and incapable people, Religious mendicant etc. ইত্যাদিকে উল্লেখ করেছেন (Madan, 2006: 577). Encyclopaedia of Social Work in India তে- কিশোর, সক্ষম, রোগাগ্রস্থ, বৃদ্ধ ও অক্ষম এবং শারীরিকভাবে পঙ্গু ও মানসিকভাবে বিকারগ্রস্থকে ভিক্ষুকের শ্রেণী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে (Government of India, 1987:35). পাকিস্তানের সামাজিক অনাচার বিলোপ কমিশনের রিপোর্টের উদ্বৃতি দিয়ে ফয়সল আহমদ বাংলাদেশে প্রচলিত নিম্নোক্ত চার ধরনের যথা; ক. যে সব লোক কাজ করার জন্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত নয় এবং যাদের সাহায্য করার মতো কেউ নেই। এই ধরনের ভিক্ষুকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বয়স্ক ও অক্ষম যাদের পরিবার ও পরিবারের বাইরে সমর্থনমূলক কোন ব্যবস্থা নেই, খ. যে সব সক্ষম লোক কাজ খুঁজে পায় না অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই ধরনের ভিক্ষুকেরা সাধারণত মৌসুমী ভিক্ষুক শ্রেণীর আওতাভুক্ত, গ. কিছু লোক আছে যারা বংশগতভাবে ভিক্ষুক এরা এমন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে ও বড় হয়েছে যেখানে বংশ পরম্পর ভিক্ষাবৃত্তিকে অবলম্বন করে জীবিকা অর্জন করছে এবং অন্য কোন পেশা গ্রহণে ইচ্ছুক নয়। এ ধরনের ভিক্ষুকদের ধর্মীয় ভিক্ষুকের আওতাভুক্ত করা যায়, ঘ. অনেক লোক আছে যারা কাজ করার চাইতে ভিক্ষাবৃত্তিকে সহজতর এবং অপেক্ষাকৃত লাভজনক বলে মনে করে। এই ধরনের ভিক্ষুকদের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছে ধর্মীয় ভিক্ষুক ইত্যাদি ভিক্ষাবৃত্তির কথা বলেছেন (আহমদ, ২০০০:৬৩)। তবে সার্বিকভাবে বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ভিক্ষুকরা সাধারণত দৈহিক ও মানসিক পঙ্গু, উত্তরাধিকার বা জন্মসূত্রের, পরিত্যক্ত ও অবাঞ্চিত শিশু-কিশোর, নির্ভরশীল শিশুসহ বিধবা, অলস ও শ্রমবিমুখ, ধর্মের আবরণে ভিক্ষুক ও মৌসুমী বেকারত্বের শিকার ইত্যাদি প্রকৃতি ও শ্রেণীর।

২.৪. ভিক্ষাবৃত্তির উৎস বা কারণ

বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে ভিক্ষাবৃত্তির নানারকম প্রকৃতি বা ধরন পরিলক্ষিত হলেও, একথা অনেকাংশে সত্য যে মানুষ অনেকটা পরিস্থিতির শিকার বা বাধ্য হয়ে এ অপছন্দনীয় পেশায় নিযুক্ত হয়। কেউ অভাবে, কেউ স্বভাবে, অনেক মহিলা আবার পুরুষের রোজগার নেই তাই ভিক্ষা করে, কেউ ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে বাসা-বাড়িতে কাজ করতে না পেরে ইত্যাদি কারণে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। ইন্ডিয়ান সমাজে ভিক্ষাবৃত্তির কারণ হিসেবে C.N. Shankar Rao (2006:579)- Poverty, Lack of employment, Beggary as a profitable business, Family disorganization, Lack of parental control, Community disorganization and break-up of joint family system, Favourable social customs, Sickness or diseases, Physical and mental deficiency, Old age, Religious mendicancy and Indiscriminate alms giving

ইত্যাদিকে ব্যাখ্যা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব ইকনোমিক রিসার্চ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার উদ্বৃতি দিয়ে সৈয়দ শওকতুজ্জামান (১৯৯০:১৩৪) যেসব কারণে বাংলাদেশের ভিক্ষাবৃত্তি ক্রমপ্রসারমান বলে উল্লেখ করেছেন; সেগুলো হলো-দৈহিক পঙ্গুত্ব, দীর্ঘমেয়াদী রোগ-ব্যধি, বেকারত্ব, পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তির রোগ ও মৃত্যু, বংশানুক্রমিক অভ্যাস, পারিবারিক ভাঙ্গন ও বিবাহ বিচ্ছেদ, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদীভাঙ্গন, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ইত্যাদি। তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম কারণ থাকলেও বাংলাদেশের ভিক্ষাবৃত্তির জন্য দরিদ্রতা, নদীভাঙ্গন, কর্মসংস্থানের অভাব, দৈহিক অক্ষমতা, উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ইত্যাদি কারণগুলো বিশেষভাবে দায়ী।

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের ভিক্ষুকদের বিশেষভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক জীবন চিত্র তুলে ধরাই এ গবেষণার মুল উদ্দেশ্য। আরও যেসব বিশেষ উদ্দেশ্যে গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে তা হলো;

১. ভিক্ষুকদের পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করা;
২. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা;
৩. ভিক্ষুকদের সমস্যা ও সমাধানে করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ তুলে ধরা।

৪. গবেষণা এলাকা ও পদ্ধতি

বর্তমান নিবন্ধটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় ধরনের উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচনা করা হয়েছে। সামাজিক জরিপ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সাক্ষাৎকার অনুসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের মধ্য থেকে উদ্দেশ্যমূলক নমুমায়নের ভিত্তিতে ১০১ জন ভিক্ষুক নির্বাচিত করে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেহেতু উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তাই তথ্য সংগ্রহকালে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর ২০০৯ থেকে জানুয়ারী ২০১০ মাস পর্যন্ত যে সব ভিক্ষুককে ক্যাম্পাসে পাওয়া গেছে, তাদেরকে নমুনাভূক্ত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তি উপলক্ষে অনেক শিক্ষার্থীর আগমন ঘটে বিধায় ভিক্ষুকদের উপস্থিতিও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রাথমিক উৎস ছাড়াও সরকারি প্রকাশনা, গবেষণা পত্র, পুস্তক, জার্নাল, পত্রিকা ইত্যাদি বিষয় থেকেও মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহিত তথ্যাবলি সম্পাদনা ও পরিমার্জনের পর সারণিবদ্ধ করে বর্ণনামূলক সাধারণ পারিসংখ্যানিক কৌশলের সাহায্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫. প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন

বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কোন একটি কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয়নি। শিল্পায়নের প্রভাব,

গ্রামীণ কর্মসংস্থানের তীব্র সংকট, ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি কারণে এ সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আর এটি এখন নির্দিষ্ট কোন এলাকায় সীমাবদ্ধ নেই। গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর সবখানেই ভিক্ষুকদের বিচরণ লক্ষ্যনীয়। তবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর আশে পাশে ভিক্ষুকদের আনাগোনা সবচেয়ে বেশী থাকে বলে প্রতীয়মান হয়, যা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের আর্থ-সামাজিক জীবন চিত্রায়নের জন্য প্রাপ্ত তথ্য বর্তমান গবেষণায় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৫.১. ভিক্ষুকদের লিঙ্গ ও বয়স

যে কোন সমাজের অসহায় ও দু:স্থ শ্রেণীর একটি বিশেষ অংশ হলো ভিক্ষুক। কেননা আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির শিকার হয়ে অনেকটা নিরূপায় হয়ে মানুষ বিশেষ করে কাজে অক্ষম মানুষেরা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। এজন্যে ভিক্ষুকদের মধ্যে নারী ও বয়স্কশ্রেণীর মানুষই বেশী লক্ষ্য করা যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুদের মধ্যে সে বাস্তবতারই প্রতিফলন দেখা যায় (সারণি-১)। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় মহিলা ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশী, এটা যথাক্রমে ৪৯ জন এবং ৫২ জন এবং বেশিরভাগ (৫২.৫%) ভিক্ষুকেরই বয়স ৬৫ বছরের উপরে। লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাসে এই হার মহিলা ভিক্ষুকের (৫১.৯%) তুলনায় পুরুষ ভিক্ষুকের সংখ্যা বেশী (৫৩.১%)। অন্যদিকে ২০-৩৫ বছর বয়সের মধ্যে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার প্রবণতা বেশী, এর শতকরা হার যথাক্রমে ৬.১ ভাগ ও ১১.৫ ভাগ। যা আমাদের সমাজে নারীদের যথাযথ কর্মসংস্থানের অভাব ও তাদের অসহায়ত্ব এবং দু:স্থতাকেই নির্দেশ করে।

সারণি ১: *ভিক্ষুকদের লিঙ্গ ও বয়স ভিত্তিক বিন্যাস*

বয়স (বছর)	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
২০-৩৫	০৩ (৬.১)	০৬ (১১.৫)	০৯ (৮.৯)
৩৫-৫০	০৯ (১৮.৪)	০৭ (১৩.৫)	১৬ (১৫.৮)
৫০-৬৫	১১ (২২.৪)	১২ (২৩.১)	২৩ (২২.৭)
৬৫-৮০	২১ (৪২.৯)	২৩ (৪৪.২)	৪৪ (৪৩.৬)
৮০-৯৫	০৫ (১০.২)	০৪ (৭.৭)	০৯ (৮.৯)
মোট	৪৯ (১০০)	৫২ (১০০)	১০১ (১০০)
গড় বয়স	৬২.৪ বছর	৬১.০ বছর	৬১.৭ বছর

৫.২. ভিক্ষুকদের বৈবাহিক অবস্থা

পরিবার সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। পারিবারিক বন্ধনই মানুষকে তার বিপদে-আপদে নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভুমিকা পালন করে। এজন্য পরিবারবদ্ধ জীবন

যাপন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে সমাজে প্রচলিত আছে। ভিক্ষুকদের বৈবাহিক অবস্থা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে (সারণি ২) দেখা যায় যে, অধিকাংশ ভিক্ষুকই বিধবা/বিপত্নিক (শতকরা ৪৬.৫ ভাগ) এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক ভিক্ষুক পরিত্যক্ত (শতকরা ১৩.৫ ভাগ)। লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাসে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক পুরুষ ভিক্ষুক বিবাহিত (৫৩.১%) এবং বাকি পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৪০.৮ ভাগ বিধবা/বিপত্নীক, ৪.১ ভাগ বিচ্ছেদ এবং ২ ভাগ পরিত্যক্ত। অন্যদিকে সর্বাধিক সংখ্যক মহিলা বিধবা (৫১.৯%), শতকরা ২১.২ ভাগ বিবাহিতা, ১৫.৪ ভাগ বিচ্ছেদ এবং ১১.৫ ভাগ স্বামী পরিত্যক্তা। গবেষণার ফলাফলে বলা যায যে, পুরুষ ও মহিলা ভিক্ষুকের মধ্যে বিবাহের ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী অবস্থা লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে ক্যাম্পাসে বর্তমানে বিবাহিত মহিলাদের তুলনায় বিবাহিত পুরুষের সংখ্যাই বেশী। অন্যদিকে মহিলা ভিক্ষুকদের মধ্যে পুরুষের তুলনায় বিধবা/বিপত্নীক, বিচ্ছেদ ও পরিত্যক্তের হার বেশী। অতএব এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, পুরুষ ভিক্ষুকের তুলনায় মহিলা ভিক্ষুকরাই বেশী বিপদাপন্ন অবস্থায় আছে।

সারণি ২: *ভিক্ষুকদের বৈবাহিক অবস্থার বিবরণ*

বৈবাহিক অবস্থা	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*সংখ্যা (শতকরা)*	*সংখ্যা (শতকরা)*
বিবাহিত	২৬ (৫৩.১)	১১ (২১.২)	৩৭ (৩৬.৬)
বিধরা/বিপত্নীক	২০ (৪০.৮)	২৭ (৫১.৯)	৪৭ (৪৬.৫)
বিচ্ছেদ	০২ (৪.১)	০৮ (১৫.৪)	১০ (১৯.২)
পরিত্যক্ত	০১ (২.০)	০৬ (১১.৫)	০৭ (১৩.৫)
মোট	৪৯ (১০০)	৫২ (১০০)	১০১ (১০০)

৫.৩. ভিক্ষুকদের শিক্ষাগত অবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আলো বিতরণের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। কিন্তু ক্যাম্পাসে অবস্থানরত সকলেই শিক্ষা লাভের জন্য আসে না কিংবা বিচরণকৃত সকলকেই শিক্ষা দেয়া হয়না। সারণি ৩ এ তাই ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের শিক্ষাগত অবস্থার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, সর্বাধিক সংখ্যক ভিক্ষুক নিরক্ষর (শতকরা ৫২.৫ ভাগ) অর্থাৎ তারা নাম সই পর্যন্ত করতে জানেনা এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক (২.৯ ভাগ) ভিক্ষুক এ বিষয়ে কথা বলতে অনাগ্রহ দেখিয়েছে। উত্তরদাতাদের লিঙ্গ ভিত্তিক বিন্যাসে দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষ ভিক্ষুকদের শতকরা ৪৬.৯ ভাগ নিরক্ষর, ৪০.৮ ভাগ শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারে। অন্যদিকে মহিলা ভিক্ষুকদের অধিকাংশই, যা শতকরা ৫৭.৭ ভাগ নিরক্ষর এবং শতকরা ২৫ ভাগ শুধুমাত্র নাম স্বাক্ষর করতে পারে। গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে এটা লক্ষ্যণীয় যে, নিরক্ষরতার ক্ষেত্রে মহিলাদের (শতকরা ৫৭.৭ ভাগ) অবস্থান পুরুষের (শতকরা ৪৬.৯ ভাগ) তুলনায় অনেক বেশী খারাপ। তবে কোরআন পড়ার ক্ষেত্রে মহিলারা (১৩.৫ ভাগ) পুরুষের (১০.২ ভাগ) তুলনায় ভাল অবস্থানে আছে। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাপ্ত উপাত্তে এটা স্পষ্ট যে, নিরক্ষরতাই তাদেরকে সহজে ভিক্ষাবৃত্তিতে সম্পৃক্ত করছে।

সারণি ৩: *ভিক্ষুকদের লিঙ্গভিত্তিক শিক্ষাগত অবস্থার বিবরণ*

শিক্ষাগত অবস্থা	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
নিরক্ষর	২৩ (৪৬.৯)	৩০ (৫৭.৭)	৫৩ (৫২.৫)
নাম সই করতে পারে	২০ (৪০.৮)	১৩ (২৫.০)	৩৩ (৩২.৭)
কোরআন পড়তে পারে	০৫ (১০.২)	০৭ (১৩.৫)	১২ (১১.৯)
মন্তব্য নেই	০১ (২.০)	০২ (৩.৮)	০৩ (২.৯)
মোট	৪৯ (১০০)	৫২ (১০০)	১০১ (১০০)

৫.৪. ভিক্ষুকদের বাসস্থানের বিবরণ

ভিক্ষুকরা সাধারণত; অন্যের আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পরগাছা হিসেবে সমাজে কোন রকম বেঁচে থাকে। এজন্য ভিক্ষুকদের ঠিক সমাজের অন্যান্য মানুষের মত সাজানো-গোছানো ঘর-বাড়ি নেই বলেই অনুমান করা হয়। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে সে বাস্তবতাই প্রতিফলিত হয়েছে। সারণি ৪ এ বর্ণিত তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, শুধুমাত্র শতকরা ৪ ভাগ ভিক্ষুক ছাড়া বাকি ৯৬ ভাগেরই নিজের বাড়ি নেই। সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, এদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক ভিক্ষুক (৪৪.৬ ভাগ) বস্তিতে বাস করে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক ভিক্ষুক (২.৯ ভাগ) অন্যান্য অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট জায়গায় বাস করে না বরং যখন যেখানে সুযোগ পায়, সেখানেই রাত কাটায়। লিঙ্গভিত্তিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ পুরুষ ভিক্ষুক রেল ও বাসস্টেশনে (৪৫ ভাগ) বাস করে। আবার মহিলা ভিক্ষুকদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৪৮.১ ভাগ) বস্তিতে বসবাস করে। বাকি মহিলা ভিক্ষুকদের শতকরা ৪০.৪ ভাগ রেল ও বাস স্টেশনে। নিজ বাড়িতে বাস না করাকে খুব খারাপ অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করলে, গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলে বলা যায়, পুরুষ ভিক্ষুকদের তুলনায় মহিলা ভিক্ষুকরা খুবই খারাপ, অসহায় ও দু:স্থ অবস্থায় আছে।

সারণি ৪: *ভিক্ষুকদের বাসস্থান সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস*

বাসস্থানের বিবরণ	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
নিজ বাড়ি	০৩ (৬.১)	০১ (১.৯)	০৪ (৪.০)
অন্যের বাড়ি	০২ (৪.১)	০৪ (৭.৭)	০৬ (৫.৯)
বস্তিতে	২০ (৪০.৮)	২৫ (৪৮.১)	৪৫ (৪৪.৬)
রেল ও বাস স্টেশন	২২ (৪৫.০)	২১ (৪০.৪)	৪৩ (৪২.৬)
অন্যান্য	০২ (৪.১)	০১ (১.৯)	০৩ (২.৯)
মোট	৪৯ (১০০)	৫২ (১০০)	১০১ (১০০)

৫.৫. ভিক্ষুকদের স্বাস্থ্যগত বিষয়

স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক অধিকারের একটি। সুস্বাস্থ্যের উপরই একটি দেশের জনসম্পদের ভিত্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। কিন্তু জীবন চক্রে মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হলে নানা রকম স্বাস্থ্যগত জটিলতা সৃষ্টি হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের অধিকাংশই যেহেতু বয়স্ক প্রকৃতির (সারণি ১), সেহেতু তারাও একাধিক স্বাস্থ্যগত জটিলতায় আক্রান্ত। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যে (সারণি ৫) দেখা যায়, অধিকাংশ ভিক্ষুকই গ্যাস্ট্রিকে আক্রান্ত (শতকরা ৪৫.৫ ভাগ) বলে উল্লেখ করেছেন। তবে গ্যাস্ট্রিক ছাড়াও যেসব স্বাস্থ্যগত সমস্যায় তারা আক্রান্ত, তাহলো হাঁপানি (শতকরা ২৯.৭ ভাগ), প্রেসার (শতকরা ২০.৮ ভাগ), চোখে কম দেখা (শতকরা ২৩.৮ ভাগ), সারা শরীরে ব্যাথা (শতকরা ২৮.৭ ভাগ) এবং অন্যান্য সমস্যা (শতকরা ৯.৯ ভাগ) ইত্যাদি। এখানে অন্যান্য বলতে মাথা ঘোরানো, হাত-পা অবশ হওয়া ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। লিঙ্গভিত্তিক বিন্যাসেও ভিক্ষুকদের মধ্যে এ সমস্ত স্বাস্থ্যগত সমস্যাই সাধারণভাবে লক্ষ্যণীয়।

সারণি ৫: *ভিক্ষুকদের স্বাস্থ্যগত বিষয়ের বিবরণ*

স্বাস্থ্যগত অবস্থা	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
হাঁপানি	১৫ (৩০.৬)	১৫ (২৮.৮)	৩০ (২৯.৭)
গ্যাস্ট্রিক	২১ (৪২.৯)	২৫ (৪৮.১)	৪৬ (৪৫.৫)
প্রেসার	১০ (২০.৪)	১১ (২১.২)	২১ (২০.৮)
চোখে কম দেখা	১৪ (২৮.৬)	১০ (১৯.২)	২৪ (২৩.৮)
সারা শরীরে ব্যাথা	১২ (২৪.৫)	১৭(৩২.৭)	২৯(২৮.৭)
অন্যান্য	০৪ (৮.২)	০৬ (১১.৫)	১০ (৯.৯)
মোট	৭৬* (এন=৪৯)	৮৪* (এন=৫২)	১৬০* (এন=১০১)

**একাধিক উত্তর গৃহীত হয়েছে।*

তবে এ সকল স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে বেশিরভাগ ভিক্ষুকই (শতকরা ৩৫.৬ ভাগ) কবিরাজী চিকিৎসা গ্রহণ করে বলে উল্লেখ করেছেন (সারণি ৬)। মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা আরও যেসব উৎস থেকে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে তাহলো; হোমিওপ্যাথিক (শতকরা ২৩.৮ ভাগ), ঝাঁড়ফুক (শতকরা ১৯.৮ ভাগ), এ্যালোপ্যাথিক (শতকরা ১৬.৮ ভাগ) এবং অন্যান্য (শতকরা ৪ ভাগ)। এখানে অন্যান্য উৎস বলতে সরকারী মেডিকেল, ক্লিনিক ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

সারণি ৬: *ভিক্ষুকদের চিকিৎসা গ্রহণের উৎস সম্পর্কিত বিবরণ*

চিকিৎসার উৎস	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
কবিরাজী	১৫ (৩০.৬)	২১ (৪০.৪)	৩৬ (৩৫.৬)
হোমিওপ্যাথিক	১৪ (২৮.৬)	১০ (১৯.২)	২৪ (২৩.৮)
এ্যালোপ্যাথিক	১১ (২২.৪)	০৬ (১১.৫)	১৭ (১৬.৮)
ঝাড়ফুঁক	০৮ (১৬.৩)	১২ (২৩.১)	২০ (১৯.৮)
অন্যান্য	০১ (২.০)	০৩ (৫.৮)	০৪ (৪.০)
মোট	৪৯ (১০০)	৫২ (১০০)	১০১ (১০০)

৫.৬. ভিক্ষুকদের দৈনিক আয়ের বিবরণ

ভিক্ষুকরা সাধারণত; জাতীয় উৎপাদনে কোন অবদান না রেখেই জাতীয় আয়ের একটা অংশ ভোগ করে থাকে। নানা অঙ্গভঙ্গি, কৌশল প্রয়োগ করে ভিক্ষুকরা সাধারণ মানুষের সহানুভূতি অর্জন করে এবং অন্যের আয়ের একটা অংশ তারা গ্রহণ করে থাকে। ভিক্ষুকদের আয়ের পরিমাণ নির্ধারিত না থাকলেও, বিনা বিনিয়োগে তারা দৈনিক যে পরিমাণ আয় করে তা সারণি ৭ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

সারণি ৭: *ভিক্ষুকদের দৈনিক আয় সম্পর্কিত বিবরণ*

দৈনিক আয় (টাকায়)	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
১০-৩০	০৩ (৬.১)	০২ (৩.৮)	০৫ (৫.০)
৩০-৫০	০৫ (১০.২)	০৭ (১৩.৫)	১২ (১১.৯)
৫০-৭০	১২ (২৪.৫)	১৫ (২৮.৮)	২৭ (২৬.৭)
৭০-৯০	২৭ (৫৫.১)	২৪ (৪৬.২)	৫১ (৫০.৫)
৯০-১১০	০২ (৪.১)	০৪ (৭.৭)	০৬ (৫.৯)
মোট	৪৯ (১০০)	৫২ (১০০)	১০১ (১০০)
গড় আয়	৬৮.২ টাকা	৬৮.১ টাকা	৬৮.২ টাকা

প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের দৈনিক গড় আয় ৬৮.২ টাকা। সর্বাধিক সংখ্যক ভিক্ষুক (শতকরা ৫৬.১ ভাগ) প্রতিদিন ৭০ থেকে ১১০/= টাকা পর্যন্ত আয় করে এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক ভিক্ষুকের (শতকরা ৫ ভাগ) আয় প্রতিদিন ১০-৩০ টাকার মধ্যে। তবে লিঙ্গভেদে দৈনিক আয়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। কেননা নারী (গড়ে ৬৮.১ টাকা) ও পুরুষ (গড়ে ৬৮.২ টাকা) উভয় শ্রেণীর ভিক্ষুকই প্রতিদিন গড়ে একই পরিমাণ টাকা ভিক্ষা করে উপার্জন করে থাকে। তবে দৈনিক গড় আয়ে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য না থাকলেও লিঙ্গভেদে লক্ষ্য করা

যায় যে, মহিলা ভিক্ষুকের তুলনায় পুরুষ ভিক্ষুক বেশি আয় করে। অর্থাৎ বেশিরভাগ পুরুষ ভিক্ষুক (শতকরা ৫৯.২ ভাগ) দৈনিক ৭০ টাকা থেকে ১১০ টাকা। আর এই হার মহিলা ভিক্ষুকের ক্ষেত্রে শতকরা ৫৩.৯ ভাগ। এ সকল তথ্য পর্যালোচনা করে গবেষণার ফলাফলে বলা যায় যে, ভিক্ষুকরা দৈনিক যে পরিমাণ টাকা আয় করে, তা দিয়ে তারা মানবেতর জীবন যাপন করে থাকে।

৫.৭. ভিক্ষাবৃত্তির কারণ

ভিক্ষাবৃত্তির পেছনে নানা কারণ ক্রিয়াশীল থাকে। এজন্য স্বয়ং ভিক্ষুকরাও এ পেশাকে খারাপ জানা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে নিয়োজিত হতে বাধ্য হয়। বিশেষ করে বাংলাদেশে দীর্ঘকাল বিদেশী শাসন ও শোষণের প্রতিক্রিয়া, নদীভাঙ্গনসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থান না থাকা জনিত কারণে দরিদ্রতা ইত্যাদি কারণ বাংলাদেশের ভিক্ষাবৃত্তিকে ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত করছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের ক্ষেত্রেও সে তথ্যের প্রতিফলন দেখা যায়।

সারণি ৮: *ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হওয়ার কারণ সম্পর্কিত বিবরণ*

কারণ	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
শারীরিক অক্ষমতা	০৫ (১০.২)	০৬ (১১.৫)	১১ (১০.৯)
নদীভাঙ্গনের শিকার	১২ (২৪.৫)	১৫ (২৮.৮)	২৭ (২৬.৭)
উপার্জনক্ষম কেউ না থাকা	০৭ (১৪.৩)	১৩ (২৫.০)	২০ (১৯.৮)
দরিদ্রতা	২৮ (৫৭.১)	৩০ (৫৭.৭)	৫৮ (৫৭.৪)
দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ববরণ করা	০৪ (৮.২)	০১ (১.৯)	০৫ (৪.৯)
অন্যান্য	০২ (৪.১)	০৪ (৭.৭)	০৬ (৫.৯)
মোট	৫৮* (এন=৪৯)	৬৯* (এন= ৫২)	১২৭* (এন=১০১)

**একাধিক উত্তর গৃহীত হয়েছে।*

সারণি ৮ এ বর্ণিত তথ্যে দেখা যায়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ভিক্ষুকরা কোন একটি কারণে নয় বরং নানাবিধ কারণে বাধ্য হয়ে এ কাজে নিয়োজিত বলে উল্লেখ করেছে। এ সকল কারণের মধ্যে অধিকাংশই (শতকরা ৫৭.৪ ভাগ) দরিদ্রতার জন্যে ভিক্ষা করে বলে জানিয়েছে। বাকী উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ২৬.৭ ভাগ নদীভাঙ্গনের শিকার, ১৯.৮ ভাগ উপার্জনক্ষম কেউ না থাকা, ১০.৯ ভাগ শারীরিক অক্ষমতা, ৪.৯ ভাগ দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্বের শিকার এবং ৫.৯ ভাগ অন্যান্য কারণের কথা উল্লেখ করেছে। অন্যান্য কারণ বলতে বিধবা, বিপত্নীক ও স্বামী পরিত্যক্তা ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে বলা যায় যে, চরম দরিদ্রতাই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের এ পেশায় আসতে বাধ্য করেছে।

৫.৮. বেশী ভিক্ষা পাওয়ার জায়গা

সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ, মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ইত্যাদি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশে বেশি ভিক্ষুকের সমাগম থেকে অনুমান করা হয় যে, এখানেই বেশী পরিমাণে ভিক্ষা পাওয়া যায়। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক তাদের পরীক্ষার ফলাফলকে উপজীব্য করে ভিক্ষুকরা ভিক্ষা চেয়ে থাকে। ফলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে যত্রতত্র ভিক্ষুকের বিচরণ লক্ষ্য করা যায়। গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে (সারণি ৯), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকরা লাইব্রেরী সংশ্লিষ্ট এলাকায় বেশী ভিক্ষা পায় বলে উল্লেখ করেছে, যা শতকরা ৩৪.৭ ভাগ।

সারণি ৯: *ক্যাম্পাসে বেশি ভিক্ষা পাওয়ার স্থান বিষয়ক তথ্যের বিন্যাস*

স্থান/এলাকা	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
লাইব্রেরী এলাকা	১৫ (৩০.৬)	২০ (৩৮.৫)	৩৫ (৩৪.৭)
ফোকলোর চত্বর	১৩ (২৬.৫)	১৫ (২৮.৮)	২৮ (২৭.৭)
মেয়েদের হল এলাকা	১১ (২২.৪)	১০ (১৯.২)	২১ (২০.৬)
স্টেশন বাজার	০৫ (১০.২)	০৪ (৭.৭)	০৯ (৮.৯)
বাসস্ট্যান্ড	০৩ (৬.১)	০২ (৩.৮)	০৫ (৫.০)
অন্যান্য	০২ (৪.১)	০১ (১.৯)	০৩ (৩.০)
মোট	৪৯ (১০০)	৫২ (১০০)	১০১ (১০০)

বাকী উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা বেশী ভিক্ষা পাওয়ার এলাকা হিসেবে ফোকলোর চত্বর (শতকরা ২৭.৭ ভাগ), মেয়েদের হল এলাকা (শতকরা ২০.৬ ভাগ), স্টেশন বাজার এলাকা (শতকরা ৮.৯ ভাগ), বিশ্ববিদ্যালয় বাসস্ট্যান্ড (শতকরা ৫.০ ভাগ) এবং অন্যান্য ইত্যাদি এলাকাকে চিহ্নিত করেছে। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ক্যাম্পাসে বেশী ভিক্ষা পাওয়ার স্থান/এলাকা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলা ভিক্ষুকের মতামতের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। অতএব বলা যায় যে, ক্যাম্পাসে অধিক ছাত্র-ছাত্রী সমাগম হওয়ার জায়গা লাইব্রেরী এলাকায় বেশি ভিক্ষা পাওয়া যায়। তবে এটি ভিক্ষুকদের জন্য ইতিবাচক বা আশাব্যঞ্জক হলেও শিক্ষার্থীদের জন্য অসুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয়।

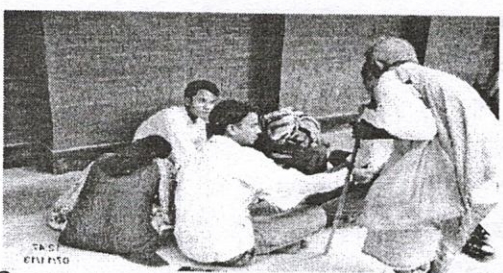

ছবি-২: *লাইব্রেরীর বারান্দায় পড়াশোনায় মনোযোগী শিক্ষার্থীদের কাছে ভিক্ষারত ভিক্ষুক।*

৫.৯. ভিক্ষুকদের মাদকসহ অন্যান্য অপরাধের সাথে সম্পর্ক

বাংলাদেশের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিক্ষাবৃত্তিকে সম্মানজনক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হয় না। এমনকি ভিক্ষুকদেরকে মানবিকভাবে বিবেচনা করলেও তারা বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম থেকে উপেক্ষিত থাকে। ফলে তারা নিজেরাই বিভিন্ন অপরাধমূলক যেমন: মাদকাসক্তি, যৌনপেশা ও সহিংস কার্যক্রম (বোমা কিংবা অস্ত্র সরবরাহ) ইত্যাদি কাজের সাথে জড়িয়ে পড়ে কিংবা জড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। বিশেষ করে রাজধানীতে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের একটি অংশ এ সকল অপরাধ সিন্ডিকেটের সাথে জড়িত, যা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানা যায়।

সারণি ১০: *মাদকসহ অন্যান্য অপরাধের সাথে সম্পৃক্ততার বিবরণ*

ভিক্ষুকদের অভিমত	অপরাধমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ততা			
	মাদকদ্রব্য গ্রহণ	অবৈধ যৌন সম্পর্ক	চুরি করা	সহিংস কাজ করা
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
না	১৫ (১৪.৯)	৯৮ (৯৭.০)	৪০ (৩৯.৬)	১০০ (৯৯.০)
হ্যাঁ	৮৬ (৮৫.১)	০৩ (২.৯)	৬১ (৬০.৪)	০১ (১.০)
মোট	১০১ (১০০)	১০১ (১০০)	১০১ (১০০)	১০১ (১০০)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের উপর পরিচালিত এ গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে (সারণি ১০) দেখা যায় যে, বেশীরভাগ ভিক্ষুক মাদকদ্রব্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও অন্যান্য অপরাধের সাথে তারা খুব কমই জড়িত। অধিকাংশই মাদকদ্রব্য বলতে তারা গাঁজা, তাড়ি ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে, তবে দুই একজন হেরোইন সেবন করে বলে জানিয়েছে। মাদকদ্রব্য সেবন ব্যাতিত অবৈধ যৌন সম্পর্ক, বিভিন্ন সহিংস ঘটনা বিশেষ করে ক্যাম্পাসে ছাত্র সংঘর্ষের সময় বোমা, লাঠি সরবরাহ, লুটপাট ইত্যাদি অপরাধের সাথে প্রায় সব ভিক্ষুকই জড়িত নয় বলে অভিমত ব্যাক্ত করেছে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, অর্ধেকের বেশী অর্থাৎ শতকরা ৬০.৪ ভাগ ভিক্ষুকই সুযোগ পেলে জিনিসপত্র চুরি করে বলে উল্লেখ করেছে। অতএব বলা যায় যে, ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকরাও কম বেশী সামাজিক অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত।

৫.১০. ক্যাম্পাসে ভিক্ষা করার অসুবিধা

যেকোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই ভিক্ষুকদের বিচরণ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় মনোযোগের ব্যাঘাত সৃষ্টিসহ পরিবেশের জন্য বেমানান। কিন্তু সামাজিক প্রথা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তি সমাজে প্রচলিত থাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও এ থেকে নিষ্কৃতি পায় না। তারপরও প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের স্বার্থে ক্যাম্পাসে ভিক্ষুকদের সাথে রূঢ় আচরণ করতে হয়, যা তাদের কাছে খারাপ বা অসুবিধা হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের মতামতে (সারণি ১১) লক্ষ্য করা যায় যে, প্রশাসনিক উৎপাত (শতকরা ৩৪.৭ ভাগ) ও ক্যাম্পাসের গোলযোগই (শতকরা ৩৪.৭ ভাগ) তাদের জন্য সবচেয়ে বেশি

অসুবিধা বা সমস্যা। ভিক্ষুকরা ক্যাম্পাসে আরও যে সব সমস্যার মুখোমুখি হয় তাহলো; দুর্ব্যবহার (শতকরা ১৮.৮ ভাগ), ছিনতাই (শতকরা ৮.৯ ভাগ), অন্যান্য (শতকরা ৩ ভাগ) ইত্যাদি।

সারণি ১১: *ক্যাম্পাসে ভিক্ষাবৃত্তিতে অসুবিধার বিবরণ*

অসুবিধার ধরন	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
প্রশাসনিক উৎপাত	১৫ (৩০.৬)	২০ (৩৮.৫)	৩৫ (৩৪.৭)
ক্যাম্পাসের গোলযোগ	১০ (২০.৪)	২৫ (৪৮.১)	৩৫ (৩৪.৭)
দূর্ব্যবহার	১১ (২২.৪)	০৮ (১৫.৪)	১৯ (১৮.৮)
ছিনতাই	০৬ (১২.২)	০৩ (৫.৮)	০৯ (৮.৯)
অন্যান্য	০২ (৪.১)	০১ (১.৯)	০৩ (৩.০)
মোট	৪৯ (১০০)	৫২ (১০০)	১০১ (১০০)

তবে ক্যাম্পাসে ভিক্ষার অসুবিধার ধরনের ক্ষেত্রে মহিলা ও পুরুষ ভিক্ষুকের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষ করে অসুবিধা বিবেচনায় মহিলা ভিক্ষুকরা (শতকরা ৪৮.১ ভাগ) পুরুষের (শতকরা ২০.৪ ভাগ) তুলনায় ক্যাম্পাসে গোলযোগের সময় বেশি অসুবিধায় পড়ে বলে উল্লেখ করেছে। তাছাড়া দুর্ব্যবহার, ছিনতাই ইত্যাদি অসুবিধার ক্ষেত্রে মহিলা ভিক্ষুকের তুলনায় পুরুষ ভিক্ষুকরা বেশি আক্রান্ত হয়।

৫.১১. ভিক্ষুকদের কল্যাণ বা পুনর্বাসনে সুপারিশ

ভিক্ষাবৃত্তি অপচ্ছন্দনীয় একটি প্রথা হলেও সমাজের মধ্য থেকেই ভিক্ষুকদের সৃষ্টি এবং সমাজের মধ্যেই এদের বসবাস। এজন্য সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে তাদের জন্য কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা দরকার। তাই ভিক্ষুকদের কল্যাণ ও পুনর্বাসনে করণীয় সম্পর্কে তাদের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে (সারণি ১২) দেখা যায় যে, অধিকাংশ ভিক্ষুকই তাদের পুনর্বাসনে সরকারের পক্ষ থেকে ভাতা দেয়ার (শতকরা ৭২.৩ ভাগ) কথা উল্লেখ করেছে। বাকী উত্তরদাতা ভিক্ষুকরা তাদের কল্যাণে বসবাসের জন্য জমি প্রদান (শতকর ২৫.৭ ভাগ), বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা (শতকরা ১৮.৮ ভাগ), নীতিমালা প্রণয়ন করা (শতকরা ১৫.৮ ভাগ) এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের (শতকরা ১২.৯ ভাগ) সুপারিশ প্রদান করেছে। তবে লিঙ্গভেদে সুপারিশের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এটা সুস্পষ্ট যে, পুরুষ ভিক্ষুকের (শতকরা ৫৩.১ ভাগ) তুলনায় মহিলা ভিক্ষুকেরা (শতকরা ৭১.২ ভাগ) ভাতা প্রদানের পক্ষে বেশী অভিমত ব্যাক্ত করেছে। তবে মহিলা ভিক্ষুকের তুলনায় পুরুষ ভিক্ষুকরা বিকল্প কর্মসংস্থান, জমি প্রদান, নীতিমালা প্রণয়ন, পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে বেশী মতামত প্রদান করেছে। অতএব, এটা বলা যায় যে, পুরুষের তুলনায় মহিলাদের মধ্যে পরনির্ভরশীল মানসিকতাই বেশী, যা ভাতা গ্রহণ সংক্রান্ত মতামতে প্রকাশ পেয়েছে।

সারণি ১২: *ভিক্ষুক পুনর্বাসনে বা কল্যাণে সুপারিশের বিবরণ*

মতামত	ভিক্ষুকদের লিঙ্গ		সর্বমোট
	পুরুষ	মহিলা	
	গণসংখ্যা (শতকরা)	*গণসংখ্যা (শতকরা)*	*গণসংখ্যা (শতকরা)*
ভিক্ষুক ভাতা প্রদান	২৬ (৫৩.১)	৩৭ (৭১.২)	৭৩ (৭২.৩)
বসবাসের জন্য জমি প্রদান	১১ (২২.৪)	১৫ (২৮.৮)	২৬ (২৫.৭)
বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা	১০ (২০.৪)	০৯ (১৭.৩)	১৯ (১৮.৮)
বিশেষ নীতিমালা তৈরী করা	০৯ (১৮.৪)	০৭ (১৩.৫)	১৬ (১৫.৮)
পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা	০৭ (১৪.৩)	০৬ (১১.৫)	১৩ (১২.৯)
মোট	৬৩* (এন=৪৯)	৭৪* (এন=৫২)	১৪৭*(এন=১০১)

**একাধিক উত্তর গৃহীত হয়েছে।*

৬. সুপারিশমালা

ভিক্ষাবৃত্তি বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর সমাজব্যবস্থায় বিদ্যমান একটি কলঙ্কজনক প্রথা। ভিক্ষাবৃত্তির মাধ্যমে জীবনধারণ সমাজ অনুমোদিত ও সমাজ স্বীকৃত আচরণ নয় বিধায় এটা অনাচার হিসেবে বিবেচিত। সামাজিক অনাচার হলেও দারিদ্র্যপীড়িত দেশ হিসেবে আমাদের দেশে এর ব্যাপকতা লক্ষ্যণীয়। তবে যতদুর জানা যায়, দেশের বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে রাজধানীকেন্দ্রিক এ বিষয়ে কিছু গবেষণা হলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক এ ধরনের গবেষণা হয়নি। অতএব এ গবেষণার ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যা সমাধানসহ ভিক্ষুকদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সুপারিশ তুলে ধরা হলো-

১. ভিক্ষাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য সক্ষম ভিক্ষুকদের ভিক্ষাগ্রহণ ও দানকে নিরুৎসাহিত করা এবং এক্ষেত্রে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণসহ ভিক্ষুকদের দায়িত্ব গ্রহণে কমিউনিটির লোকদেরকে উৎসাহিত করা।

২. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্যাম্পাসে ভিক্ষুকদের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত করা। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে ও ভবনে কর্তব্যরত নিরাপত্তা প্রহরীদের সতর্ক করা।

৩. প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, কর্মসংস্থানের অভাবে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা কবলিত এলাকায় একটি মৌসুমে কাজ না থাকায় অনেকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত হয়। এজন্য কর্মহীন মৌসুমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থাসহ সক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য আলাদা কেন্দ্র গড়ে তুলে তাদেরকে উৎপাদনক্ষম করে গড়ে তোলা।

৪. শারীরিকভাবে অক্ষম বা বিকলাঙ্গশ্রেণীর ভিক্ষুকদের জন্য জেলা পর্যায়ে দু:স্থ নিবাস স্থাপন এবং তাদের ক্ষমতা অনুযায়ী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রয়োজনে সামাজিক নিরাপত্তাবেষ্টনী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ভিক্ষুকদেরকে ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৫. জাতীয় প্রচার মাধ্যমে এবং গ্রামীণ ধর্মীয় নেতাদের মাধ্যমে ভিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা প্রচার করা, যাতে এ বিষয়ে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করা সম্ভব হয় ।

৬. গবেষণার প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ভিক্ষুকরা আংশিকভাবে হলেও সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িত। বিশেষ করে অবাধ বিচরণের সুযোগে তারা মাদকদ্রব্যের বিস্তারসহ রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনের গোলযোগের সময় সহিংস কাজে লিপ্ত হয়, যা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি।

৭. সামগ্রিকভাবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (যদিও কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আছে) ভিক্ষুকদের অবাধ বিচরণ নিয়ন্ত্রণে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন করা, যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নির্বিঘ্ন করাসহ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হয়।

৭. উপসংহার

ভিক্ষাবৃত্তি একটি জটিল বহুমাত্রিক সমস্যা। কেননা ভিক্ষাবৃত্তির সাথে অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি মনোস্তাত্ত্বিক বিষয়ও জড়িত। বিশেষ করে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ধর্মীয় অনুশাসন ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রভাব এবং সামাজিক নিরাপত্তামুলক কর্মসূচীর অপর্যাপ্ততা ভিক্ষাবৃত্তি সমস্যাকে আরও বিস্তৃত ও প্রসারিত করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসও এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়, যা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় বিঘ্ন সৃষ্টিসহ শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করে। অতএব গবেষণার ভিত্তিতে প্রণীত সুপারিশমালা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ অনুসরণ করলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিচরণকৃত ভিক্ষুকদের নিয়ন্ত্রণসহ পরিবেশ বজায় রাখা সম্ভব হবে। তাছাড়া বর্তমান সরকারের গৃহীত 'একটি বাড়ী, একটি খামার', 'গ্রামে ফেরা কর্মসূচী' এবং 'আশ্রয়ণ' ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে নগর দরিদ্রতা দূরীকরণসহ ভাসমান জনগোষ্ঠী ও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন কার্যক্রম নিশ্চিত হবে বলে আশা রাখি।

তথ্যসূত্র

আহমদ, ফয়সুল (২০০৯), "বাংলাদেশে ভিক্ষাবৃত্তি-একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ", *নৃবিজ্ঞান পর্যালোচনা, সংখ্যা ২.* সিলেট: নৃবিজ্ঞান পর্যালোচনা কেন্দ্র, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম, আ. স. ম. নুরুল ও রহমান, মোঃ হাবিবুর (১৯৭৭), *সমাজকল্যাণ নীতি ও কর্মসূচী.* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

খান, মাওলানা মুহিউদ্দীন (অনুবাদ ও সম্পাদনা) (১৪১৩ হিজরী), *তফসীরে মাআরেফুল কোরআন.* মদিনা: খাদেমুল-হারামাইন বাদশাহ ফাহদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৫), *সাফল্যের শিখরে.* ঢাকা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়।

ঢালী, ড. মুহাম্মদ আব্দুল হাই (১৩৯৪), *বাংলাদেশ দর্শন.* ঢাকা: মিতা ট্রেডার্স।

তালুকদার, ড. আব্দুল হক (২০০৫), *সমাজকর্মঃ ধারণা, ইতিহাস ও দর্শন.* ঢাকা: তিতুমীর লাইব্রেরী।

দৈনিক প্রথম আলো, ৫ ই মে, ২০১০, পৃষ্টা-৮।

রহমান, মোঃ আতিকুর (২০০০), *স্নাতক সমাজকল্যাণ.* ঢাকা: কোরআন মহল।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (২০১০), *রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ডায়েরী.* রাজশাহী: জনসংযোগ দপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

শওকতুজ্জামান, সৈয়দ (১৯৯৩), *বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা: স্বরূপ ও সমাধান.* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

শওকতুজ্জামান, সৈয়দ (১৯৯০), *সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ, ২য় খন্ড.* ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হাকিম, আব্দুল খান বাহাদুর (সম্পাদিত) (১৯৭৩), *বাংলা বিশ্বকোষ ৩য় খন্ড.* ঢাকা: নওরোজ কিতাব বিতান।

Government of Pakistan (1964), ***Commission for Eradication for Social Evils.*** Karachi: Government Printing Press.

Government of India (1987), ***Encyclopaedia of Social Work in India, Vol. 1.*** New Delhi: Indian Offset Press.

Madan, G. R. (2006), ***Indian Social Problems Vol. 1.*** New Delhi: Anmol Publications Limited.

Rao, C. N. Shankar (2006), ***Sociology Primary Principles.*** New Delhi: S. Chand & Company Limited.

Sharma, B. B (1999), ***Encyclopaedic Dictionary of Sociology.*** New Delhi: Anmol Publications Private Limited.

ISSN: 1561-798x
আইবিএস জার্নাল সংখ্যা ২০, ১৪১৯

বাংলা সঙ্গীতে স্বর ব্যবস্থা

শেখর মণ্ডল*

Abstract: *Swara* (Note) is the most important and worth-mentionable part of our wonderful musical system. *Raga sangeet* is the most developed form of our sub-continental music and *Swara* is the root of the serenitical and aesthetical subject of *Raaga*. *Saam swara* of *Saam/Saamn-Sangeet* of Vedic-era is the first step of our music, on the other hand in this ancient time, the scholars and the researchers of *Gandharva* created *Loukik Swara*, *Swara-graam*(Octeve), *Shruti, Murchhana* and *Raga* and they are able to create a complete musical system by scientific acoustical research. To proceed from the early Vedic age to the Middle Ages and the Middle Ages to the contemporary period the two forms of our classical music—*Hindustani* (North Indian) and *Karnataki* (South Indian), and their notation system evolved from the ancient *Gandharva* music patronized by the Vedic tradition. In this article, the author tries to present the characteristics of the total notation system of Bangla music.

ইতিহাসের আলোয় মানবসভ্যতাকে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায়—সঙ্গীত আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে রয়েছে মানুষকে। সঙ্গীতের সঙ্গে মানুষের এই অব্যবচ্ছেদ সম্পর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকদের। তাঁদের অনেকেই মনে করেন- প্রকৃতিকে অনুকরণ করতে গিয়েই সঙ্গীত ধ্বণির জন্ম। এ উপমহাদেশের সঙ্গীত বিদ্যার একজন অন্যতম পথিকৃৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ও উপরোক্ত মতের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন।১ আবার কেউ কেউ বলেছেন- সঙ্গীতের জন্ম Labour cry বা শ্রম ধ্বণি থেকে।২

কিন্তু সৃষ্টি যে ভাবেই হউক না কেন, সঙ্গীতের মূল কথাই যে ধ্বণি বা শব্দ- এ ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত রয়েছে বলে কোনোা যায়নি। কিন্তু সব শব্দ বা ধ্বণিই কি সঙ্গীত সৃষ্টিতে সক্ষম? উত্তরে বলা যায় না। বৈজ্ঞানিক ভাবে কোনো ধ্বণিকে সঙ্গীত ধ্বণি হবার জন্যে কিছু শর্ত আবশ্যিক ভাবে পালন করতে হয়।

১. ধ্বণির নির্দিষ্ট তীক্ষ্ণতা (Pitch)
২. পর্যাবৃত্ত আন্দোলন (Periodicity of vibration) এবং
৩. অব্যহত গতি (Periodic Motion)।

---

* প্রভাষক, সঙ্গীত বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব ডেভলপমেন্ট অল্টারনেটিভ, ঢাকা।

অর্থাৎ, শব্দ তরঙ্গ যখন নির্দিষ্ট সময় এবং গতির (লয়) ব্যবধানে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিক্রমিত হয়, তখন সে শব্দ তরঙ্গ মানুষের শ্রবণ যন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট তীক্ষ্ণতার জন্ম দেয়। তরঙ্গের শ্রুতি বৃদ্ধি পেলে তার দৈর্ঘ্য কমে যায় এবং শব্দের তীক্ষ্ণতা ক্রমেই চড়তে থাকে। এই শব্দ তরঙ্গই সঙ্গীত ধ্বণি। যা পরবর্তী কালে সুরের বিভিন্নতায় সুখশ্রাব্য সঙ্গীতের জন্মদান করে। এই ধ্বণি থেকে জন্ম হয় নাদের।৩

ব্যুৎপত্তিগত ভাবে- সংস্কৃত '√নদ' ধাতু থেকে নাদ শব্দের উৎপত্তি, যার অর্থ হলো নিনাদিত হওয়া। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রগুলিতে এই নাদকেই স্বরের কারণ রূপে অভিহিত করা হয়েছে। সঙ্গীত রত্নাকরের তৃতীয় অধ্যায়ে নাদের বর্ণনায় বলা হয়েছে- 'ন'-কার-এর নাম 'প্রাণ' এবং 'দ' কার হল 'অনল' বা 'অগ্নি'। অতএব, 'প্রাণ' এবং 'অগ্নির' সংযোগ হতে উৎপন্ন বলে (ইহা) নাদ নামে অভিহিত হয় (ভারতীয় যোগশাস্ত্রে বায়ু বা বাতাসকেই প্রাণ বলা হয়েছে)। ৪

এই নাদ আবার দুই প্রকার-

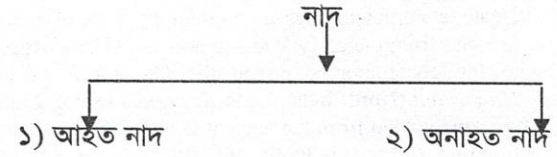

অনাহত নাদ সাধারণের শ্রবণ যোগ্য নয়- তা সাধারণত যোগীদের দিব্যকর্ণে ধ্বণিত হয় বলে কথিত। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো আহত নাদ। শ্রবণ যোগ্য যাবতীয় নাদ ই আহত নাদ। এই আহত নাদ আবার দুই প্রকারের—

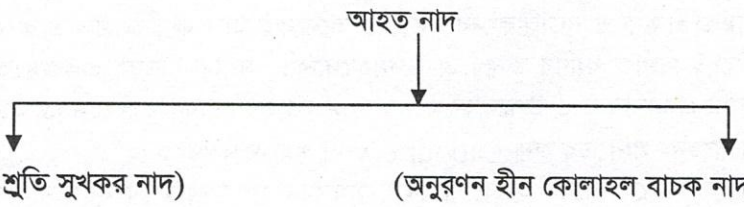

সঙ্গীতের স্বর এই সাঙ্গীতিক নাদ অর্থাৎ অনুরণাত্মক শ্রুতি সুখকর নাদ হতে সৃষ্ট। অর্থাৎ এই নাদ রঞ্জকত্ব গুণপূর্ণ ও শ্রোতার মনোরঞ্জনকারী। 'সঙ্গীত রত্নাকর -এ বলা হয়েছে"এর দ্বারা ব্রহ্মা- বিষ্ণু- মহেশ্বর উপাসিত হন, একে আরও বলা হয়েছে, ইহা মানুষের মোক্ষ লাভের কারক।"৫ যেহেতু স্বরের কারক নির্ণয় উপরের আলোচনায় সম্ভব হয়েছে। এ পর্যায়ে আলোচনা করা যাক স্বর কি।

স্বর

'স্বর' শব্দটিকে সর্বপ্রথম বুৎপত্তিগতভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে বৃহদ্দেশী গ্রন্থ প্রণেতা মতঙ্গ মুনি তার 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে (উল্লেখ্য যে-বৃহদ্দেশী গ্রন্থটি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দির একটি গ্রন্থ)। এখানে বলা হয়েছে-'' রাজৃদীপ্তাবি" তি ধাতোঃ স্বশব্দপূর্বকস্য চ।

স্বয়ং যো রাজতে যস্মাৎ তস্মাদেব স্বরঃ স্মৃতঃ ॥"

অর্থাৎ- দীপ্ত অর্থে √ রাজ ধাতু 'স্ব' শব্দের পরে যুক্ত হয়ে 'স্বর' শব্দটি নিস্পন্ন করেছে। স্ব অর্থাৎ স্বয়ং যে বিরাজিত (√ রাজ) তাই ই স্বর। অর্থাৎ- স্ব+ √ রাজ=স্বর। ৬

এখানে নিতান্ত সাধারণ ভাবেই একটা প্রশ্ন চলে আসে তা হলো- এই বিরাজমানতা কিসের? উত্তর বলা যায়- এই বিরাজমানতা রঞ্জকতার, এই দীপ্তমানতা রক্তিদায়কতার।সঙ্গীত রত্নাকর প্রনেতা নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব সে কথাই বলেছেন-

"শ্রুত্যন্তর ভাবী যঃ স্নিগ্ধোহনুরণত্মকঃ।
স্বতো রঞ্জয়তি শ্রোতৃচিত্তং স স্বর উচ্চতে।।"

(১/৩/২৪ সঙ্গীত রত্নাকর)

অর্থাৎ- যে নাদ শ্রুতির পশ্চাতে অবস্থান করে, স্নিগ্ধ এবং অনুরণাত্মক এবং শ্রোতৃচিত্ত রঞ্জনকারী তাকে স্বর বলে।৭

অনেককাল পরে এসে 'সঙ্গীত মকরন্দ' গ্রন্থে মকরন্দকার নারদও স্বর লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে সরাসরি নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেবের এই শ্লোকটিই পুনরোল্লেখ করেছেন।৮

এ পর্যায়ে একটি কথা যা বলা যায়- তা হলো " আজকের দিনে রাগ বলতে আমরা যা বুঝি, যা রঞ্জন অর্থে (√ রঞ্জ্ ধাতু থেকে নিস্পন্ন) উৎপন্ন এবং প্রকাশ- এই রাগের যে রঞ্জকত্ব, তার মুল প্রোথিত হয়ে আছে স্বরের রঞ্জকতায় বা দীপ্ততায় ।

আধুনিক বিজ্ঞানে ও স্বরকে ব্যাখ্যায়িত করা হয়েছে ধ্বণিতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে। বৈজ্ঞানিক মতে স্বরের ব্যাখ্যায় বলা হচ্ছে- বস্তুর কম্পন যখন নির্দিষ্ট সময় অন্তর পুনরাবৃত্ত হয়, তাকে বলা হয় পর্যাবৃত্ত কম্পন। এভবে সরল দোল গতির সাহায্যে স্বনক (Reverbration) যে একটি মাত্র নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ সৃষ্টি করে, তাকে সুর বলা হয়। এবং স্বনকের (Reverbration) পর্যাবৃত্ত কম্পনের ফলে সৃষ্ট একাধিক সুরের সংমিশ্রণে যে শব্দ তৈরী হয়, তাকে স্বর বা Note বলা হয়।৯

এই স্বর আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে দুই প্রকার, তাহলো -

(১) পাঠ্য স্বর এবং

](২) গেয় স্বর।

এই প্রকার দুইটি মানুষের শারীরজ বা কণ্ঠজাত স্বরের প্রকারও বটে। তবে বাদ্যযন্ত্রাদিতে পাঠ্যস্বর নিনাদিত বা ব্যক্ত হয় না। পাঠ্যস্বরেও গেয় স্বরের মত উত্থান পতন রয়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক ভাবেই এই পাঠ্যস্বর দুটি বা তিনটির অধিক হয় না। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগের দিকে তাকালেও দেখা যায় - বৈদিক ঐতিহ্যে তিনটি পাঠ্যস্বর ছিল। এগুলো হলো-

১। উদাত্ত

২। অনুদাত্ত, ও

৩। স্বরিত।

উদাত্ত হলো উচ্চ স্বর, অনুদাত্ত হলো নিম্ন স্বর, এবং স্বর যেখানে স্থিত হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে স্বরিত। পাঠ্যস্বর সর্বদাই অবরোহী গতি সম্পন্ন, তাই স্বরের গতিও নিম্নাভিমুখী। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আমরা যদি কোনো বাক্য বা কবিতাংশ পাঠ করি তাহলে দম নিয়ে সামান্য উচ্চ গ্রামে পাঠ শুরু হয়, দম ফুরোবার সাথে সাথে গলায় স্বর কিছুটা খাদের দিকে নেমে এসে তৎক্ষনাৎ খুব সামান্য উঁচুতে ওঠে।

যেমন-

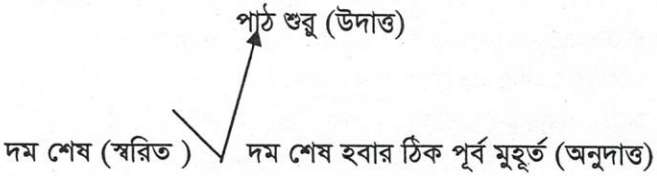

এই হল পাঠ্য স্বরের স্বরূপ। কিন্তু গেয় স্বর বা গানের স্বর পাঠ্য স্বর থেকে সম্পূর্ণভাবে আলাদা। গেয় স্বরে সর্বদা একটা নির্দিষ্ট অন্তর (Intervel) থাকে,যা পাঠ্য স্বরে থাকে না। যদি এই অন্তর পাঠ্য স্বরের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট হত তাহলে তা তৎক্ষনাৎ গেয় স্বরে পরিবর্তিত হত। নাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার অভিনব গুপ্তের (খৃঃ ১০ম শতক) ও এই রকম অভিমত। তিনি বলেছেন-

যদি হি স্বরগতা রক্তিঃ পাঠ্যে।
প্রাধান্যে নাবলম্বয়েত তদা গানক্রিয়াহ্সৌন পাঠঃ ॥

অর্থাৎ -যদি পাঠের সময় স্বরগত রঞ্জকত্ব প্রাধান্য পায়, তাহলে সেটা আর পাঠ থাকে না- গান হয়ে যায়। ১০

তাহলে উপর্যুক্ত আলোচনায় 'বৃহদ্দেশী' কার মতঙ্গ মুনি, 'সঙ্গীত রত্নাকর' প্রণেতা নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব এবং নাট্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার অভিনব গুপ্তের মতামত পর্যালোচনা করে গেয় স্বরের চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, তাহলো-

১. স্নিগ্ধতা (অর্থাৎ কমনীয়তা, রূঢ় বা কর্কশ নয়)
২. অনুরণনত্বকতা (যেমন- তানপুরার যাকে জোয়ারী বলা হয়, গভীর খাদ যুক্ত কম্পন নয়)
৩. স্বরগত রঞ্জকত্ব (শ্রুতি সুখকর) এবং
৪. নির্দিষ্ট অন্তর ((Intervel)।

এ পর্যায়ে চতুর্থ বৈশিষ্ট্য (নির্দিষ্ট অন্তর)- এ বিষয়টি সামান্য হলেও পর্যালোচনার দাবী রাখে। কি বোঝানে হয়েছে এই নির্দিষ্ট অন্তর বলতে? উত্তর- এই অন্তর হলো - স্বরান্তর। অর্থাৎ একটি স্বর থেকে অন্য একটি স্বরের মধ্যবর্ত্তী নির্দিষ্ট দূরত্ব- যা গেয় স্বরের একটি

আবশ্যিক শর্ত। এখানে আবশ্যিক ভাবে একটি প্রশ্ন চলে আসে- এই নির্দিষ্ট দূরত্বের পরিমাপক কি? এর উত্তর হলো- ' শ্রুতি'। শ্রুতি হলো একটি স্বর থেকে অন্য একটি স্বরের মধ্যবর্ত্তী অন্তরের নির্দিষ্টতার পরিমাপক। ১১ শ্রুতি কি? -পারত পক্ষে শ্রবণ অর্থে √ শ্রু ধাতুর সঙ্গে 'ক্তিন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শ্রুতি শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ √শ্রু + ক্তিন = শ্রুতি, যার অর্থ রয়েছে নানাবিধ। কিন্তু আমাদের আলোচনার প্রেক্ষাপটে 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থের ভাষ্য মতে বলা যায় 'কর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য ধ্বনি মাত্রই শ্রুতি'।

"শ্রবর্ণেন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বাদ ধ্বণিরেব শ্রুতির্ভবেৎ।"

অর্থাৎ -শ্রবণে বিধৃত হয় বলেই তাদের শ্রুতি বলা হয়। ১২

এই শ্রুতি 'স্বর-শ্রুতি' ও 'অন্তর-শ্রুতি' এভাবে দু'প্রকার। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্র যে ২২ টি শ্রুতির কথা বলে এই ২২ শ্রুতি মূলতঃ অন্তর শ্রুতি।

শ্রুতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঙ্গীত চিন্তা' শ্রুতির ধারণাকে আরও বেশী পরিচ্ছন্ন ভাবে তুলে ধরে।

> বিলিতির সঙ্গে এই দিশি গানের ছাঁদের তফাৎটা কোনো খানে? প্রধান তফাৎ সেই অতি সূক্ষ্ম সুরগুলি লইয়া যাকে বলে শ্রুতি। এই শ্রুতি আমাদের গানের সূক্ষ্ম স্নায়ুতন্ত্র। ইহারই যোগে একসুর যে কেবল এক সুরের পাশাপাশি থাকে তাই নয়, তাদের মধ্যে নাড়ীর সম্বন্ধ ঘটে।১৩

রাগ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শ্রুতিকে কণ্ঠে বা যন্ত্রে দেখাতেই হয়, তা না হলে রাগ সঙ্গীতের রাগদারী অর্থাৎ ধ্বণিগত ভাবে রাগের যে বিশুদ্ধ রূপ তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কণ্ঠে বা যন্ত্রে শ্রুতি গুলিকে কম্পিত আন্দোলিত, পূণঃ পূণঃ আন্দোলিত বা স্থিত ইত্যাদি স্বর প্রয়োগের দ্বারা প্রকাশ করতে হয়। ১৪

উদাহরণের মাধ্যমে হয়- রাগ পুরিয়া বা পুরিয়া কল্যাণের কোমল ঋষভ আবার রাগ মারোয়ার কোমল ঋষভ দুটি কোমল ঋষভই শ্রুতিগত ভাবে আলাদা। শুধুমাত্র ব্যবহারিক ভাবে পারঙ্গম সঙ্গীতজ্ঞই পারেন দুটি ঋষভকে আলাদা ভাবে দেখাতে বা প্রয়োগ করতে। এই প্রবন্ধে প্রাসাঙ্গিক ভাবে আলোচিত হবে এ সকল শ্রুতির তাত্ত্বিক দিক।

উপরের আলোচনা থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার-তা হলো শ্রুতিও পারত পক্ষে স্বরই, কিন্তু তার পরিমাপক কি হবে সে সম্পর্কে নাট্যশাস্ত্রের ২৮ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে-

> "মধ্যগ্রামে তু শ্রুত্যাপকৃষ্ঠঃ পঞ্চম কার্যঃ।
> পঞ্চমস্য শ্রুত্যুৎকর্ষাদ্পকদবা যদান্তরং
> মার্দবাদায়তত্বাদ্বা তৎপ্রমাণং শ্রুতিঃ ।।"

অর্থাৎ -মধ্যম গ্রামে পঞ্চম স্বরটির একশ্রুতি হীন করো; বীণার পঞ্চম স্বরের তন্ত্রীকে মার্দব (শিথিল) এবং আয়ত (দৃঢ়) করার জন্য এক শ্রুতি উৎকর্ষ (চড়া) বা অপকর্ষ (নামা) জনিত অন্তর বা তফাৎ অনুভূত হয়,সেটাই এক শ্রুতির প্রমাণ (পরিমান)। তাহলে বলা যায় স্বরের চতুর্থ শর্ত যে নির্দিষ্ট অন্তর বা (Intervel) সে অন্তর হলো শ্রুতির অন্তর এবং সেই নির্দিষ্টতার পরিমাপক হলো শ্রুতি। আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্র যে অন্তর শ্রুতির কথা

বলছে বা ২২ শ্রুতির কথা বলছে- এই ২২ শ্রুতির বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট দূরত্বে বা অন্তরে প্রতি স্থাপিত আমাদের স্বরগুলি, - তা যথা সময়ে আলোচিত হবে।

আলোচনার এ পর্যায়ে আমাদের সঙ্গীতে স্বর ব্যবস্থার প্রকার ভেদ আলোচনা প্রসঙ্গে গান্ধর্ব, দেশি এবং আমাদের লোক সঙ্গীতের স্বর ব্যবস্থা আলোচনা করব। তার আগে একটু খানি বলে নেওয়া দরকার যে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীতের যে ক্রমবিকাশ তার প্রথম ধাপে পাই বৈদিক গান-সামগান, দ্বিতীয় ধাপে পাচ্ছি গান্ধর্বগান বা মার্গসঙ্গীত এবং তৃতীয় পর্যায়ে পাচ্ছি মার্গ নিয়মাশ্রিত বা গান্ধর্ব নিয়মাশ্রিত দেশি গান,

যাকে শাস্ত্রকারগণ বলছেন মার্গ দেশি বা অভিজাত দেশি গান, এবং আজকের দিনে আমরা যে রাগ-সঙ্গীত পাচ্ছি তা এই অভিজাত দেশি গানেরই বিবর্তিত রূপ। আলোচনার পরিশিষ্টাংশে আলোচিত হবে আমাদের লোক সঙ্গীতে প্রচলিত স্বর প্রসঙ্গ।

পূর্বে আমরা দেখেছি যে বৈদিক ঐতিহ্যের তিনটি পাঠ্যস্বর; যথা-

(১) উদাত্ত,
(২) অনুদাত্ত ও
(৩) স্বরিত।

এই তিনটি পাঠ্যস্বরই ক্রমে ক্রমে বিবর্তিত হয়ে যায় গেয় স্বরে। এই তিনটি পাঠ্যস্বর ভিন্ন অন্যকোন ধ্বণিকে বৈদিক গুণীগণ স্বর বলে স্বীকার করতেন না। এই তিনটি স্বর নিয়ে চলতে চলতে পরবর্তীকালে অবরোহী গতিতে 'স্বরান্তও' নামে ৪র্থ স্বরের জন্ম হয়, এবং সর্বশেষে 'মন্দ্র' নামের পঞ্চম বৈদিক স্বরের জন্ম হয়। এই সবগুলি স্বরের প্রকৃতিই ছিল অবরোহী প্রকৃতির । পরবর্তী কালেএসে আরোহী প্রকৃতির দুটি দূর্বল স্বর সামগানে ব্যবহৃত হতে লাগল, সে দুটি হল- 'অতিস্বার্য' ও 'ক্রুষ্ট'। খৃষ্টপূর্ব ৩য় শতকে এসে 'নারদীয় শিক্ষা' গ্রন্থের রচয়িতা শিক্ষাকার নারদ গান্ধর্ব গানের সঙ্গে বৈদিক গানের স্বরগুলির যে সমতূল্যতা তুলে ধরেন তাতে শ্রুতি বিন্যাসগত ভাবে বৈদিক সাত স্বরের শ্রুতিক্রম ছিল-

বৈদিক স্বর নাম:

পঞ্চম → (অতিস্বার্য) ← চতুর্থ (স্বরান্তর) ← তৃতীয় ← দ্বিতীয় ← প্রথম → (ক্রুষ্ট)

৩ ২ ৪ ৩ ২ ৪ ৪

শ্রুতি বিন্যাস

প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে -এই শ্রুতিক্রম হলো আধুনিক কালের কাফী ঠাটের সঙ্গে হুবহু সঙ্গতিপূর্ণ।

এই সুপ্রচীন বৈদিক কালেই গান্ধর্ব জাতির সঙ্গীত গুণীগন স্বর, স্বরগ্রাম, শ্রুতি, মূর্চ্ছনা, রাগ ইত্যাদি নাদ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করে বৈদিক সামগানের স্বরগ্রাম পূর্ণত্ব পাবার আগেই লৌকিক গানের সাত স্বর থেকে নয় স্বরের জন্ম দিয়েছিলেন। সে স্বরগুলি ছিল আরোহী প্রকৃতির। এই স্বরগুলি জন্মের পশ্চাতে বংশী ছিদ্র থেকে ফুৎকার জনিত ধ্বণির

প্রভাব ছিল বলে মনে করেন আধুনিক কালের সঙ্গীত গবেষকগণ। পর্বত ভূমিতে বসবাসকারী গন্ধর্বগণ লৌকিক স্বরগুলির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছিলেন নিজস্ব স্বর ও স্বরগ্রাম, ফলে তাদের নিজস্ব স্বরগ্রাম "গান্ধার গ্রাম" ছিল আরোহী প্রকৃতির।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে গান্ধর্ব গুণীদের স্বর সম্পর্কীত আবিষ্কারগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ

ক) একই স্বরের মন্দ্র- মধ্য ও তার স্থান নির্ণয় এবং একই স্বরের দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্বর নির্ণয়।

খ) দুটি স্বরের পরস্পর দূরত্ব বা স্বরান্তর আবিষ্কার। তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন এই স্বরান্তর তিন প্রকারের। যথা -

১) ক্ষুদ্রান্তর, ২) মধ্যান্তর এবং ৩)বৃহদান্তর।

ক্ষুদ্রান্তর, মধ্যান্তর ও বৃহদান্তর

বৈদিক সামগানের উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত নামক যে গেয় স্বর তিনটি ছিল, তাদের মধ্যে উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বর দুটির মধ্যে অন্তর বা পার্থক্য সর্বাধিক ছিল বলে তার নাম দেয়া হয়ে ছিল বৃহদান্তর। শিক্ষাকার নারদ তাঁর 'নারদীয় শিক্ষা' গ্রন্থে সামগানের এই উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বর দুটিকে বলেছেন মাধ্যম ও গান্ধার স্বর। আধুনিক স্বর ব্যবস্থায় স্বর দুটি হবে শুদ্ধ মাধ্যম ও কোমল গান্ধার, এই স্বর দুটির মধ্যকার অন্তরকে বলা বৃহদান্তর। বৈদিক যুগের কিছু পরে যখন স্বরান্তর পরিমাপক অন্তর শ্রুতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তখন গান্ধর্ব গুণীগণ দেখিয়েছিলেন বৃহদান্তরের পরিমাপ ৪ শ্রুতির সমান। আবার সামগানের অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর দুটির যে তফাৎ বা অন্তর, তাকে পরিমাপ করতে গিয়ে দেখা গেল ঐ অন্তর অল্প পরিমান এই অন্তর ক্ষুদ্রান্তর। শিক্ষাকার নারদের মতে অনুদাত্ত স্বর আধুনিক কালের 'গান্ধার' এবং স্বরিত স্বর আধুনিক কালের যেটি 'ঋষভ'ই কোমল গান্ধার ও শুদ্ধ ঋষভের শ্রুতি অন্তর ২(দুই) বা ক্ষুদ্রান্তর।

মধ্যান্তরে শ্রুতি অন্তর ৩(তিন)। পূর্বেই বলা হয়েছে গান্ধর্ব গুণীগণ বীণার তন্ত্রীতে একই স্বরের মন্দ্র, মধ্য, তার এই তিন স্থান আবিষ্কার করেছিলেন। এবং মধ্য কিংবা মধ্য এবং তার এই দুটি স্থানের ঠিক মধ্যঅঞ্চলে অবস্থিত একটি মধ্যস্বর আবিষ্কার করেছিলেন। এই মধ্যস্বরই পরবর্তীকালে মধ্যম্ বা ম হিসাবে পরিচিত হয়েছিল। বীণার তন্ত্রীতে পরীক্ষা করলে বোঝা যায় ম স্বর থেকে মধ্যস্থানের সা এবং তার স্থানের সা এর দূরত্ব সমান। সুতরাং, ম - কোমল গ ও শুদ্ধ রি এই স্বর তিনটিকে উদাত্ত- অনুদাত্ত স্বরিত স্বরের পরিবর্তে সা, কোমল নি এবং শুদ্ধ ধ কে উদাত্ত- অনুদাত্ত স্বরিত হিসাবে ধরলেও হুবহু একই হবে। তাহলে মন্দ্র মধ্য ও তার স্থানের মধ্যে যে কোনো স্থানকে মধ্যস্বর অনুযায়ী দুই ভাগে ভাগ করলে পূর্বার্ধে যেমন অবরোহ গতিতে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর পাওয়া যায়, তেমনি উত্তরার্ধেও উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর পাওয়া যায়।

যেমন-

	পূর্বার্ধ					উত্তরার্ধ		
	সা	রি	জ্ঞ	ম	(প)	ধ	ণ	র্স
শ্রুতি	৪	২	৩	৪	৪	২ ৪		= ২২ শ্রুতি ।

গান্ধর্ব গুণীরা দেখলেন অবরোহক্রমে স্বরিত স্বর থেকে পরবর্তী অধঃস্থ উদাত্ত স্বরটির দূরত্ব আধুনিক দৃষ্টিতে মধ্যস্থানীয় রি থেকে সা এবং ধা থেকে পা এর দূরত্বই মধ্যান্তর। শ্রুতি সংখ্যার হিসেবে তা ৩ (তিন) শ্রুতিক। এই হল ক্ষুদ্রান্তর- মধ্যান্তর ও বৃহদান্তর। এই হলো তিন প্রকারের শ্রুতিভেদ। ১৬

গান্ধর্বগুণীদের বিচারে বৈদিক স্বর সপ্তক অবরোহক্রমে হচ্ছে - বৃহদান্তর, ক্ষুদ্রান্তর, মধ্যান্তর, বৃহদান্তর, বৃহদান্তর, ক্ষুদ্রান্তর, মধ্যান্তর, কিংবা উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, উদাত্ত, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত। আধুনিক বিচারে যা সা, কোমল নি, শুদ্ধ ধ, প, শুদ্ধ- ম, কোমল- গ ও শুদ্ধ রি, অর্থৎ [সা ণ ধ প ম জ্ঞ ও]। শ্রুতি দিয়ে বিচার করে এই ক্রম তাঁরা বের করেছিলেন- ৪,২,৩,৪,৪,২,৩। এই শ্রুতিক্রমই সমতল ভূমিতে ষড়ূজ গ্রাম নামে পরিচিতি হয়েছিল। সমতল ভূমি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে- পর্বত ভূমির নিম্নে অবস্থিত যে সমতল ভূখন্ড। ১৭

এবার গান্ধর্বদের নিজস্ব স্বর-গ্রাম 'গান্ধার গ্রাম' এবং শেষে 'মধ্যমগ্রাম' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনার মাধ্যমে গান্ধর্ব স্বর ব্যবস্থার আলোচনা শেষ করব।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে- গান্ধর্বদের নিজস্ব স্বর গ্রাম গান্ধার গ্রাম ছিল আরোহ প্রকৃতির। এই গান্ধার গ্রামের গ্রামণী স্বর বা মুখ্য স্বর কিংবা প্রথম স্বর ছিল 'গান্ধার' বা 'গা'। গান্ধার গ্রামের মূর্চ্ছনা গত স্বর বিন্যাস ছিল -

১ম মূর্চ্ছনা ঃ গ, ম, প, ধ, নি, র্সা, র্রি,
২য় মূর্চ্ছনা ঃ ম, প, ধ, নি, র্সা, র্রি, র্গ, এবং
৩য় মূর্চ্ছনা ঃ প, ধ, নি, র্সা, র্রি, র্গ, র্ম।

এখানে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে হলেও মূর্চ্ছনার কিছু ধারণা না দিলে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যাবে। মুনি মতঙ্গই সর্বপ্রথম তাঁর বৃহদ্দেশী গ্রন্থে মূর্চ্ছনা সম্পর্কে স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার ধারণা দিয়েছেন:

"মূর্চ্ছনাশব্দনিস্পন্নো মূর্চ্ছামোহসমুচ্ছ্রয়ে।
মূর্চ্ছতেযেনরাগোহি মূর্চ্ছনেত্যভিসংজ্ঞিতাঃ।।
আরোহনবরোহনক্রমেন স্বর সপ্তকম।।
মূর্চ্ছনাশব্দবাচ্যং হি বিজ্ঞেয়ং উদ্বিচক্ষনৈ।।"

"মূর্চ্ছনা শব্দের নিস্পত্তি হয়েছে 'মূর্চ্ছা' (শব্দ) থেকে, যার অর্থ মোহ, সমুচ্ছ্রয়। যার দ্বারা রাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা বিকশিত হয় তাকে মূর্চ্ছনা বলে। সপ্ত স্বরের ক্রমিক আরোহন অবরোহনকে বিচক্ষণব্যক্তিগন মূর্চ্ছনা শব্দ দ্বারা অভিহিত করেন।" ১৮

অতএব, মূর্চ্ছনাতে প্রত্যেকটি স্বরের মধ্যে এক এক বারে একটি স্বরকে প্রথম স্বর ধরে আরোহন অবরোহন করলে প্রত্যেক গ্রামে সাতটি করে মুর্চ্ছনার সৃষ্টি হয়। এভাবে তিনটি গ্রামে মোট ৩×৭= ২১টি মূর্চ্ছনার সৃষ্টি হয়। এই ২১ টি মূর্চ্ছনার ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছিলেন গান্ধর্ব শাস্ত্রীগণ এবং এর প্রত্যেকটি মূর্চ্ছনাতে স্বরের শ্রুতিগত অবস্থানে ভিন্ন ভিন্ন হতো। এ পর্যায়ে ৩ গ্রামের স্বরগুলির সাধারণ বিন্যাস এবং তার শ্রুতিগত অবস্থান উল্লেখ করে মূর্চ্ছনা পর্যায়ের আলোচনা শেষ করব।

ষড়জ গ্রামঃ	সা	রি	গ	ম	প	ধ	নি	র্সা
	৩	২	৪	৪	৩	২		= ২২ শ্রুতি
মধ্যম গ্রামঃ	ম	প	ধ	নি	র্সা	র্রি	গ	র্ম

গান্ধার গ্রাম	৩	২	৪	৩	২			=২২শ্রুতি
	গ	ম	প	ধ	নি	র্সা	র্রি	গ
	৩	৩	৩	৪	৩	২	৪	

২২শ্রুতি

আলোচনার এ পর্যায়ে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ভাবে চলে আসে দেশে দেশে বা অঞ্চলভেদে প্রচলিত রয়েছে যে দেশি গান, তার স্বর সম্পর্কিত আলোচনা। পারতপক্ষে, ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনায় গান্ধর্বগানের প্রসঙ্গ যেমন একটি অপরিহার্য পর্যায় বিশেষ, তেমনি ভাবে দেশি গানের প্রসঙ্গটিও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় চলে এসেছে কালোত্তীর্ণ হয়ে। এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার যে, পূর্বালোচনায় যে ২২ টি শ্রুতির আলোচনা করা হয়েছে, বৈদিক ঐতিহ্যে সামগানের ক্ষেত্রে তাকেই বলা হত 'শ্রুতিজাতি' এবং গান্ধর্ব ২২ শ্রুতি বৈদিক সামগানের পাঁচটি শ্রুতিজাতিরই (দীপ্তা, আয়তা, মৃদু, মধ্যা ও করুণা) বিকশিত রূপ। বৈদিক ঐতিহ্যে এই শ্রুতিজাতি ছিল বিশেষ ভঙিমায় উচ্চারণ করা। অনেক পরে গান্ধর্ব গবেষকগণ তাঁদের সাত স্বরের অন্তর্গত বাইশটি সূক্ষ্মনাদ বা অন্তর শ্রুতি আবিষ্কার করে এই বাইশ শ্রুতিক স্বরগ্রামের স্বরগুলির দূরত্ব নির্ণয়ের একক রূপে নিধার্রণ করেছিলেন। কিন্তু এই শ্রুতিগুলির ধ্বণিগত রূপ গানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয় না; তা যদি হয় তাহলে সকল গানের স্বর প্রক্ষেপণ ভঙিমা একই রকম হতো। তাহলে গানের ভঙিমাকে প্রকাশ করে দেশ ভেদে বা অঞ্চল ভেদে কিংবা বিষয় ভেদে ; তাকে কি বলছে শাস্ত্র ? তাকেই বলছে শ্রুতিজাতি বা শ্রুতিভঙ্গী। এই শ্রুতিজাতি ছিল দু প্রকার।

১. গান্ধর্ব;
২. দেশী।

গান্ধর্ব শ্রুতিজাতি পূর্বালেচনায় উল্লেখ করা হয়েছে,- যা ছিল পূর্ব নির্দিষ্ট, অনড় এবং সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দেশি শ্রুতির ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় না। ভারতীয় উপমহাদেশের নানা প্রান্তে যে সব দেশিয় ভাষা রয়েছে তাদের উচ্চারণ ভঙ্গী পৃথক পৃথক,

সাঙ্গীতিক স্বরের ক্ষেত্রে এমনই ভঙিমায় স্বর উচ্চারণ সুপ্রচীন কাল থেকেই ভারত বর্ষে প্রচলিত। এই দেশি শ্রুতি-জাতির জন্যই উত্তর ভারত - তথা হিন্দুস্থানী এবং দক্ষিণ ভারত তথা- কর্ণাটকী স্বরোচ্চারণ পৃথক পৃথক হয়েছে প্রকৃতিগত ভাবেই। দেশি এই শ্রুতিজাতিকে প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রাদিতে দেশজ কাকুও বলা হয়েছে।১৯

এবার- আলোচনায় আসা যাক কিভাবে গান্ধর্ব গবেষকগণ ৭টি শুদ্ধ স্বর নিয়ে চলতে চলতে নাদের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করলেন বিকৃত আরও কয়েকটি স্বর। তবে তার পূর্বে একটি কথা বলা দরকার, পৃথিবীর কোনো আদিম জাতির প্রাথমিক গানই দুই স্বর বা তিন স্বরের অধিক ছিলনা বলে উল্লেখ করেছেন সঙ্গীত গবেষকগণ। সে ক্ষেত্রে গান্ধর্ব জাতির সাতটি শুদ্ধ স্বরও একেবারে তাদের প্রাথমিক গানে থাকবার কথা নয়। এই সাতটি শুদ্ধ স্বরও এসেছে ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে, এবং তারপর তাঁরা আবিষ্কার করলেন বিকৃত স্বরগুলি।

গান্ধর্বগুণীরা সাতটি শুদ্ধ স্বর আবিষ্কার পর আবিষ্কার করেন "অন্তর গান্ধার" ও "কাকলী নিষাদ" নামের দুটি বিকৃত স্বর, কিন্তু কিভাবে বা কোনো প্রক্রিয়ায় আবিস্কৃত হল, সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে পারেনি আমাদের সঙ্গীত শাস্ত্রাদিও। তবে এ ব্যাপারে একটি যুক্তিপূর্ণ মতামত উপস্থাপন করেছেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রী ও গবেষক ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ। তাঁর মতে- গান্ধর্ব গুণীগণ ষড়ূজ গ্রাম ও মধ্যম গ্রামের সমীকরণ করে খুঁজে পান অন্তর গান্ধার।

অর্থাৎ ষড়জ গ্রাম ও মধ্যম গ্রামের শ্রুতিগত সমীকরণে ষড়জগ্রামের গান্ধার ও মধ্যম স্বর দুটির ঠিক মধ্যস্থলে মধ্যম গ্রামের "ধৈবত" কে খুঁজে পাওয়া যায়। এবং ঐ স্বরটিকে ষড়জ গ্রামের বিকৃত স্বর হিসাব গ্রহণ তার নাম দেওয়া হয় "অন্তর গান্ধার"। উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নে তা দেখানো হলো -

শ্রুতিক্রম : ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ (১১) ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২ ২২
| | | | | | | | | | | | | | |
ষড়জ গ্রাম: সা ০ ০ রি ০ গ ০ ০ ০ ম ০ ০ ০ প ০ ০ ধ গ নি
মধ্যম গ্রাম: র্ম d ০|প ϕ d ϕ (ধ) |০ ϕ ০|নি ০| র্স| ০ b র্রি ০| র্গ|

গান্ধর্ব গুণীগণ দেখলেন, ষড়জ গ্রামের ২ শ্রুতিক গান্ধার (৮-৯) যদি আরও দুই শ্রুতি চড়ানো যায় (১০,১১) তাহলেই ষড়জ গ্রামে অন্তর গান্ধার নামক বিকৃত স্বরটিকে পাওয়া যায়।

তখন তাঁরা ভাবলেন, মধ্যগ্রামে যদি অন্তর গান্ধার প্রয়োগ করা যায়, তাহলে কী দাঁড়াবে? এই পরীক্ষা করতে গিয়ে তারা ষড়জ গ্রামের নি ও স এর মধ্যবর্ত্তী স্থানে আরও একটি বিকৃত স্বর আবিষ্কার করলেন। এই স্বরটির তারা নাম দিলেন 'কাকলী নিষাদ'। যেমন-

অন্তর গান্ধার

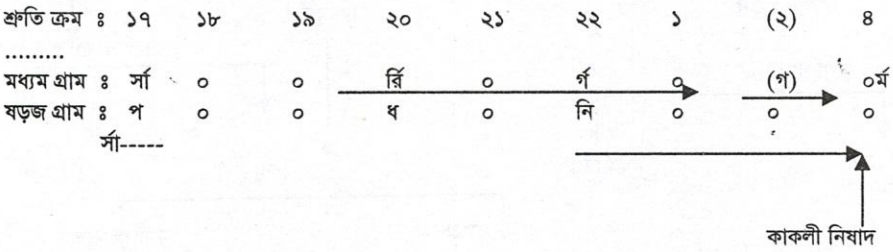

এই হল প্রথম ভারতীয় স্বরদ্বয়- 'অন্তর গান্ধার' ও কাকলী নিষাদ এর জন্ম বৃত্তান্ত। এভাবে গান্ধর্ব গুণীগণ আবিষ্কার করলেন- ছয়টি প্রতিস্বর। এগুলি হলো:

১। অন্তর গান্ধার (৪ শ্রুতিক)
২। কাকলী নিষাদ (৪ শ্রুতিক)
৩। অচ্যুত ষড়জ (২ শ্রুতিক)
৪। অচ্যুত মধ্যম (২ শ্রুতিক)
৫। মধ্যম গ্রামীয় পঞ্চম (৩ শ্রুতিক)
৬। মধ্যম গ্রামীয় ধৈবত (৪ শ্রুতিক) ২০

এরপর তারা বিকৃত স্বর নির্ণয়ের জন্য আবিষ্কার করেছিলেন একটি নতুন পদ্ধতি, যার নাম সাধারণ প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়াতে ষড়্জ গ্রাম ও মধ্যম এর গ্রামণী স্বর দুটি অর্থাৎ ষড়্জ ও মধ্যম স্বরকে গবেষণার বিষয়বস্তু করা হয়েছিল। তাই প্রাচীন শাস্ত্র গ্রন্থাদিতেও দুই গ্রামে তিনটি করে মোট ছয়টি বিকৃত স্বর আবিস্কৃত হয়েছিল। যথাঃ

ষড়জ সাধারণ
ক. চ্যুত ষড়জ (২ শ্রুতিক)
খ. বিকৃত ঋষভ (৪ শ্রুতিক)
গ. কৈশিক নিষাদ (৩ শ্রুতিক)

মধ্যম সাধারণ
ক. চ্যুত মধ্যম (২ শ্রুতিক)
খ. কৈশিক পঞ্চম (৪ শ্রুতিক)
গ. সাধারণ গান্ধার (৩ শ্রুতিক)

এইভাবে মোট ১২টি বিকৃত স্বর আবিষ্কার করেছিলেন গান্ধর্ব সঙ্গীত গবেষকগণ। তবে ভারতীয় সঙ্গীতে বিকৃত স্বর ব্যবস্থার বর্ণনা এটুকুই সম্পূর্ণ নয়। নিম্নে একটি চার্ট প্রদান করা হলো- যার বিশদ আলোচনা পরিসরতার ব্যাপার; তবে প্রাসঙ্গিক ভাবে যথাসাধ্য আলোচিত হবে।

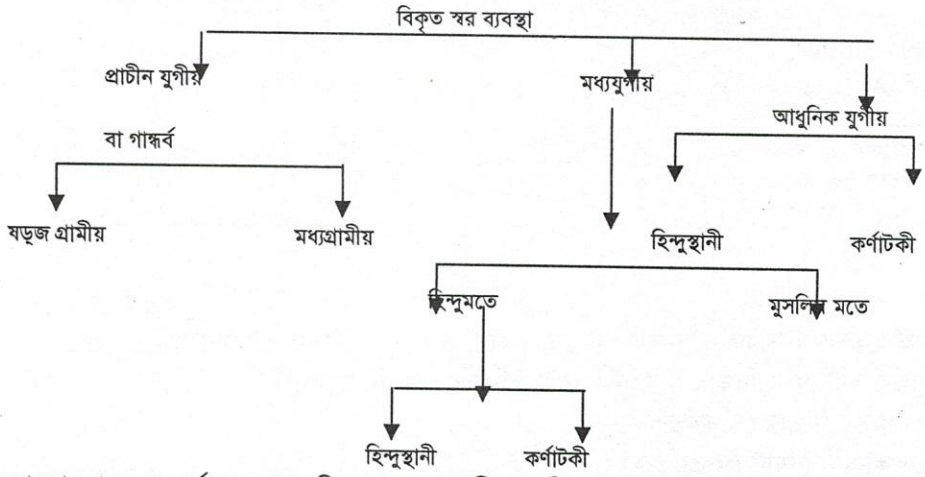

আলোচনার এ পর্যায়ে আলোচিত হবে ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যযুগের স্বরের প্রকৃতি ও প্রসঙ্গ। ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যযুগ বলতে বোঝায় ভারত ইতিহাসের মুসলিম শাসনকাল এবং সে কালের সঙ্গীত। এই মুসলিম রাজত্বকাল আবার দুই অংশে বিভক্ত।

১. সুলতানী যুগ (১১৯২ খৃঃ- ১৫২৫ খৃঃ) এবং
২. মুঘল যুগ (১৫২৬ খৃঃ- ১৭৫৭ বা পলাশী যুদ্ধ কাল)।

এবং এরপর শুরু হচ্ছে আধুনিক যুগ।

ভারতীয় স্বর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় স্বর ব্যবস্থা আবার দু ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. হিন্দুমতীয় এবং
২. মুসলিম মতীয়।

হিন্দু মতীয় স্বর ব্যবস্থা আবার দুভাগে বিভক্ত। যথা -

১. উত্তর ভারতীয় তথা হিন্দুস্থানী এবং
২. দক্ষিণ ভারতীয় তথা কর্ণাটকী।

ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ এবং বিবর্তনের ক্ষেত্রে মধ্যযুগ পর্যন্ত এসে অর্থাৎ মুসলিম কাল পর্যন্ত এসে পূর্ব গান্ধার্বমতীয় মধ্যম গ্রামের উপস্থিতি আর পরিলক্ষিত হয় না। মধ্যযুগের সঙ্গীত গুণীরা মাত্র ষড়্জ- গ্রামকেই স্বীকার করেছেন। তবে হিন্দুমতীয় সঙ্গীত গুণীগণ স্বরগত আলোচনায় দুই শিবিরে বিভক্ত ছিলেন। এ দু ভাগ ছিল -

ক) সঙ্গীত শাস্ত্রী এবং
খ) ক্রিয়াত্বক গুণী।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীত শাস্ত্রীগণ ষড়্জ গ্রামের প্রাচীন রূপকেই স্বীকার করতেন কিন্তু বিকৃত স্বরগুলির নামকরণ করতেন এবং করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। নিম্নে তার একটি তালিকা এবং তাদের বহুমতের একটি নমুনা তুলে ধরা হলো ঃ-

শাস্ত্রীগণের মতানুসারে শ্রুতিক্রমানুসারে বিকৃত স্বর নাম:

বিকৃত স্বর- নাম	শুদ্ধ- স্বর	শ্রুতি. ক্রম	শ্রুতিনাম
কৈশিক- নি/ তীব্র- নি/ সাধারণ নি		১	তীব্রা
কাকলী- নি/ তীব্রতর- নি/ পত- সা		২	কুমুদ্বতী
মৃদু- সা/ তীব্রতম- নি/ লঘু- সা		৩	মন্দা
	সা	৪	ছন্দোবতী
পূর্ব - রি		৫	দয়াবতী
কোমল রি		৬	রঞ্জনী
শুদ্ধ- রি/ পূর্ব- গ	রি	৭	রক্তিকা
তীব্র- রি/ সাধারণ- রি/ কোমল- গ		৮	রৌদ্রী
তীব্রতর- রি/ শুদ্ধ- গ	গ	৯	ক্রোধা
তীব্রতম- রি/ সাধারণ- গ / তীব্র- গ		১০	বজ্রিকা
অন্তর- গ/ তীব্রতর- গ/ পত- ম		১১	প্রসারিনী
মৃদু- ম/ তীব্রতম- ম/ লঘু- ম		১২	প্রীতি
অতি তীব্রতম- গ/ শুদ্ধ- ম	ম	১৩	মার্জনী
সাধারণ- ম/ তীব্র- ম		১৪	ক্ষিতি
অন্তর- ম/ তীব্রতর- ম/ পত- প		১৫	রক্তা
মৃদু- প/ তীব্রতম- ম / লঘু- প		১৬	সন্দিপনী
	প	১৭	আলাপিনী
পূর্ব- ধ		১৮	মদন্তী
কোমল- ধ		১৯	রোহিনী
শুদ্ধ- ধ/ পূর্ব- নি	ধ	২০	রম্যা
তীব্র- ধ/ সাধারণ- ধ/ কোমল- নি		২১	উগ্রা
তীব্রতর- ধ / শুদ্ধ- নি	নি	২২	ক্ষোভিনী
কৈশিক- নি/ তীব্রতর- নি/ সাধারণ- নি		১	তীব্রা

কিন্তু ক্রিয়াত্মক গুণীগণ সা-কে স্থাপিত করেছিলেন ২২ নং শ্রুতিতে। তাঁদের মতে রি ৪ শ্রুতিক, গ ২ শ্রুতিক, ম ৩ শ্রুতিক, প ৪ শ্রুতিক, ধ ৪ শ্রুতিক, নি ২ শ্রুতিক, এবং সা ৩ শ্রুতিক। বিকৃত স্বর সহ তাঁদের শুদ্ধ সপ্তক এবং তার শ্রুতি প্রতিস্থাপনা ছিল নিম্নরূপঃ ক্রিয়াত্মক গুণীদের স্বর ও বিকৃত স্বর স্থাপনা (মধ্যযুগ)ঃ

বিকৃত স্বর নাম	শুদ্ধ স্বর	শ্রুতি ক্রম	শ্রুতি নাম
	সা	২২	ক্ষোভিনী
সকারী- রি		১	তীব্রা
অতিকোমল- রি		২	কুমুদ্বতী
কোমল- রি		৩	মন্দা
	রি	৪	ছন্দোবতী
অতিকোমল- গ		৫	দয়াবতী
কোমল-গ		৬	রঞ্জনী
	গ	৭	রক্তিকা
তীব্র-গ		৮	রৌদ্রী
	ম	৯	ক্রোধা

তীব্র-ম		১০	বজ্রিকা
তীব্রতর-ম		১১	প্রসারিনী
তীব্রতম- ম		১২	প্রীতি
	প	১৩	মার্জনী
সকারী- ধ		১৪	ক্ষিতি
অতিকোমল- ধ		১৫	রক্তা
কোমল- ধ		১৬	সন্দিপনী
	ধ	১৭	আলাপিনী
অতিকোমল নি		১৮	মদন্তী
কোমল- নি		১৯	রোহিনী
		২০	রম্যা
তীব্র- নি		২১	উগ্রা
	সা	২২	ক্ষোভিনী

অনেকের মতেই এই মধ্যযুগীয় সঙ্গীত গুণীগণ ঐ যুগের সঙ্গীত শাস্ত্রীগণ থেকে অধিক জ্ঞানীই ছিলেন। কারণ, মধ্যযুগীয় শাস্ত্রীগণ যতটা প্রাচীন শাস্ত্রাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সে অনুপাতে তার ব্যাখ্যা করেননি মোটেও। ২২

কিন্তু মধ্যযুগীয় মুসলিম স্বর ব্যবস্থায় কোনো শ্রুতির ব্যপার ছিল না । ভারতবর্ষে মুসলিম স্বর ব্যবস্থার প্রচলন করেন আমির খশরু (সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির সভাগায়ক)। খশরু এবং তাঁর শিষ্য পরম্পরায় প্রতিটি স্বরের দুই রকম রূপ মানা হত। যথা - ১. উৎরী এবং ২. চড়ী বা কড়ি। এঁরা এরকমভাবে এক সপ্তকে মোট ১২টি স্বর স্বীকার করে ছিলেন- যা আজও বর্তমান। কিন্তু ধর্মান্তরিত মুসলিম গুণীগণ বিশেষত- সেনী ঘরনোর গুণীগণ মধ্যযুগীয় হিন্দু ক্রিয়াত্মক গুণীগণের ২২- শ্রুতি বিশিষ্ট স্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। নিম্নে এমনই একটি স্বর ব্যবস্থা যাতে মুসলিম স্বর ব্যবস্থা এবং তার হিন্দুস্থানী রূপ প্রদান করা হলো:

হিন্দুস্থানী রূপ	হিন্দুগুণীদের দ্বারা নামকরণ	মুসলিম স্বর	ক্রম
সা	খরজ	খরজ	১
ঋা	কোমল রেখাব বা রিখব	উৎরী রিখব	২
রা	শুদ্ধ রেখাব বা রিখব	চড়ী বা কড়ি রিখব	৩
জ্ঞা	কোমল গান্ধার	উৎরী গান্ধার	৪
গা	শুদ্ধ গান্ধার	চড়ী বা কড়ি গান্ধার	৫
মা	শুদ্ধ মধ্যম	উৎরী মাধ্যম	৬
ক্ষা	কড়ি বা তীব্র মধ্যম	চড়ী বা কড়ি মধ্যম	৭
পা	পঞ্চম	পঞ্চম	৮
দা	কোমল ধৈবত	উৎরী ধৈবত	৯
ধা	শুদ্ধ ধৈবত	চড়ি বা কড়ি ধৈবত	১০
ণা	কোমল নিখাদ	উৎরী নিখাদ	১১
না	শুদ্ধ নিখাদ	চড়ি বা কড়ি নিখাদ	১২

প্রকৃত পক্ষে মধ্যযুগীয় ক্রিয়াত্মক গুণীদের দ্বারা সমর্থিত সৈন্ধবী বা শ্রী রাগের শুদ্ধ মেল বা ষড়্জ গ্রামীয় স্বরাবলী যা ২২ শ্রুতিতে প্রতিস্থাপিত অর্থাৎ সা- ৪ শ্রুতিক, রি- ২ শ্রুতিক, গ- ৩ শ্রুতিক, ম- ৪ শ্রুতিক, প- ৪ শ্রুতিক, ধ- ২ শ্রুতিক এবং নি- ৩ শ্রুতিক। এই ২২ শ্রুতিক ষড়্জ গ্রাম গ্রহণের ফলে উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় ভারতে মধ্যমগ্রাম অপ্রচলিত হয়ে পড়ে।

যদিও দাক্ষিণাত্যে বা দক্ষিণ ভারতে গান্ধর্বসঙ্গীত প্রচলিত হয়েছি গৌতম বুদ্ধের কিছু আগে বা পরে। কিন্তু মধ্যযুগে এসে এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন, তাদের শিল্প সংস্কৃতি-সঙ্গীত ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ ভারতেও।

বিশেষতঃ মাধব বিদ্যারণ্যের মেল পদ্ধতি এবং পরবর্তীকালে ব্যঙ্কটমুখীর ৭২ মেল সংবাদে ভারতের গান্ধর্ব সঙ্গীতে এনে দেয় মুসলিম ও পারসিক সঙ্গীতের প্রভাব। তাদের ক্রিয়াত্মক গুণীগণ মানতেন আরোহী প্রকৃতির উত্তর ভারতীয় স্বরগ্রাম্ যা মধ্যযুগীয় ক্রিয়াত্মক গুণীদের অনুসরণে, অথচ এই সময়ের শাস্ত্রীগণ মানতেন প্রাচীন যুগীয় ষড়্জ গ্রামকে- ফলে শাস্ত্র এবং ক্রিয়াত্মক সঙ্গীতের গতি ছিল বিপরীতমুখী। মধ্যযুগীয় শাস্ত্রীগণ ষড়্জ গ্রামের শুদ্ধ রি ও ধ কে(৪ শ্রুতিক) শুদ্ধ স্বর থেকে চ্যুত করে পরবর্তী শ্রুতিতে প্রতিস্থাপিত করেছিলেন,- শাস্ত্রের সঙ্গে ক্রিয়ার তিক্ততার কারন এটাই। ক্রিয়াত্মক গুণীগণ (দক্ষিণ ভারতীয়) ২২ নং শ্রুতিতে (ক্ষোভিনী) সা কে স্থাপিত করেছিলেন ফলে ৪ শ্রুতিক সা হয়ে যায়, ৪ শ্রুতিক রি, পা স্বরটি- মা এর স্থলে স্থাপিত হয়। নিম্নে একটি তালিকার মাধ্যমে কর্নাটকী সঙ্গীতের ক্রিয়াত্মক গুণী, সঙ্গীত শাস্ত্রী এবং আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বর ব্যবস্থার একটি তুলনাত্মক রূপ তুলে ধরা হল:

আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বর ও দক্ষিন ভারতীয় শাস্ত্রী ও ক্রিয়াত্মক গুনীদের স্বর মত

শ্রুতি সংখ্যা বা ক্রম	শ্রুতি নাম	আধুনিক হিন্দুস্থানী স্বর	দক্ষিণ ভারতীয় ক্রিয়াত্মক গুণীদের মতে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর	দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রীদের মতে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর
২২	ক্ষোভিনী	অতিকোমল-নি	সা	২ গতিক ধ /৫ শ্রুতি ধ/শুদ্ধ নি
১	তীব্রা	কোমল- নি	০ ০	৬ শ্রুতি ধ/ ১ গতিক নি/ কৈশিক-নি
২	কুমুদ্বতী	শুদ্ধ নি	০ ০	২ গতিক নি/ কাকলী নি
৩	মন্দা	তীব্র নি	শুদ্ধ রি ঋ	৩ গতিক নি/ চ্যুত সা -নি
৪	ছন্দোবতী	সা	শুদ্ধ গ/ ৪শ্রুতিক রি (রি/গ) রা	সা
৫	দয়াবতী	সকারী রি	০ ০	০ ০
৬	রঞ্জনী	অতিকোমল রি	৬ শ্রুতিক রি/ সাধারণ গ/(রু/গি) জ্ঞা	০ ০
৭	রক্তিকা	কোমল রি	অন্তর গ গু	শুদ্ধ রি
৮	রৌদ্রী	শুদ্ধ রি	চ্যুত মধ্যম	১ গতিক রি/ ৪ শ্রুতি রি
৯	ক্রোধা	অতি কোমল-	শুদ্ধ -ম (ম)	২গতিক রি/ ৫শ্রুতিক রি/শুদ্ধ-গ

		গ		
১০	বজ্রিকা	কোমল-গ	০ ০	৩ গতিক রি/ ৬ শ্রুতিক রি / ১ গতিক গ/ সাধারণ - গ
১১	প্রসারিনী	শুদ্ধ- গ	প্রতি মধ্যম মি	২ গতিক গ / অন্তর- গ
১২	প্রীতি	তীব্র- গ	বরালী মধ্যম/চ্যুত প	৩ গতিক গ/ চ্যুত ম- গ
১৩	মার্জনী	ম	পা	৪ গতিক গ/ শুদ্ধ- ম
১৪	ক্ষিতি	তীব্র- ম	০ ০	১ গতিক- ম
১৫	রক্তা	তীব্রতর - ম	০ ০	২ গতিক - ম
১৬	সন্দিপনী	তীব্রতম- ম	শুদ্ধ- ধ (ধ)	৩ গতিক- ম/ চ্যুত প-ম/ বরালী- ম
১৭	আলাপিনী	প	শুদ্ধ নি/ ৪ শ্রুতিক-ধ (ধ/ন)	প
১৮	মদন্তী	সকারী- ধ	০ ০	০
১৯	রোহিনী	অতিকোমল- ধ	৬ শ্রুতিক ধ/ কৈশিক-নি (ধু / নি)	০
২০	রম্যা	কোমল- ধ	কাকলী - নি (নু)	শুদ্ধ- ধ
২১	উগ্রা	শুদ্ধ- ধ	চ্যুত স	১ গতিক ধ/ ৪ শ্রুতিক- ধ
২২	ক্ষোভিনী	অতিকোমল- নি	র্সা	২ গতিক ধ/ ৫ শ্রুতিক- ধ /শুদ্ধ- নি

এই হলো আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীতে স্বর ব্যবস্থার উত্তর ভারতীয় তথা হিন্দুস্থানী এবং দক্ষিণ ভারতীয় তথা কর্নাটকী স্বরের প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত মোটামুটি ভাবে সংক্ষিপ্ত একটি রূপ। এ পর্যায়ে আলোচনা করা যাক আমাদের দেশে দেশে বা অঞ্চলভিত্তিক ভাবে যে লোকসঙ্গীত রয়েছে তার স্বর প্রকৃতি সম্বন্ধে।

আলোচনার এ পর্যায়ে বলে নেয়া উচিত- প্রবন্ধকার এতক্ষণ স্বর নিয়ে যে পর্যালোচনা উপস্থাপন করেছেন তা পারতপক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীতকারগণ তথা ক্রিয়াত্মক গুণী এবং শাস্ত্রীগণ স্বর নিয়ে কয়েক হাজার বছর ব্যপী যে গবেষণা করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ, তবে এ গবেষণা লব্ধ ফল যা, বাইশটি শ্রুতির মাধ্যমে ভারতীয় সঙ্গীতে ব্যবহৃত বা উপস্থিাপিত হয়ে থাকে তা মূলত: আমাদের আদিম মানুষের সৃষ্ট প্রাথমিক সুর কাঠামোরই ক্রমবিবর্তিত রূপ। তবে লোক সঙ্গীত হলো সেই সঙ্গীত যে সঙ্গীতে স্বর - গবেষক বা শ্রুতি বা নাদ গবেষকগণের বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণার হাত পড়েনি। যে সব লোক সঙ্গীতের স্বর নিয়ে এমন ধরনের গবেষণা হয়েছে সে স্বর গুলি আর লোক স্বর নেই। রূপান্তরিত হয়েছে পরিমার্জিত শাস্ত্রীয় স্বর হিসেবে। এ পর্যায় দেখা যাক লোক সঙ্গীতের স্বর স্বরূপ কি প্রকৃতি কেমন।

প্রথমে 'লোক কি', তা সংক্ষিপ্ত ভাবে তুলে ধরা যাক; - লোক সঙ্গীত সম্পর্কে সহজ অথচ সর্বমান্য সংজ্ঞায় বলা যায়-

লোক সঙ্গীত হলো সেই গান যা আধুনিক ও নাগরিক শিক্ষার ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে অনাগরিক ও আধুনিকতা অস্পর্শিত সমাজের সাধারণ আবেগ থেকে সৃষ্টি হয়ে ক্রমে ক্রমে সংহত সমাজের সকল জনমানুষের সৃষ্টি হিসেবে পরিগনিত হয়,-তাই লোক সঙ্গীত। ২৪ তাহলে বলা যায় লোক সঙ্গীতে রচয়িতা কোনো ব্যক্তি মানুষ হলেও যতক্ষণ না তা সমাজের সব মানুষের সাধারণ গান হিসেবে বিবেচিত না হচ্ছে ততক্ষণ তাকে লোক সঙ্গীত বলা যাবে না। যেমন আজকের দিনে উভয় বাংলায় লালন বা বিজয় সরকারের গান সুপ্রতিষ্ঠিত । এক্ষেত্রে লালন বা বিজয় সরকারের সৃষ্টি তাদের ব্যক্তি মানস থেকে উৎসারিত হলেও আজকে একটি বিশাল সমাজের তা সাধারণ এবং সব মানুষের সুর সম্পদ। লোক সঙ্গীতের অন্য একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্যে বলা হয়েছে 'সংহত' সমাজের সম্পদ হতে হবে। 'সংহত' সমাজ হল সেই সমাজ- যে সমাজ বাইরের উপকরণ বা বাইরের সমাজের বা ব্যক্তি মানুষের বা গোষ্ঠী মানুষের উপকরণ গ্রহণ করে এবং তা তারা নিজেদের ছাঁচে ঢেলে নেয়। অর্থাৎ এর মধ্যে একটি প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি রয়েছে যা অদৃশ্যমান।২৫

এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় স্বর ব্যবস্থা; এখানে লোক সঙ্গীত সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ ধারণা দেওয়া হলো মাত্র। এবার আলোচনা করা যাক লোক সঙ্গীতের স্বর প্রকৃতি সম্বন্ধে।

প্রকৃত পক্ষে সুরের এককই হলো স্বর। পৃথিবীর প্রায় সবদেশের গানই দুই প্রকার সুরাশ্রিত

১. শিক্ষা সাপেক্ষ পরিমার্জিত বা কৃত্রিম সুর।

২. শিক্ষা নিরপেক্ষ অপরিমার্জিত সহজাত সুর যা অকৃত্রিম ।

পূর্বালোচনায় প্রবন্ধকার স্বর নিয়ে যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তা সম্পূর্ণ ভাবেই শিক্ষা সাপেক্ষ এবং গবেষণা লব্ধ কৃত্রিম স্বর প্রসঙ্গ, তা বুদ্ধিমান মানুষের ভাবনা প্রসূত। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের লোক সঙ্গীতের সুরই প্রাকৃত এবং শিক্ষা নিরপেক্ষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এসব প্রাকৃত এবং শিক্ষা নিরপেক্ষ সুরকে শিক্ষা গবেষণার ছাঁচে ঢেলে তাকে পরিমার্জিত করে তৈরি করা হয়েছে সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় সুর ,শাস্ত্রীয় স্বর। কিন্তু লোক সঙ্গীতে শাস্ত্রের ছোঁয়া লাগে না। আর তাই শাস্ত্রগত ভাবে সুরের যে এককে স্বর বলা হচ্ছে লোক সঙ্গীতে তা নেই। এখানে সুরের এককের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু আঞ্চলিক ধ্বণি বা দেশি ধ্বণি, অঞ্চল বা দেশ ভেদে বিশেষ বিশেষ সুর ভঙিমা যা কখনও কখনও একই অঞ্চলে সময় ভেদেও ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। এসব সুরভঙিমাকে কোনো স্কেল দিয়ে বাঁধা যায় না, শাস্ত্রীয় কম্পাঙ্ক , তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা প্রভৃতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। লোক সঙ্গীতের এই সুরকে বলা হয় ধ্বণি বা চলতি কথায় ধূণ। লোক সুর বা ধূণ অঞ্চলভেদে এবং প্রকৃতি ভেদেও আলাদা আলাদা হয়ে যায়; যেমন বাংলাদেশের রংপুর- দিনাজপুর অঞ্চলের ভাওয়াইয়া এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা- যশোর জেলার ভাটেল গানের সুর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভাবে ভিন্ন। এজন্য লোক সঙ্গীতের গবেষকগণ বলে থাকেন লোক সঙ্গীতের জন্ম হয় মাটি থেকে। আবার উপজাতীয় গানের সঙ্গে ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে লোক সঙ্গীতের। উপজাতীয় গানগুলি প্রধানত অবরোহী সুর প্রকৃতির যেমন

প্রাচীন সাঁওতালী গানগুলি শুনলে এ প্রকৃতি খুব স্পষ্ট বোঝা যায়।২৬ কিন্তু লোক সঙ্গীতের গতি প্রকৃতি আরোহী। লোক সুরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল সুরের ঠাট, যে কারনে আমরা একটি সুরে একাধিক লোক গান শুনে থাকি। তবে এটিও আঞ্চলিকতা কেন্দ্রিক।

তবে সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক ভাবে এবং শাস্ত্রগত ভাবে স্বর বলতে যা বোঝায়, বা স্বরের যে চারটি বৈশিষ্ট্য প্রবন্ধের পূর্বার্ধে উল্লেখ করা হয়েছে- লোক সঙ্গীতের সুরের একক সে ভাবে ভাগ করা যায় না।

যদিও আধুনিক কালের কিছু গবেষক বৈজ্ঞানিক কম্পাঙ্ক, তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা প্রভৃতি দিয়ে লোক সঙ্গীতের স্বর ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন- তবে সে গুলি সর্বমান্যতা পায় নি।

পরিশেষে-বলতে হয় সঙ্গীতের প্রাণ বা মূল যেহেতু স্বর তাই স্বর ব্যবস্থার আলোচনা অনেক পরিসরতার ব্যাপার। সঙ্গীতের যে নন্দনতাত্ত্বিক দিক তার বেশির ভাগটাই নির্ভর করে স্বরের শ্রুতিগত সংস্থান- এর উপর, যে কারনে সেতার, বেহালা, বীণা বা বাঁশীর মত সঙ্গীত যন্ত্রাদির পরিবেশনা স্বতন্ত্রভাবে নান্দনিকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত- বিষয়টি একটু ভাবলেই বোঝা যায়। যাহোক, আজকের স্বর ব্যবস্থা- সে হাজার বছরের ভাবনা চিন্তা এবং সময়ের বিবর্তনের ফসল। মানব সমাজ সংস্কৃতি সবই যেহেতু ক্রমাবিবর্তনশীল তাই হাজার বছর পরও নিশ্চয়ই আজকের এই স্বর ব্যবস্থা স্থির থাকবে না। তবে এই প্রবন্ধ আজকের দিন পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গীতের যে স্বর ব্যবস্থা তার একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ।

তথ্যসূত্র

১. "মানুষ চিরদিনই অনুকরণ প্রিয়। শান্তি ও স্বচ্ছতার পরিবেশ পেলে শ্রম শ্রান্তির মধ্যেও সে জানাতো প্রকৃতিকে তার অন্তরের আবেদন।" স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস- ১ম ভাগ, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০০ পৃষ্ঠা- ১ ।

২. ীরেন ভট্টাচার্য, সঙ্গীত ও সমাজ জীবন, সঙ্গীত মূল্যায়ন- ৩য় খন্ড, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী- ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ১৬ ।

৩. রত্না ভট্টাচার্য, শ্রবণ বিজ্ঞান ও সঙ্গীত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী পত্রিকা, পঞ্চম সংখ্যা, কোলকাতা, মার্চ- ২০০২, পৃষ্ঠা- ৪৬।

৪. টীকাঃ "ন কারং প্রাণনামানং দকারমনলং বিদুঃ।
জাতঃ প্রাণাগ্নি সংযোগৎতেন নাদোহ্ভিধীয়তে।।" (১/৩/৬ সঙ্গীত রত্নাকর)॥

অর্থাৎ - ন কার অর্থে প্রাণ এবং দ কার অর্থে অনল (অগ্নি) বোঝানো হয়। তাই প্রাণ (ন) এবং অগ্নির (দ) সংযোগে উৎপন্ন বলেই একে নাদ নামে অভিহিত করা হয়।

নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব প্রণীত 'সঙ্গীত রত্নাকর', সটীক বঙ্গানুবাদ- ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ, স্বরগতাধ্যায়, নাদোৎপত্তি, পশ্চীমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী, কোলকাতা -৩৩, পৃষ্ঠা- ৪২।

৫. টীকা ঃ " নাদোপসনয়া দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ
ভ ন্ত্যপসিতা নূনং যস্মাদেতে তদাত্মকাঃ ।।"
(১/৩/২ সঙ্গীত রত্নাকর)

- নাদ উপসনা করলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মত দেবতাগণ ও উপস্থিত হন; এঁরা নিশ্চিত ভাবে উপস্থিত হন এ জন্যে যে, এঁরা নাদাত্মক। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ৪১।

৬. মুনি মতঙ্গ, বৃহদ্দেশী, সম্পাদনা, শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কোলকাতা-৬ ,প্রকাশ- ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ১৬।

৭. নিঃশঙ্ক শার্ঙ্গদেব প্রণীত, সঙ্গীত রত্নাকর, সটীক অনুবাদ- ৫, ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ, (পূর্বোক্ত), পৃষ্ঠা- ৫৮।

৮. নারদ, সঙ্গীত মকরন্দ, সম্পাদনা ও ভাষান্তর ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ, রিসার্চ ইসটিটিউট অব ইন্ডিয়ান মিউজিকোলজি, কোলকাতা- ৫০, প্রকাশ- ১৯৮৮, ১ম অধ্যায়, শ্লোক নং- ৩২, পৃষ্ঠা- ৬।

৯. অঞ্জন শেঠ, সঙ্গীত ও স্বনবিদ্যা, শোভাপ্রকাশনী, কোলকাতা, ১ম প্রকাশ ১৪০৯, পৃষ্ঠা- ৩ ।

১০. ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ, সঙ্গীতশাস্ত্র সমীক্ষা, ১ম পর্ব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী, কোলকাতা- ৩৩, প্রকাশ- ১৯৯২,পৃষ্ঠা- ৮ ।

১১. টীকা: "ষড়্জাদয়: স্বরা: সপ্ত ব্যঞ্জন্তে শ্রুতিভি: সদা।
অন্ধকারস্থিতা যদ্বৎ প্রদীপেন ঘটাদয়: ॥"

অর্থাৎ - অন্ধকার স্থিত ঘট যেমন প্রদীপ দ্বারা চিহ্নিত হয় সেইরূপ ষড়্জাদি সপ্তস্বর সর্বদাই শ্রুতি দ্বারা অভিব্যঞ্জিত হয়। মুনি মতঙ্গ প্রণীত বৃহদ্দেশী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১।

১২. মুনি মতঙ্গ, বৃহদ্দেশী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫।

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্ম শতবার্ষিকী সংস্ককরণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, ১৪শ খন্ড পৃষ্ঠা- ৮৯৬ (উদ্ধৃত) ।

১৪. ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ, সঙ্গীত শাস্ত্র সমীক্ষা- ১ম পর্ব, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা- ১৮ ।

১৫. নারদ, নারদীয় শিক্ষা, প্রথম: প্রপাটক: , প্রথমা কন্ডিক, শ্লোক নং- ২২ এবং ড. প্রদীপ কুমার ঘোষ সম্পাদিত সঙ্গীত রত্নাকর (পূর্বোক্ত) পৃষ্ঠা নং- ৪৮।

১৬. ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তন, সঙ্গীত মূল্যায়ন গ্রন্থমালা, প্রথম খন্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী, কোলকাতা- ৩৩, প্রকাশ- ১৯৮৯, পৃষ্ঠা- ৩৭- ৩৯।

১৭. শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র, বৈদিক সামগান, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী পত্রিকা, ৫ম সংখ্যা, প্রকাশ- ২০০২, পৃষ্ঠা- ৪০।

১৮. মতঙ্গ, বহদ্দেশী পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং- ৩০ (উদ্ধৃত)।

১৯. নিশঙ্ক শার্ঙ্গদেব, সঙ্গীত রত্নাকর, ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ সম্পাদিত, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫০।

২০. ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৪৪- ৪৭।

২১. ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ, ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিবর্তন, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা- ৪৮ (উদ্ধৃত)।

২২. ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠ- ৫০।
২৩. টীকা: ডঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ কর্তৃক তালিকা থেকে প্রবন্ধকার কর্তৃক সমীকরণ কৃত।
২৪. ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য্য, লোক সঙ্গীতের সংজ্ঞা প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, মুদ্রণ প্রয়াস, কোলকাতা-৮৯, প্রকাশ- ২০০১, পৃষ্ঠা- ২৪।
২৫. ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য্য, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১- ৩।
২৬. ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য্য, লোকগীতের কয়েকটি প্রসঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী পত্রিকা- ৪, কোলকাতা , প্রকাশ- জুন- ১৯৯৯, পৃষ্ঠা- ৪৮।

IBS PUBLICATIONS

1976	The *Journal of the Institute of Bangladesh Studies,* i) English volums.1–33 (1976–2010) and *ii)* Bangla volums 1–18 (1993–2011)
1977	David Kopf & S. Joarder, eds. *Reflections on Bengal Renaissance* (Seminar Volume 1).
১৯৭৯	এম.এস. কোরেশী, সম্পা.। *ঐতিহ্যসংস্কৃতি-সাহিত্য* (সেমিনার ভলিউম ৩).
1981	Enayetur Rahim. *Provincial Autonomy in Bengal (1937–1943).*
1981	M.K.U.Molla. *The New Province of Eastern Bengal and Assam(1905–1911).*
1981	S.A.Akanda, ed. *Studies in Modern Bengal* (Seminar Volume 2).
1983	S.A.Akanda, ed. *The District of Rajshahi : Its Past and Present* (Seminar Volume 4).
1984	M.S. Qureshi, ed. *Tribal Cultures in Bangladesh* (Seminar Volume 5).
১৯৮৫	আমানুলাহ আহমদ। *বঙ্কিমচন্দ্র ও আমরা* (সেমিনার ভলিউম ৬).
1991	Abdul Karim. *History of Bengal : Mughal Period,* Vol 1.
1991	S.A.Akanda & M. Aminul Islam. *Rural Poverty and Development Strategies in Bangladesh.* (Seminar Volume 8).
১৯৯১	এস.এ. আকন্দ, সম্পা.। *বাঙালীর আত্মপরিচয়* (সেমিনার ভলিউম ৭).
১৯৯২	আবদুল করিম। বাংলার ইতিহাস (মোগল আমল), ১ম খণ্ড।
1993	Md. Shahjahan Rarhi. *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies: An Up-to-date Index.*
1995	Abdul Karim. *History of Bengal : Mughal Period,* Vol 2.
১৯৯৭	এম.এস. কোরেশী, সম্পা.। *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার সমস্যা* (সেমিনার ভলিউম ৯)।
2002	Md. Shahjahan Rarhi. *Research Resources of IBS : Abstracts of PhD Theses.*
2004	Pritikumar Mitra & Jakir Hossain (eds.). *Orderly and Humane Migration : An Emerging Development Paradigm.*
2004	The Institute of Bangladesh Studies: An Introduction.
২০০৯	মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পা.। *প্রীতিকুমার মিত্র স্মারকগ্রন্থ*
২০১০	মো. মাহবুবর রহমান ও স্বরোচিষ সরকার, সম্পা.। *বিশ শতকের বাংলা* (সেমিনার ভলিউম ১০)
2010	Md. Shahjahan Rarhi. *Annotated Bibliography of PhD Theses: Produced in the Institute of Bangladesh Studies, 1976–2010.*
2010	Md. Shahjahan Rarhi. *Index to the Journal of The Institute of Bangladesh Studies: Volume 1-32 (1976-2009)*
2011	Shahanara Husain. *Hisrtory of Ancient Bengal: Selected Essays on State, Society and Culture*
২০১২	মো. মাহবুবর রহমান, সম্পা. *রাজশাহী মহণগরী: অতীত ও বর্তমান*, ১ম খণ্ড
২০১২	মো. মাহবুবর রহমান, সম্পা. *রাজশাহী মহণগরী: অতীত ও বর্তমান*, ২য় খণ্ড
২০১২	কাহানারা হোসেন, *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস*

১৯,১৪১৮ সংখ্যার সূচিপত্র

মোসা: ছায়িদা আখতার	পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সংগ্রামে আওয়ামী লীগের ভূমিকা	৭
মোঃ আঃ লতিফ ভূঁইয়া	ভাষা আন্দোলন সংগঠনে তমুদ্দু মজলিসের ভূমিকা	২৯
মীর ফেরদৌস হোসেন	আনসার বাহিনী গঠনের প্রেক্ষাপট ও প্রাথমিক কার্যক্রম (১৯৪৮-১৯৭১)	৩৯
মো: ইউসুফ	সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার ইতিহাস এবং এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব	৫৫
মো. আবদুল্লাহ আল মাসুম	ময়মনসিংযের আনন্দমোহন কলেজ: ইতিহাস ও ঐতিহ্য (১৯০৮-২০০৮)	৭৩
আবু মোঃ ইকবাল রুমী শাহ	১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষ: স্থানীয় নাটকে রংপুরের চিত্র	৯৭
মো. আখতার হোসন আব্দুল খালেক	উগুড়া জেলায় ইসলাম প্রচারে সুফি সাধকগণের অবদান	১১৫
মোসা. আশীয়ারা খাতুন	বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘওে রক্ষিত কতিপয় পোড়ামাটির ফলক	১৩১
অনিন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায়	সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র: সমকালীন প্রতিক্রিয়অ	১৪৫
হোসনে আরা আরজু	কালিদাসের নাটক: সৃজনকৌশল	১৭১
কৃষ্ণপদ মণ্ডল	নজরুল-সংগীতে রাগ-বৈচিত্র্য	১৮৩
মোবাররা সিদ্দিকা	লোক-ক্রীড়ায় বুড়ি-চরিত্র: সমাজতাত্ত্বিক পর্যালোচনা	১৯৭
মোঃ সামসুজ্জোহা আবদুল্লাহ আল মারুফ	সিডরোত্তর জীবনকৌশল: দক্ষিণ জনপদের অভিযোজন পেক্ষিত	২০৭
মু. ইব্রাহীম খলিল	বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের উপকূলীয় কৃষকদের অভিযোজন কৌশল	২২৩
সিরাজুম মুনীরা	নারী নির্যাতনের সাথে যৌতুকের সম্পর্ক	২৩৩